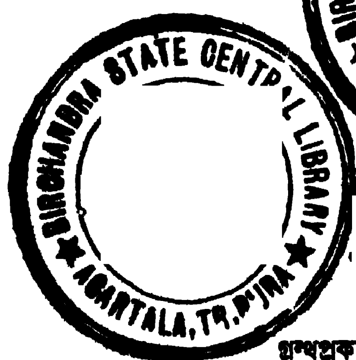

ছবি আর ছবি

ছবি আর ছবি



গ্রন্থপ্রকাশ ।। কলিকাতা বারো

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৫৫

প্রকাশক :
নন্দিতা বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

গ্রন্থস্বত্বাধিকারী : মৈনাক বসু

প্রচ্ছদশিল্পী :
অজিত গুপ্ত

মুদ্রক :
দুর্লভচন্দ্র কোলে
লেখাশ্রী প্রাঃ লিঃ
৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

আট টাকা

শ্রীমান ময়ূখ বসু

পরম স্নেহাস্পদেষু

এই লেখকের

নিশিকুটুম্ব ১ম ও ২য়
জলজঙ্গল
শত্রুপক্ষের মেয়ে
রক্তের বদলে রক্ত
মানুষ নামক জন্তু
ছবি আর ছবি
রাজকন্যার স্বয়ম্বর
সাজবদল
বন কেটে বসত

রূপবতী
ওগো বধূ সুন্দরী
চাঁদের ওপিঠ
বৃষ্টি বৃষ্টি
মানুষ গড়ার কারিগর
নবীন যাত্রা
এক বিহঙ্গী
বকুল
আমার ফাঁসি হল
সবুজ চিঠি
ভুলি নাই
বাঁশের কেল্লা
সৈনিক,
আগস্ট ১৯৪২
মনোজ বসুর গল্পসংগ্রহ
কুঙ্কুম

গল্পপঞ্চাশৎ
পৃথিবী কাদের
কিংশুক
কাচের আকাশ
দেবী কিশোরী
মায়াকন্যা
নববাঁধ
সোভিয়েতের দেশে দেশে
নতুন ইয়োরোপ নতুন মানুষ
পথ চলি
চীন দেখে এলাম ১ম ও ২য়
নূতন প্রভাত
বিলাসকুঞ্জ বোর্ডিং
ডমরু ডাক্তার
শেষ লগ্ন
প্লাবন
রাখিবন্ধন
বিপর্যয়

1. And Moses went up from the plains of Moab unto the mountain of Nebo, to the top of Pisgah, that is over against Jericho. And the Lord shewed him all the land of Gilead, unto Dan,

2. And all Naphtali, and the land of Ephraim, and Manasseh, and all the land of Jeedah, unto the utmost sea,

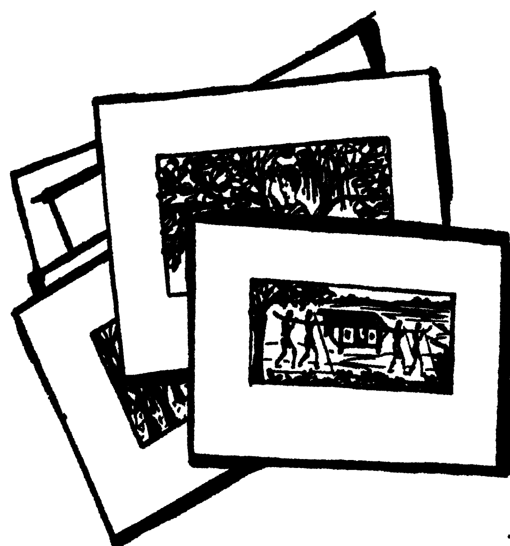
3. And the south, and the plain of the valley of Jericho, and the city of palm trees, unto Zoar,

4. And the Lord said unto him. This is the land which I sware unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, saying, I will give it unto thy seed. I have caused thee to see it with thine eyes, but thou shalt not go over thither.

Deuteronomy XXXIV

আনন্দে প্রকৃতি যেন হাসে মনোসুখে ;
তার মাঝে শুধু সেই অভাগার মুখে,
রাজ্যের বিষাদ যেন রয়েছে বসিয়া ;
বিরস বদনে যুবা ভাবে দাঁড়াইয়া ।
বহুক্ষণ ঊর্দ্ধনেত্রে নিশ্বাস ছাড়িল ;
মলিন কপোলে অশ্রু গলিতে লাগিল ।
অবশেষে বলে—আর কেন রে নয়ন !
কেন বৃথা অশ্রুধারা ? হতভাগ্য মন !
ভোলোরে পূর্ব্বের কথা ; ভোলো পরিবার ;
সাগরের পারে যেতে চাহিও না আর ;
যাও রে দুরাশা তুমি মানস ছাড়িয়া,
আর কেন হৃদি-মাঝে থাক লুকাইয়া !
সুখের স্বপন সব লওরে বিদায় ;
সংসার ! একাকী রাখি যাওরে আমায় !

নির্ব্বাসিতের বিলাপ ॥ শিবনাথ শাস্ত্রী



ছবি আর ছবি

॥ এক ॥

সেকালের এক ছোট্ট ছেলে অনন্ত বেদনার বোঝা বয়ে ঘুরে বেড়ায় শহরের দালানকোঠার গোলকধাঁধার ভিতর। নির্বাসিত সে নিজভূমি থেকে, শহরকে এত কালেও চিনল না। গভীর রাত্রে চারিদিক নিষুপ্ত—আকাশে তারা জ্বলে, আর টেবিলে বাতি। নির্বাক দুটি সঙ্গী দুই জগতে। সেই সুপ্তিরাজ্যে আয়ুর একটা দিন বিদায় নিয়ে যাচ্ছে ঘড়ির টকটক আওয়াজের সঙ্গে পা ফেলে ফেলে। তবু একটু সোয়াস্তি, দুর্ভোগের একটা দিন কমে গেল।

লিখে যাচ্ছে সে স্মৃতির ছবি—ছবি আর ছবি—কোন পাঠকের তারিপ পাবার জন্য নয়। ছবির গহনে পায়চারি করে সে নির্বাসনের দুঃখ ভোলে। কলমের রেখায় রেখায় তার আপন-মাটি আর আপন-মানুষেরা ফুটে উঠছে। কিছু ঝাপসা যদি ঠেকে, অপরাধ নেবেন না। চোখ-ভরা আগুন আর মন-ভরা অশ্রু—নিখুঁত জিনিষ এর মধ্যে আসে না।

ছেলেবয়সে স্বদেশি-দাদারা তলোয়ার-চালনা শেখাতেন। নাটু-দা এবং আরও কতজনা। অহিংস আমলে এখন তলোয়ার-বন্দুকে মরচে ধরে গেছে। রত্নপ্রভা-বউদি ধমক দিয়েছিলেন: তলোয়ার না থাক, কলম আছে তোমার হাতে। উদ্দণ্ড পাগল রত্নপ্রভা, সময় সময় শিকলে বেঁধে রাখতে হয়। তখন অবশ্য শিকলে বাঁধার অবস্থা আসেনি। বললেন, ক্ষমতার মোহে পড়ে জাতির সঙ্গে যারা এত বড় প্রতারণা করল, ইতিহাসে একদিন বিচার হবে তাদের। তুমিও যদি সেই দলে ভিড়ে যাও, উত্তরপুরুষ রেহাই দেবে না। অস্ত্র নেই তো কলম আছে—বিনি-দোষে যারা সর্বস্ব খোয়াল, তাদের নিয়ে লিখতে হবে তোমায়।

বউদি'র কথাগুলো বিঁধে রয়েছে মনের মধ্যে।

কলমই চালাব তবে, শুধুমাত্র যে সম্বল আমার আছে। জন্মের মতো যা হারিয়ে এসেছি, খানিকটা তার চেহারা দিচ্ছি। কলম উদ্যত করে দেখিয়ে যাব : পথে তুলে দিয়েছিল ওই যে—ওই আমার নিজের ভূমি থেকে। দেখে রাখ, চিনে রাখ সকলে—

কোন এক মুসা আবির্ভূত হয়ে একদা প্রতিশ্রুত-ভূমির দিকে নিয়ে চলবেন কিনা, কে জানে। সীতা বিহনে রামচন্দ্র সোনা দিয়ে সীতা গড়িয়েছিলেন, আমি গড়াচ্ছি (ত্রেতাযুগ নয়, একালে সোনার কড়াকড়িতে স্বর্ণকারেরা গলায় দড়ি দিয়ে মরেন) কালিতে আর কলমে আমার সেই আপন-মানুষদের।

হঠাৎ কখনো বা মনে হয়, বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে আছি।

কুট-কুট-কুটুম—

কুটুমপাখি উড়ে যায় মাথার উপর দিয়ে। আজ ঠিক কুটুম্ব আসবে। জেঠাইমা বলেন, ও বড়বউ, দুধ কিছু রেখে দাও কুটুম্বর পায়সের জন্য।

হলদে-পাখি ডাকছে দেবদারুগাছে : বউ, সরষে কোট্—। আবদারটা শোন—ক্ষেতের সরষে উঠানে এসেছে, এক্ষুনি অমনি কাসুন্দির সরষে কুটতে হবে। বলি ও হাঁদারাম পাখি, কাঁচা-আম বোশেখের আগে মিলবে না—কোটা-সরষে তদ্দিনে দলা-দলা হয়ে যাবে যে।

পাখি ডাকছে শুনুন কোন দিকে : গৃহস্থর খোকা হোক। ঝাঁটা মার্, ঝাঁটা মার্—রঙ্গরসিকতার জায়গা পেল না আর পাখি। কোথায় গৃহস্থ, খোকা হবে যাদের ? কে কোন দিকে ছিটকে গেল, বেঘোরে মারা গেল কতজন। উঠানে আজ একহাঁটু জঙ্গল।

ঠক-ঠক করে কাঠঠোকরা ঠোঁটের ঘা মারছে সেই বেলা দুপুর থেকে। অসীম অধ্যবসায়—শক্ত কাঠের গুঁড়ি ছিদ্র-ছিদ্র করছে। বেলা পড়ে গিয়ে অন্ধকার হল, তবে বিরতি।

গ্রামের সন্ধ্যা ! গ্রাম আর কোথা আজ ? হেথা হোথা দল

বেঁধে শিয়াল ডেকে উঠছে : হুক্কা-হুয়া, ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া—কী হয়ে গেল, হায়রে হায়, এই ক'টা বছরের মধ্যে!

এমনি এক সন্ধ্যাবেলা—অনেক অনেক বছর আগে। রূপকথার মতো অবাস্তব মনে হয়। খাওয়া হয়ে গেছে ছেলেপুলেদের, পুকুরঘাটে আঁচাতে যাচ্ছি। বাহির-বাড়ির উঠান পার হয়ে গা কেঁপে ওঠে বোধনতলার দিকে নজর পড়ে। প্রায়-নিষ্পত্র এক বেলগাছ—আগে দুর্গোৎসব হত, পাকা বোধনপিঁড়ি ছিল গাছের গোড়ায়। পরিত্যক্ত পূজাস্থানে এখন নাকি এক ব্রহ্মদৈত্য এসে বাসা নিয়েছে। (প্রাচীন যত বোধনগাছ দেখি, সবাইকে নিয়ে এমনিতরো কাহিনী—নাকি ব্রহ্মদৈত্যের আস্তানা।) দিনের আলোয় দূরদূরান্তরে কোথায় চলে যায়, রাত হলে ফিরে আসে। এসে ক্লান্ত দুই পা ঝুলিয়ে বসে দোডালার উপর, পা দোলাতে দোলাতে সারা গাঁয়ের উপর দৃষ্টি ঘোরায়। এক সময় হঠাৎ পা একটা বাড়িয়ে ওখান থেকে দালানের ছাতে চলে আসে। আটচালা ঘর, গোয়াল, বাহির-বাড়ির উঠান, তারপরেই দালানের আরম্ভ। ছাতের উপর খানিকক্ষণ পায়চারি করে ব্রহ্মদৈত্য চলে যায় কামারপাড়া মুখো।

মাতির মা'র উঠানের বাদামগাছে এক পা, আর এক পা মধ্যবাড়ির টিনের চালে—ঠিক এমনি অবস্থায় নটবর চৌকিদার দেখেছিল একদিন। কালীর দিব্যি করে নটবর বলে, শেষরাত্রে রোঁদে বেরিয়ে আবছা অন্ধকারে স্পষ্ট দেখেছে এই কাণ্ড। ব্রহ্মদৈত্য তাকে দেখতে পায়নি। দেখলেও বা কি? নটবর বড় গুণীন—একমুঠো ধুলো তুলে মন্ত্র পড়ে ছুঁড়ে দিত অপযোনির দিকে—কামানের গোলার মতো গিয়ে লাগত সেই ধুলোমুঠি।

সে বেলগাছ আর নেই, ঝড়ে উপড়ে পড়েছিল। বাঁধানো বোধনপিঁড়িরও একখানা ইট খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেবারে গিয়ে দেখলাম, বিশালপত্র মানকচুর ক্ষেত সেই জায়গায়। সবুজ ভুঁইচাপা-বনের মাঝে লম্বাডাঁটা ফুলগুলো রাত্রের মধ্যে মাথা তুলে উঠত,

শিশিরস্নাত সকালবেলা ফুল তুলে আনতাম—মহাকাল মত্ত হাতির মতো সেই ভুঁইচাঁপাবন দলে মলে নিশ্চিহ্ন করে গেছে।

মাতির মা'র কুঁড়েঘর আমাদের দালানের অদূরে। তাঁর চেহারাটা ঝাপসা রকম মনে আসে। মেয়ে মাতঙ্গিনী—আমার জন্মের আগেই মারা গেছে, ডাক নাম ছিল মাতি। বিয়ে হয়েছিল কাছাকাছি মধ্যকুল গ্রামে। ছেলেও হয়েছে। তারপর মাতি মারা গেল। জামাই বিয়ে করেছে আবার, নতুন বউ নিয়ে সুখেস্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করছে। মাতির ছেলে হরি থাকে মাতির মা'র কাছে। খানিকটা বড় হয়েছে, পাঠশালায় ি য়ে বসে কখনো-সখনো।

কি কাজ আর বলুন মাতির মা'র—নাতি আর দিদিমা দুটি তো প্রাণী! বিধবা মানুষ, নিজের এক বেলার খাওয়া—শুধু দুপুরবেলাটা উনুন জ্বালেন তিনি। বিকালেব চাট্টি ভাত থাকে হরির জন্য, এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে ব্যঞ্জন চেয়ে নিয়ে আসেন।

সন্ধ্যার পরেই শুয়ে পড়তেন মাতিব মা। হরিও সেই সঙ্গে। আলো জ্বালবার প্রয়োজন নেই। টেমি একটা ছিল বটে, কিন্তু কখনো তাতে সলতে ভরা হয়নি। শুয়ে শুয়ে রূপকথা (তিনি বলতেন, ওককথা)। হরি আমার খেলুড়ে, চুপি চুপি আমিও গিয়ে মাতির মা'র ডানপাশে কাঁথার উপর শুয়ে পড়ি। আলো নেই তো কি—অন্ধকার ঘরে পাতালপুরীর সাতরাজার-ধন মাণিক জ্বলে জ্বলে উঠছে, রাজবাড়ির হাজার দেয়ালগিরিতে উঠান আলো-আলোময়, চতুর্দোলায় চড়ে রাজকন্যা যাচ্ছেন বাদামতলা দিয়ে—রূপের ঝিলিকে আঁধার বাদামতলা ঝিলমিলিয়ে ওঠে, ডাকাতের বিলের দলবল বিল থেকে উঠে এসে মশালের আলোয় ঘর-কানাচের কলাবন দিনমান করে তোলে·······

আরও রাত হত। শেয়াল ডেকে ডেকে নীরব হত বাঁশবাগানে। শিউলিফুল ফুটে চারিদিক গন্ধে ভরে যেত। তারই মধ্যে যখন ঘুমিয়ে পড়েছি, আর কিছু জানিনে। অনেক রাতে গোপলা চাকর কাঁধে তুলে

বাড়ি এনেছে আমায়। কিছু জানিনে আমি। শেষ রাতে ঘুম ভেঙে দেখি, মায়ের কোলের মধ্যে গুটি-গুটি হয়ে আছি। ঠনাঠন আওয়াজ আসছে কামারপাড়ার দিক থেকে, নিঃশব্দতার বুকে হাতুড়ি পিটছে। বিশ্বম্ভর উত্তম আর কৈলাস—তিন কর্মকারের তিনটে কামারশালা পাশাপাশি। দিনমানে কতদিন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছি, সে কী কাণ্ড! ডগমগে রক্ত-বরণ লোহা নেহাইর উপর চেপে ধরেছে সাঁড়াশি দিয়ে, অপর হাতে হাতুড়ি পিটছে। আর এক মরদ লম্বাটে গোছের মস্তবড় হাতুড়ি পাঁঠা-কাটার ধরনে মারছে ঐ গরম লোহায়। নানারকম আকৃতি বেরুচ্ছে—দা, কুড়াল, কাস্তে। পূজোর পর থেকে কাজের বড় ভিড়—খেজুরগাছের মরশুম এসে পড়ে, গাছ-কাটা দায়ের যোগান দিতে হয়। একপ্রহর রাত থাকতে কামাররা কাজে লাগে—খেটে খেটে হিমসিম, তবু সামলানো যায় না।

মাতির মা-ও দোর খুলে বেরিয়েছেন, উঠান ঝাঁট দিচ্ছেন, এর পরে গোবরজল ছিটোবেন। আমাদের বাড়ির ঘুমকাতুরে মেজদা চেঁচাচ্ছেন: আঃ খুড়িমা, ঘুমোবার জো নেই তোমার জ্বালায়। সকালটা হতে দাও না। ঝাঁটপাট তখন দিও।

সকাল হবার অনেক আগেই মাতির মা'র সমস্ত বাসিপাট সারা। তারপরে আর কাজ থাকে না। কাজের অভাবে এবাড়ি-ওবাড়ি আগ বাড়িয়ে পড়েন কাজের আবিষ্কারে। নিজের সঙ্গতি নেই—আমার মা'কে বলেন, নতুন ঠিকরিকলাই উঠল—বড়ি দেবা না ছোটবউ? আমার চালে চালকুমড়ো হয়েছে, পেড়ে এনে বড়ি দিয়ে ফেল।

খাওয়ার জন্যে দু-চারটে বড়ি তাঁকে নিশ্চয় দেবে, কিন্তু সেটা কিছু নয়। এই উপলক্ষে কুমড়ো-কোরানো, ঢেঁকিশালে বড়ি-কোটা, তার পরে বড়ি ফেনানো এবং খেজুরপাতার পাটি বিছিয়ে তার উপর টোপা টোপা বড়ি দেওয়া—এতগুলো কাজের সুখ হল মাতির মা'র।

আজ গেলে দেখতে পাবেন, ভিটার চিহ্নটুকুও নেই যেখানটা মান্তির মা'র ঘর ছিল। কসাড় বনজঙ্গল—কাঁটাঝিটকে বনকচু ও অনেক রকমের গাছগাছালি। নিশীথ বাতাসে নির্জনে বাদামগাছের পাতা ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে। ঝোঁপেঝাপে জোনাকি—আমার শৈশব-আনন্দের টুকরোগুলো জোনাকি হয়ে আজও উড়ে বেড়ায়। কত রাজা রাজকন্যা কত ডাকাতসর্দার ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর আনাগোনা ছিল—ওখানকার ঐ মাটিতে সোনার গুঁড়ো কত ছড়িয়ে আছে, কেউ জানে না।

জানে শুধ্ একজন, সেকালের সেই মধুর বাল্য আর আপন দেশভূঁই থেকে যে চিরনির্বাসিত। সুদূর শহরের বন্দীশালায় সে নিশ্বাস ফেলছে। নিঃসহায়, নির্বান্ধব—সম্বলের মধ্যে হাতে একটি কলম।

॥ দুই ॥

দেশোয়ালি মানুষ দেখার লোভ যদি বড় দুর্বার হয়ে ওঠে, সে ব্যবস্থাও করে রেখেছেন আমাদের বিবেচক স্বদেশি সরকার। শহরের সীমানার ভিতরেই। গোটা পূর্ব-বাংলার সর্বরকম মানুষ একটা জায়গায়—একখানা ঢাউশ ছাদের নিচে।

যাবেন?

শিয়ালদা স্টেশন—কলকাতা শহরের মধ্যে থেকেও ভিন্ন এক জগৎ। আমি আলাদা নই, এই এঁদেরই একজন। মচ্ছব জমে ওঠার আগেই ভাগ্যবশে এসে পড়েছিলাম, শহর তাই বুকের উপর একটুকু ঠাঁই দিয়েছে। নইলে আমারও স্টেশনের মেজেয় এঁদের পাশাপাশি মাদুর বিছিয়ে নেবার কথা।

সামাল হয়ে পা ফেলবেন। অগণ্য গৃহস্থালী, বাচ্চা ছেলেপুলে

এদিক-সেদিক পড়ে আছে, মাড়িয়ে না ফেলেন পোকামাকড়ের মতো। সরকারি কর্তারা ইদানীং জাতীয়-সংহতি নিয়ে চেঁচামেচি লাগিয়েছেন—নয়ন মেলে দেখুন এসে এই স্টেশন জায়গায়। তাজ্জব হয়ে যাবেন তাঁরা, আত্মতৃপ্তিতে কোলাব্যাঙের মতো ফুলে উঠবেন। পূর্ব-বাংলার কোন অঞ্চলই বোধহয় বাকি নেই—সর্বজাতির প্রতিনিধি একটি বৃহৎ ঘরে গায়ে গায়ে বসতি পেতেছেন। কী জানি, আপনি হয়তো হিংসাই করছেন মনে মনে। আপনাকে থাকতে হয় দশফুট বাই আটফুট টিনের ঘরে—সে ঘরের ভাড়ার অঙ্ক শুনে পিলে চমকে যায়। হেন অবস্থায় মাঠের মতো ঘরের মধ্যে স্ত্রীপুত্র ভাই-বেরাদার নিয়ে পুরোপুরি পা ছড়িয়ে এঁরা সংসারধর্ম করছেন। ভাড়া বলে একটি পয়সা কাউকে দিতে হয় না।

(সেদিন অবধি ছিল এই। সব সুবিধার মতো এখানেও শনির দৃষ্টি পড়ল। কে কোন রাজ্যে চালান হয়ে গেল, ঠিকঠিকানা নেই। এখন আর কারো চোখের পীড়া দেয় না।)

ঘাড় গুঁজে বসে পড়ুন এদিকটা। চোখ মেলে সোজাসুজি দেখা বিপজ্জনক—মুখ ফিরিয়ে যথাসম্ভব কান দিয়ে দেখতে লাগুন। দলটা নিশ্চিন্তে জমিয়ে বসে গল্পগাছা করছে। টের পেলে গল্প থামিয়ে মুহূর্তে ভব্য মানুষ হয়ে যাবে। হচ্ছে খাওয়ার গল্প—নিঃসন্দেহ ভারি ভারি খাইয়ে-লোক। শহুরে মানুষদের বেশ একহাত নিচ্ছে। শুনুন—

শহুরে বাবুভেয়ের কথা বলবেন না দাদা,—বলবেন না। দেহ বলে আছে কিছু ওদের? পাণ্টলুন-জুতো-জামায় ঢাকা থাকে, তাই। জামা উঁচু করে তুললে চোখ চাওয়া যায় না। পাকাটির মতো সরু, সরু পনেরো-বিশটা হাড় জুড়ে-গেঁথে একখানা কাঠামো—একদানা মাংস নেই হাড়ের গায়ে। বাঁচেন না আবার তার দেমাকে। এটা মাখছেন, ওটা ঘষছেন, সাবানে ধোয়াধুয়ি অহরহ।

জামা-কাপড় বদলে বদলে পরা—এখন এটা, তখন সেটা। বিকারের রোগির বেলা ডাক্তারে যেমন ঘন ঘন ওষুধ বদল করে—এখন রাঙা ওষুধ, দু-ঘণ্টা পরে সাদা ওষুধ, তারপরে বড়ি, তারপরে সবুজ ওষুধ। ওঁদেরও সেই রকম। সিকিখানা ফুলকো লুচি আলটপকা টাকরায় ফেললেন, ওই সঙ্গে কণিকাপ্রমাণ মাছ। একঢোক জল খেলেন। খেয়ে ঢেকুর তুললেন: ওঃ, বিষম খাওয়া হয়েছে! এই মানুষ ওরা। খাওয়ার গল্প কখনো শহুবে লোকের কাছে করতে যাবেন না। মাথায় ঢুকবে না এ জিনিষ।

(শুধু খাওয়া আর খাওয়া! খেতেই যেন এসেছে দুনিয়ার উপর, খাওয়া ছাড়া অন্য কাজ নেই। শুনুন কি বলে। ঠিক সেই কথাই বলছে একেবারে স্পষ্টাস্পষ্টি।)

বেঁচে থাকা খাওয়ার জন্যেই তো। চর্বচোষ্য মজা করে খাব, সেই লোভে কষ্টের জীবন বয়ে বেড়াই। আমাদের রাখাল চক্কোত্তি কবিরাজমশায়ের কিন্তু আলাদা রকম বুঝ। এক ছটাক পরিমাণ পুবনো সরু চালের অন্ন আর মসুরিডালের ঝোল খেতেন তিনি। তরকারির মধ্যে একটা পটল আর সিকিখানা কাঁচকলা। সারাজীবন এই খেয়ে গেলেন। স্নানের বিষয়ে বলতেন, একবাব স্নান হয়েছিল আঁতুড়ঘর থেকে বেরনোর মুখে; আরও একবারের বাসনা রাখি—শ্মশানে যখন চিতেয় উঠব, সেই সময়টা। সেই চিতেয় ওঠা, হিসেব করে দেখো, একশটি বছরের আগে হচ্ছে না। ষোলআনা নিয়ম মেনে চলি, মরণ অমনি হলেই হল!

আমরা বলতাম, একশ বছর কি কবিরাজ, একটা বছরও তোমার ওই নিয়ম মানতে হলে তার আগে গাঙে ঝাঁপ দিয়ে মরে থাকব।

তা-ও বাঁচলেন নাকি কবিরাজ! পঞ্চাশও পুরল না। না খেয়ে খেয়ে পনেরোআনা মরেই ছিলেন, একদিন সন্ধ্যাবেলা চিঁচিঁ-গলায় 'বড়বউ' 'বড়বউ' বার দুয়েক ডেকে চোখ উলটে পড়লেন।

বড়বউ হলেন কবিরাজের বউ—তিনি আবার উল্টো মেজাজের।

হবে না কেন, কোন বংশের মেয়ে! বড়বউয়ের ঠাকুরদাদা হলেন মুকুন্দদেব ঘোষাল। আধমুনে-মুকুন্দ যাঁর নাম। রায়তোড়ের রাজাবাবু ভোজন দেখে চমৎকৃত হয়ে তিরিশ বিঘে খাসজমি নিষ্কর-ব্রহ্মোত্তর তাঁকে লেখাপড়া করে দিলেন। কবিরাজ মর-মর—বড়বউঠাকরুন জেলে ডেকে সেইদিন পুকুর থেকে বড় বড় দুটো কাতলামাছ তুলে ফেললেন। পুকুরের মাছ এর পরে তো বারোভূতে খাবে, ব্রাহ্মণঘরের বিধবা হয়ে এ জীবনে তিনি আর মাছ ছুঁতে পারবেন না। কাতলার দুটো মুড়ো ও টাকরার সঙ্গে মুগের ডাল দিয়ে ঘণ্ট রেঁধেছেন পরিপাটি করে। ছেলেপুলে হয়নি বড়বউয়ের—মাছ খাবার মানুষ নিতান্তই একলা তিনি। দুপুরবেলা একটা মুড়ো হয়ে গেছে, বাকিটা রাত্রের জন্য—

এমনি সময়ে কবিবাজকে অন্তর্জলীতে নামাচ্ছে, আর শেষ সময়ে জড়িত কণ্ঠে তিনি বড়বউয়ের নাম করছেন। বড়বউকে খুঁজে পাওয়া যায় না। পাবে কি করে? রান্নাঘরে খিল এঁটে রাত্রের মুড়োটা চিবিয়ে নিচ্ছেন তাড়াতাড়ি। জীবনের এই শেষ মুড়ো-খাওয়া। অতিকায় বস্তুটা সাপটানো সহজ নয়, দেরি কিছু হবেই।

বিধবা হওয়ায় পরে বড়বউয়ের নিজের মাছ খাওয়া বন্ধ, সেটা অন্য দশ রকমে পুষিয়ে নেন। অন্যদের ডেকে ডেকে মাছ খাওয়ান খুব। পরকে খাইয়ে নিজে খাওয়ার সুখ খানিকটা পাওয়া যায়। ছোকরারা খাচ্ছে—বুড়োঅথর্ব অম্বলের রোগি দেখবেন সামনে বসে এটা খাও ওটা খাও করছে। তার কারণই এই।

কবিরাজের শ্রাদ্ধে ভোজ খেতে বসেছি। বিরাট আয়োজন। কেশবপুর গঞ্জের তৈলাক্ত বাছা বাছা কই—রান্না হয়ে গিয়ে আরও যেন রাজপুত্রের চেহারা খুলেছে। কাপড়ের খুঁট ঢিলে করে মুখোমুখি দু-সারিতে সব বসেছে—পাল্লা হবে ওই কইমাছে। এক কুড়ির (কইমাছের কুড়ি চব্বিশটায়, তার উপর দুটো ফাউ; মোট ছাব্বিশ) নিচে যে খাবে, তার নাম ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কইয়ের দু-পাশে কাঁটা

থাকে, কাঁটা গলায় বিঁধে গেল তো চিত্তির। কাঁটা কি করে বেরবে, সে ভাবনা পরে। গলাধঃকরণের অসুবিধায় আপাতত হেরে তো গেলেন ভোজের পাল্লায়। কাঁটায় আহত হয়ে রণশায়ী হলেন। সেইজন্যে কায়দাটা হল—কানকোর নিচে থেকে একপিঠের মাছটুকু টেনে মুখগহ্বরে ঢুকিয়ে দিলেন; উলটে ফেলে তারপর অনুরূপ প্রক্রিয়ার ও-পিঠের মাছটুকুও। মাথা ও কাঁটা পাতের পাশে রেখে দিয়ে ধরলেন আর একটা মাছ। হাতে-মুখে চেপে ধরে খুব দ্রুত খাচ্ছেন। লোভ করে মাথা-কাঁটা চিবতে গেছেন কি নির্ঘাৎ হেরে মরবেন। ওগুলো গুণতির সময় লাগবে—হার-জিত নির্ণয় কাঁটা গণে দেখে।

রসগোল্লা খাবার নিয়ম—(ছানা তৈরি বেআইনি হবে নাকি। কী বিপদ! ছবি দিয়ে দেব তখন লেখার এইখানটা, রসগোল্লার বিশদ বর্ণনা দেব। নয়তো ভবিষ্যৎ পাঠকের মাথায় ঢুকবে না।)

রসগোল্লা খাবার মুখে রসটা আধাআধি বের করে দেবেন আগে। রসে বড্ড পেট ভরে যায়। আবার রস না থাকলেও চিবিয়ে চিবিয়ে দাঁত ব্যথা করে। নাম-করা খাইয়ে ইন্দিরদাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, চিংড়িমাছ কতগুলো পারেন? বললেন, কী করে বলি ভাই! খাওয়ার পক্ষে ও-জিনিস ভাল নয়। পেটে জায়গা থেকে যায়, কিন্তু দাঁতে খিল ধরে গিয়ে চিবতে পারিনে।

কবিরাজের শ্রাদ্ধে আমি সেই রসগোল্লার খেলা দেখালাম। সব কাজেরই হিসাব-নিয়ম আছে। বহুদর্শিতার ফলে আমার দু-আঙুলে আন্দাজ এসে গেছে—আঙুলের চাপে যথাযথ রস নিংড়ে টুকটুক করে মুখবিবরে ফেলছি, আর গিলে যাচ্ছি। পরিবেশন করতে এসে বালতি হাতে মানুষ তাজ্জব হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। খবর শুনে আত্মীয়কুটুম্বরা ছুটে ভোজের সভায় এলেন। শেষ পর্যন্ত গৃহকর্ত্রী বড়বউঠাকরুনও আর পারেন না—বেরিয়ে এসে মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছেন। ঘিরে দাঁড়িয়েছেন সকলে। ভারি জমে গিয়েছে।

দাও, আরও দাও। পাঁচ-দশটা করে কতক্ষণ দেবে, বালতি উপুড় কর ছোকরার পাতের উপর।

করুক না তাই। কতক্ষণ! হাত-মুখের কাজ এমন দ্রুত, নজরে ধরা যাবে না। গুঁটিখেলা দেখেছেন—গুঁটির পর গুঁটি একনাগাড় উঠছে পড়ছে—আমার রসগোল্লা খাওয়াও নাকি তাই। ভাঁড়ারে ওদিকে তোলপাড় পড়েছে, বুঝতে পারছি—

মেয়েদের ওদিকটা রসগোল্লা দেখিয়ে কাজ নেই—কি জানি, কদ্দূরে গিয়ে ঠেকবে বোঝা যাচ্ছে না।

খবর নিতে পাঠাও, নিশি-ময়রার দোকানে তৈরি রসগোল্লা কি পরিমাণ আছে। একটাও যেন বাইরে বিক্রি না করে।

খেতে খেতে চোখের মণি লাল হয়ে যায় শুনেছি। তাই দেখেই সম্ভবত বড়বউ সস্নেহে মাথায় হাত রেখে বললেন, এই অবধি থাক বাবা। আবার একদিন নেমন্তন্ন করব।

তারপরে, শোনা কথা অবশ্য আমার– অবেলায় আরও একবার স্নান করে নিয়ে বড এক তোলোহাঁড়ি রসগোল্লা সহ বড়গিন্নি ঘরে ঢুকে দরজার খিল এঁটে দিলেন। ভোজ সারা হয়ে গেলে হাঁড়িগুলোর চাড়া মাত্র অবশিষ্ট থাকবে, এই ভেবেই বোধহয় এত-দূর ত্বরা।

রাখাল কবিরাজের শ্রাদ্ধের ভোজে এই কাণ্ড! মরার পরে আত্মা নাকি দেখতে পান সব, কেবল হাঁক পাড়তে পারেন না। কবিরাজ আমাদের সাদামাঠা খাওয়া দেখেই চক্ষু কপালে তুলতেন: শুনে রাখ বাপসকল, লোকে কখনো না খেয়ে মরে না; খেয়ে খেয়ে মরে। তোমরা মরবে।

সেই মানুষ তো আগেভাগেই মরে বায়ুভূত হয়ে নিজের শ্রাদ্ধে ভোজের খাওয়া দেখলেন। স্ত্রী দরজা এঁটে দিয়ে কোন কর্মে রত আছেন, তা-ও নিশ্চয় প্রেতাত্মার নজর এড়াল না।

বড়বউয়ের কথা হতে হতে প্রাতঃস্মরণীয় পিতামহ মুকুন্দদেবের কথা উঠে পড়ল এবার।

রায়তোড়ের রাজাবাবুদের বিরাট অতিথিশালা—মুকুন্দ এসে অতিথি হয়েছেন। যথাকালে নিয়মমাফিক সিধে এসে গেল—চাল-ডাল-ঘি, নুন-মশলা, বেগুন-কাঁচকলা ইত্যাদি ইত্যাদি। কর্তামা'র খাস-দাসী এসে অতিথিশালার ঘরে ঘরে উঁকি দিয়ে দেখে যায় অতিথিদের সেবা সারা হল কি না। কর্তা-মা হলেন বড়তরফের যিনি রাজাবাবু, তাঁর গর্ভধারিণী জননী। দাসী গিয়ে খবর দেবে প্রতিটি অতিথি পরিতুষ্ট হয়ে সেবা নিয়েছেন, কর্তা-মা শুনে নিয়ে তখন আহারে বসবেন।

মুকুন্দ ঘোষাল বারান্দায় চুপচাপ বসে তামাক টানছেন। সিধের আনাজপত্র যেমন-কে-তেমন পড়ে আছে, মুকুন্দ স্পর্শ করেন নি। দাসী দেখে অবাক: আড়াই প্রহর হতে যায়, ভাত রাঁধলেন না ঠাকুরমশায়?

মুকুন্দ বেজার মুখে বলেন, চাল নেই—ভাত হবে কি দিয়ে?

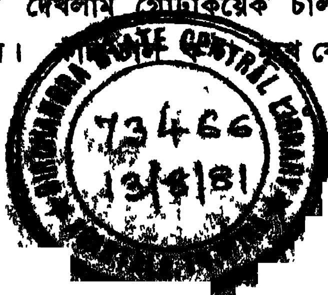
কর্তা-মার কানে গেল। দেওয়ানজীর চাকরি যায় বুঝি এবারে। অতিথিশালা তাঁর দেখবার কথা, সরকারের উপর ভার চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন তিনি। রাজাবাবু খেয়েদেয়ে দিবানিদ্রার উদ্যোগে ছিলেন, হন্তদন্ত হয়ে নিজে তদারকে চলে এলেন: কী ব্যাপার, চাল আসেনি কেন?

সরকার হাহাকার করে এসে পড়ে: যথাধর্ম বলবেন ঠাকুরমশায়! নিজে আমি চাল মেপে পাঠিয়ে দিয়েছি।

কত পাঠিয়েছিলে?

আড়াই পোয়া—

মুকুন্দ সহজ ভাবে হেসে বললেন, তাই হবে। বারকোশের একদিকে দেখলাম গোটাকয়েক চাল। চান করে এসে ক্ষিধে পেয়েছিল। ... ফেলে ঘটিখানেক জল খেয়ে বসে



আছি। ভাত রাঁধবার জন্যে যে ওই ক'টি চাল, সেটা বুঝি কেমন করে? রান্নার চাল পরে আসবে, তাই ভেবেছিলাম।

হৈ-চৈ পড়ে গেল। এতদিনে খাইয়ে-মানুষ একটি পাওয়া গেছে বটে! অতিথিশালা বানানো সার্থক। ধামা ভরতি চাল, গামলা ভরতি ডাল এবং বড় ডেকচি এলো। বড্ড বেশি বেলা হয়ে গেছে—দরকার মতো চাল-ডাল নিয়ে এ-বেলাটা খিচুড়ি হোক ঠাকুরমশায়ের। রাতে তারপরে ভাল করে দেখা যাবে।

স্ফূর্তিতে মুকুন্দঠাকুর রান্না চাপালেন। খাওয়া শেষ হতে প্রায় সন্ধ্যা। খাওয়া দেখবার জন্য লোকারণ্য অতিথিশালায়।

রাত্রিবেলা পাকশাকের বন্দোবস্ত ভিতর-বাড়িতে, অতিথিশালায় নয়। অতিথিশালা বাইরে বলে কর্তা-মা নিজে তখন আসতে পারেননি, লোকমুখে শুধু শুনেছেন। স্বচক্ষে এবারে দেখবেন। সমস্ত আয়োজন কর্তা-মা নিজেব হাতে করেছেন। অধীর হয়ে আছেন কতক্ষণে সেই ভোজনের শুভক্ষণ আসে।

আমিষ-নিরামিষ তরকারিব কড়াই, গব্যঘৃতের বয়েম, তিন হাঁড়ি দই, মিষ্টিমিঠাই-এর ঝুড়ি—বিশাল বগিথালার চতুর্দিকে সমস্ত উপকরণ সাজিয়ে নিয়ে ঘোষালঠাকুর বসে গেলেন। এবং ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে দেখা গেল অধ্যবসায়েব গুণে সবগুলো পাত্রের মাল সাবাড়। ব্রাহ্মণসজ্জনের শতঅর্ঘ্য বলে পাতে ভাত রেখে যেতে হয়। কিন্তু ভাত যে কয়টি পড়ে আছে, একটা একটা করে গণেও একশ পুরবে কিনা সন্দেহ।

কর্তা-মা বলেন, মেহনত অনেক হয়েছে ঠাকুরমশায়, বিশ্রাম করুনগে। বড় আনন্দ দিলেন। সকালবেলা যাবার আগে ভোজন-দক্ষিণা নিয়ে যাবেন কিন্তু। দক্ষিণা না দিলে ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফল হয় না।

ছেলেকে বললেন, হাতির খোরাক বলে থাকে, মুকুন্দঠাকুর তো একগণ্ডা হাতিকে তল করিয়ে দেন। ঠাকুরের কী আর সঙ্গতি,

খোরাক জোটাবেন উনি কেমন করে? তুমি বাবা ব্যবস্থা করে দাও, ব্রাহ্মণসন্তানকে যাতে সিকিপেটা খেয়ে জীবন কাটাতে না হয়।

মায়ের আদেশে তিরিশ বিঘে ব্রহ্মোত্তর দিলেন মুকুন্দ ঘোষালকে। রাজা নৃপভূষণের শিলমোহরযুক্ত তায়দাদ বড়বউঠাকরুনের বাপের বাড়ির সিন্দুকে আজও সযত্নে রাখা আছে।

॥ তিন ॥

বানানো মনে হচ্ছে?

আধ-মুনে মুকুন্দর কথা সঠিক জানিনে। এমনি গল্প আরও অনেকের নামে শোনা যায়। একজন হলেন সন্তোষ রায়। ইতিহাসের মানুষ তিনি—বড়শের সাবর্ণ-বংশের আদিপুরুষ। খাজনার দায়ে মুর্শিদাবাদে নিয়ে রায়মশায়কে আটক করেছে। আলীবর্দী খাঁর আমল। নবাবের লোক একপাল ছাগল তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, রায়মশায় তার মধ্যে পছন্দসই একটা কেড়ে নিলেন। এবং নিজের পাচক দিয়ে রান্না করিয়ে গোটা ছাগলের মাংস একাই শেষ করলেন। আলীবর্দীর দরবারে নালিশ হল।

কি ব্যাপার রায়মশায়?

সন্তোষ রায় দোষ স্বীকার করে বললেন, ক্ষিধের জ্বালায় করতে হয়েছে। গোড়ায় নবাব বিশ্বাস করেননি—এই আপনারই মতো, বানানো গল্প বলে আপনি যেমন উড়িয়ে দিচ্ছেন। সন্তোষ রায় আবার একটা আস্ত ছাগল খেয়ে নবাবকে দেখালেন। আলীবর্দীর মালুম হল অবস্থাটা: খাইখরচা যার এমন, সে মানুষ খাজনা দেবে কোথা থেকে?

খাওয়ার গুণে প্রসন্ন নবাব ডায়মণ্ডহারবারের কাছাকাছি একটা নতুন মহালের বন্দোবস্ত দিলেন—খোরাকিমহাল হল তার নাম।

ইতিহাসের কাহিনী—না বলতে পারবেন না। এবং মুকুন্দর

ব্যাপারে না হলেও, অন্য যত-কিছু এরা বলছে আমি নিজেই কত ক্ষেত্রে ঠিক ঠিক সেই জিনিষ দেখেছি। লক্ষ্মীঠাকরুন এককালে অঢেল বিতরণ করে করে ইদানীং কঞ্জুষ হয়ে গেছেন। কিউয়ে দাঁড়িয়ে আজ মানুষের অর্ধেক সময় কেটে যায়।

সে যাকগে। পিতামহ মুকুন্দকে সেরে আবার এরা বড়বউঠাকরুনের কথায় ফিরে আসে। রাখাল কবিরাজের সঙ্গে বিয়ে হল, সেই ঘটনা।

বিয়ের সম্বন্ধ করতে গাঁয়ের কয়েকটি মাতব্বর বারান্দির ঘোষাল-মশায়দের বাড়ি গিয়েছিলেন। আমাদের নব-জেঠাও তার মধ্যে। বিলপারের গ্রাম বারান্দি। ওখানকার মানুষের মাছ ধান আর দুধ তিনটে বস্তুর অভাব নেই—খেয়ে ফেলে ছড়িয়েও তারা কূল পায় না। ঠিক সেইজন্যে ইস্কুল-পাঠশালার তেমন রেওয়াজ নেই। বলে, চাকরি-বাকরি করব না কেউ কোন-পুরুষে। শখ করে এক-আধখানা চিঠি-পত্তর লেখা। সেটুকু বিদ্যের জন্য সারা দিনমান বেঞ্চিতে বসে বকম-বকম করতে হয় না। নাইতে-খেতে-ঘুমুতে বিদ্যেটুকু আপনিই এসে যাবে।

এ হেন বারান্দি গাঁয়ে গিয়েছেন মেয়ে দেখতে। মেয়ে পছন্দ-অপছন্দ পরের কথা—গৃহস্থবাড়ি ভদ্রলোকেরা এসেছেন, আপ্যায়নের কী ব্যবস্থা! বিলপারে আবাব ডাঙাঅঞ্চলের মানুষের সম্পর্কে সন্ত্রস্ত ভাব আছে। মাছ-ধান-দুধ অঢেল হওয়া সত্ত্বেও ভব্যতার দিকে ওঁরা কিছু নিরেশ ডাঙাঅঞ্চলের তুলনায়। ভব্য মানুষ স্বল্পাহারী হয়—অন্তত সেই ভাব দেখায় লোকসমাজে। অতএব খাদ্যবস্তু কুটুম্বদের পাতে কম করে দিতে হবে। আবার এত কম নয় যে, উপোসি অবস্থায় ফিরে গিয়ে বদনাম করবেন। অনেক বিচার-বিবেচনা অন্তে দশটা বড়-সাইজের পারশেমাছ-ভাজা দেওয়া হল এক-একজনের পাতে। মাছ-ভাজা অবশ্য প্রথম পদের বস্তু—ঝাল-ঝোল ইত্যাদির মাছ পরে রয়েছে। নব-জেঠা জীবনভোর এই গল্প করে গেছেন। ফিরে এসে শতকণ্ঠে সকলের কাছে তারিপ করেন: মেয়ে ফর্সা কি

কি কালো লম্বা কি ঢেঙা—ও-সমস্ত বুঝিনে। এই ঘরের মেয়ে চাপাতেই হবে রাখালের স্কন্ধে। না খেয়ে খেয়ে হতভাগা যে ক'-পয়সা জমাবে, খাউন্তি বউ খেয়ে-খেয়ে তা শেষ করবে। জমাখরচের জের টেনে বেড়াতে হবে না।

বিয়ে সাব্যস্ত। বরযাত্রী বাছাই করতে নব-জেঠা এবার উঠে পড়ে লাগলেন। বারান্দির মতো জায়গায় যাচ্ছেন, উদরে দরাজ স্থান না হলে দুয়ো দেবে কুটুম্বরা। খাইয়ে-মানুষ বাইরের চেহারায় ধরা যায় না। রোগা-ডিগডিগে মানুষ, দেখা গেছে, পাহাড়ের মতো পালোয়ানকে নস্যাৎ করে যাচ্ছে খাওয়ার ব্যাপারে। মানুষটির সর্বসাকুল্যে যে ওজন, খাদ্য যা টানল তার ওজনও প্রায় তাই। এ ব্যাপার অনেকেই দেখেছেন। আমাদের ইন্দিরদা থাকতে তো হামেশাই দেখতে পেতাম। চুল থেকে পায়ের নখ অবধি খোল থাকে বোধহয় এঁদের। পাশবালিশের খোলের মতন। নতুবা শুধুমাত্র একটি উদরে অত স্থান কী করে সম্ভব? ভোজ খাওয়ার পরে ইন্দিরদা ঘাড় নিচু করতেন না, বলতেন, টাকরা অবধি উঠে আছে—নিচু হলেই বেরিয়ে আসবে। একটা হজমিগুলি খাবার কথা কে বলেছিল—ইন্দিরদা বিষণ্ণমুখে বললেন, অত ঠাঁই থাকলে একটা রসগোল্লাই তো ঢুকিয়ে আসতাম। ক্ষণজন্মা এসব মানুষ—বেশি দিন মরজগতে থাকতে পারেন না। ইন্দিরদা থাকলে আজ মেজজেঠার ভাবনা কি! তাঁকে নিয়ে ভোজের আসরের ঠিক প্রথম পাতাখানায় বসাতেন। ইন্দিরদা'র প্রয়োজন মিটিয়ে পরিবেশনকারী তবে তো আসরের ভিতরে ঢুকবে—সেটা বড় সহজসাধ্য হত না।

বিয়ের রাতের খাওয়াদাওয়া—ভোজ তাকে বলা চলবে না, জলপান। অন্ন জাতীয় কিছু নয়, লুচি বা ছানা। ছানা সেকালে কর্তাদের আমলে হত, এখন লুচির চলনটা বেশি। সামাজিক ভোজ হল পরের দিন—বাসিবিয়ের দিন। মাধ্যাহ্নিক-ক্রিয়া বলে নিমন্ত্রণ,

কিন্তু হতে হতে রাত্রি দেড়-পহর দু-পহর। এমন কি ভোজ সারা হল আর পূবে ফরসা দিয়ে পাখিপাখালি ডেকে উঠল, এমনও হয়ে যায় অনেক বাড়ি।

বিয়ের রাতের খাওয়া খেয়ে নব-জেঠা বড় মনমরা হয়ে আছেন। অঢেল আয়োজন, উপাদেয় রান্নাবান্না—কোন রকম খুঁত বের করা গেল না। এতজনের মুখের উপর দিয়ে নিখুঁতভাবে ক্রিয়াকর্ম সেরে নামযশ নিয়ে যাবে, দল বেঁধে কি জন্য তবে বিল পার হয়ে আসা? ভোজের প্রসঙ্গ তুলে কেউ কেউ তড়পাচ্ছেন: আচ্ছা, আজকেই তো আসল, ক্ষমতা আজ দেখিয়ে দেব।

নব-জেঠা কিছুমাত্র ভরসা পান না। ধর্মযুদ্ধে বাবান্দির লোকের সঙ্গে পারা যাবে না—কালকের ব্যাপারের পর নিঃসংশয় তিনি একেবারে। উঠতি মুলো পত্তনে চেনা যায়। পনের-বিশখানা লুচি চিবিয়ে যারা এলিয়ে পড়ে, তারাই আবার লম্বা লম্বা বচন ঝাড়ে!

আমি বললাম, সন্ধ্যে অবধি ভাবনার অঢেল সময় পাবেন জেঠামশায়। কনে-পক্ষ আমাদের চান করে নিতে বলছেন। ভোজে পোলাও—দুপুরবেলা চাট্টি সাদাভাতের ব্যবস্থা হয়েছে। আমি বলি কি, সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে একটা লম্বা ঘুম দেওয়া যাক। শরীর চাঙ্গা হবে, ভোজে তা হলে টান বাড়বে।

তাই হল। ভাতের সঙ্গে তরকারি মোটামুটি সবই আছে। দু-এক টুকরো মাছও পড়বে। তবে কাজের বাড়িতে নিতান্তই আঁশমুখ করানো ছাড়া তাকে কি বলা যায়! দরদালানে বরযাত্রীরা সব খেতে বসেছি। বড়বউঠাকরুনের বাপ নিবারণ ঘোষাল দশকাজের মধ্যেও গলবস্ত্রে এসে দাঁড়ালেন: নিতান্তই ডাল-ভাত। ভোজ হতে রাত্তির হয়ে যাবে, দয়া করে কোন রকমে পিত্তিরক্ষে করে নিন।

ঘুরে ঘুরে সকলের খাওয়া দেখছেন নিবারণ। কৃষ্ণপদ ছোকরার গলার সুর মিঠে, গানবাজনা করে সে ভাল। শুধুমাত্র খাইয়ে নয়—নানা গুণের গুণী একজন দুজন থাকা উচিত বরযাত্রীর মধ্যে। কৃষ্ণপদ

গানের সুবাদে এসেছে। আকৃতি মোটা, বুদ্ধিও তদনুরূপ—এই হয়েছে মুশকিল। একটু ক্ষোভেরও কারণ ঘটেছে তার। একবার ডাল দিয়ে যাবার পর কৃষ্ণপদ আবার বুঝি ডাল চেয়েছিল। পরিবেশনের লোক হয় শুনতে পায়নি, নয়তো ভেবেছে—মাছ নিয়ে আসছি, ডাল খাবে কী এখন। মোটের উপর ডাল চেয়ে পেল না কৃষ্ণপদ। গাঁয়ের মধ্যে অন্য সময়ে সে হল কেষ্টা—কিন্তু বরযাত্রী হয়ে এখন সে অখণ্ড শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ হালদার। পান থেকে চুন খসলে রেহাই দেবে না।

নিবারণ বিনয় করে বলছেন, ডাল-ভাত মাত্তোর—কোন রকমে পেট ভরে নেবেন, নইলে নিজেরাই কষ্ট পাবেন।

কৃষ্ণপদ বলে বসে, ডাল-ভাত—তাতেও ডাল লাগে মশায়।

অ্যাঁ, সে কী কথা! ডাল পান নি আপনি? কে আছ, শিগগির ডালের মালসাটা নিয়ে এস ইদিকে।

এই বিপুল আয়োজন। বিয়ের ভোজে মাংস দেবার রেওয়াজ নেই—আর্ত জীব ভ্যা-ভ্যা করবে গলায় কোপ পড়বার সময়, শুভকর্মের সঙ্গে সেটা খাপ খায় না। ঐ মাংসটা বাদ দিয়ে পল্লীগ্রামে যত কিছু ভাবতে পারা যায়, সমস্ত আছে। তবু সামান্য ডাল নিয়ে এ হেন অপমানের কথা শুনতে হল—নিবারণ দিশাহারা হয়ে পড়লেন একেবারে।

কী আশ্চর্য, ডাল দেয় নি আপনাদের?

চুপচাপ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবার অবস্থা নেই, জ্বলতে জ্বলতে তিনি রান্নাঘরের দিকে ছুটলেন। কী কুরুক্ষেত্র বেধে যায় দেখ এইবার। কেষ্টাকে সকলে গালমন্দ করছে।

নব-জেঠা পংক্তির গোড়ায়। হুঙ্কার দিয়ে তিনি সকলকে থামিয়ে দিলেন: বকাবকি যা করতে হয়, বাড়ি গিয়ে। এখন অন্য ব্যাপার। কথা যখন একটা বলে ফেলেছে, কোট বজায় রাখতে হবে। যাক প্রাণ, রোক মান—

নিবারণ এই সময় ছুটে এসে ঢুকলেন। পরিবেশনের লোক তাঁর পিছু পিছু—হাতে মালসা-ভরা ডাল। কৃষ্ণপদর কাছে গিয়ে বলেন, ইনি নাকি ডাল পান নি? দাও ডাল, আরও দাও—

পাঁচ হাতা দেওয়া হয়ে গেছে, নিবারণ শুনবেন না। ক্রমাগত বলছেন, দাও ডাল—আরও, আরও। ডাল-ভাতের খাওয়া—তা ইনি বললেন, ডালই নেই—

কৃষ্ণপদ বিপন্নমুখে এদিক-ওদিক তাকায়। ডালের স্রোতে ভাসিয়ে দেয় যে একেবারে!

গতিক বুঝে নব-জেঠা হাঁ-হাঁ করে উঠলেন: শুনুন ও বেহাইমশায়, ডাল তো আমরাও পাইনি। শুধু একজনকে দিলে হবে না।

আপনিও পাননি? এদিকে আনো মালসা, এঁকে দাও।

শুধু আমি কেন, কেউ পায়নি আমাদের মধ্যে। দু-হাতা চার হাতা কী ডাল দিচ্ছেন মশায়! মালসা নিয়ে এসেছেন—অমনি মালসা এক-একটা রেখে যান সকলেব পাতের কাছে। তাব পরে জিজ্ঞাসা করবেন, কে আর ক'টা মালসা নেবে।

নিবারণ হতভম্ব হয়ে যান এক মুহূর্ত। কিন্তু মুহূর্তমাত্র। বড়ভোজের ডাল নেমে গেছে, তবে আব ভাবনা কিসের? এই ডালে মানরক্ষা হোক, ভোজের জন্য পবে আবার রান্না হবে। কিন্তু বসেছেন ষাট জনে, অত মালসা পাওয়া যায় এখন কোথা? কুমোববাড়ি লোক ছুটল, সেখান থেকে কতকগুলো আনল। আর এ-বাড়ি ও-বাড়ি নতুন পুবানো মিলিয়ে মালসাব জোগাড় হয়ে গেল।

কন্যাপক্ষ এই ব্যাপারে ছুটোছুটি করছেন, আর নব-জেঠা ছেলেদের তাতিয়ে দিচ্ছেন এদিকে: ভাবনা কোর না বাপসকল। পেট নয়, চামড়ার থলি। দেখতেই ছোট—যত খাবে, ফুলে ফুলে আরও জায়গা করে দেবে। জন প্রতি গড়ে দু-মালসা করে সাপটানো যাবে না? তা হলেই হবে। কোন রকমে গলা দিয়ে নামিয়ে দাও, তার পরে বিলের ধারে বটতলায় ধীরেসুস্থে বসে না হয় বমি করে

দিও। যাক প্রাণ, থাক মান! আমি বুড়োমানুষ মুখপাতে আছি—আমি যদি পারি, জোয়ান-যুবো তোমাদের হেরে গেলে হবে কেন?

মালসা দেওয়া হল প্রতিটি পাতার পাশে। ডাল ঢেলে দিয়ে যাচ্ছে মালসায়। পুরো মালসা নয়, অর্ধেক আন্দাজ। বলে, খেতে লাগুন না। যেমন যেমন খাবেন, আবার দিয়ে যাব।

ডাল আর কতই বা রান্না হয়, দশটা ভাল ভাল তরকারির মধ্যে কতটুকুই বা খায় লোকে ডাল! ভোজের ডালও সমস্ত কাবার হয়ে যায়। দু-হাতে মালসা ধরে আমরা ডালে চুমুক দিচ্ছি। শেষ করে বলি, কই—নিয়ে আসুন।

ভাতের ফ্যান মিশিয়ে বেশি করছে ডাল। শেষটা ফ্যানও নেই, তখন গরম জল মেশায়। তাতেও কুলায় না। দোকানে ছুটোছুটি করে ইতিমধ্যে ডাল কিনে নিয়ে এসেছে—কিন্তু কাঁচাডাল রান্না করবার সময় চাই তো একটা। ততক্ষণ পাত কোলে করে বসে থাকবে মানুষগুলো—বিশেষ করে এই সব বরযাত্রী-মানুষ? সময় বুঝে নব-জেঠা একটুখানি ঠাট্টা ছাড়লেন নিবারণের দিকে: ও বেহাই-মশায়, শুধুই যে হলুদ-গোলা আপনাদের রাঁধা-ডাল। জলের মধ্যে ডাল ছাড়তে ভুলে গিয়েছিল নাকি?

নিবারণ ঘোষালের কাঁদ-কাঁদ অবস্থা। বরযাত্রী আমরাও বুঝতে পারছি, অবস্থা রীতিমত সঙ্গিন। মরি-মরি করে আর দু-পাঁচটা মালসা টানতে পারলেই রণজয় নির্ঘাৎ। পরিবেশনের লোক বলে, মাছের কালিয়া একটু চেখে দেখুন না মাঝখানে। নিয়ে আসব? মুখ বদলে নিন। খেলে দেখবেন, পেটে আরও বেশি রকম টান ধরেছে।

এ চালাকি একটা শিশুও বোঝে। সময় চাচ্ছেন ওঁরা। মাছের কালিয়া খাওয়া চলবে, বারম্বার এসে মাছ যাচাই হবে—সেই ফাঁকে দাউদাউ করে উনুন জ্বালিয়ে ডাল ফোটানো হবে তাড়াতাড়ি। অন্তত দুটো কড়াই যদি নামিয়ে নিতে পারেন, কোনক্রমে আর পারা যাবে না। হল্লোড় লাগিয়েছি আমরা অতএব: মুখ বদলাতে কে চায়

মশাই? ডাল চলছে—তাই আনুন না। ডাল চাই—আরও ডাল। ডালের যোগাড় নেই তো মুখে জাঁক করা কেন ডাল-ভাত বলে?

পরিপূর্ণ পরাজয়। নিবারণের আর দেখা নেই। ঘরে দরজা দিয়েছেন, কিম্বা কোন জঙ্গলে গিয়ে বসে আছেন। এত রকম আয়োজন করেও মাথা হেঁট হয়ে গেল ডালের কারণে।

এর পরে একবার নিবারণ ঘোষাল আমাদের গ্রামে মেয়ের বাড়ি এসে নব-জেঠাকে বললেন, আস্ত রাক্ষস ধরে ধরে বরযাত্রী করে নিয়ে গিয়েছিলেন। লোকে মাছ-মাংস খায়, দই-মিষ্টি খায়। পায়সও খায় কেউ কেউ। কিন্তু মুখপাতে ডালই খেতে লাগল দু-মালসা চার মালসা। এমন তো জন্মে দেখিনি—

নব-জেঠা খানিকক্ষণ ধরে হেসে নিলেন: বাড়িয়ে বলছেন বেহাইমশায়। গিয়েছিল রোগাপটকা নিখাউন্তি কতকগুলো। থাকত আমাদের ইন্দির—খাওয়া কাকে বলে দেখিয়ে আসত। দশ গ্রামের লোক হাঁ করে চেয়ে থাকত।

আমার পিঠে থাবা মেরে নব-জেঠা পবিচয় দিলেন: এই আমার ভাইপো। মাছ নইলে ভাত রোচে না। পাকা-রুই কিংবা কাতলা। আম্বা আছে, কিন্তু খায় কতটুকু! এ বেলা তিন-চার গণ্ডা দাগা, ওবেলাও তাই। ওজনে কত আর—দেড়সের সাতপোয়া? এ ছোঁড়াও বরযাত্রী হয়ে চলল। ছ্যা ছ্যা, এ কি আব [illegible]'কের কাছে পরিচয় দেবার মতন?

সর্বনাশ, গল্প থামিয়ে কী করে তাকাচ্ছে দেখুন। চিনে ফেলেছে তবে। আমায় নয়, আপনাকে। ভুল হয়ে গেল, আপনি যে সাজ-পোষাক করে আসেন নি। অর্থাৎ ছেড়ে আসেন নি শহুরে সাজ। উদ্বাস্তু নামধেয় যে জাতটা দেখা দিয়েছে, ইস্ত্রি-করা জামা আর পালিশ-করা জুতো তাদের থাকে [illegible]। অতএব প্রমাণ হল,

ভিন্ন রকম মানুষের ভেজাল ঢুকে পড়েছে। আপনি সেই মানুষ, সেদিন অবধি যা ওরা ছিল। লজ্জা পেয়ে চুপ হয়ে গেছে, আর এখন মুখ খুলবে না। উঠে পড়ুন—

দেখে নিন—আহা, স্টেশন জুড়ে কী গৃহস্থালীর বাহার! মেটে-কলসি মেটে-কড়াই তিনখানা টুকরো-ইটের উনুন—কোথা থেকে ভাঙা চুপড়ি একটা কুড়িয়ে এনে তাই ভেঙে ভেঙে উনুনে দিচ্ছে। রন্ধনশালার কাজ শুরু হয়ে গেল। ছেঁড়া শাড়িতে আষ্টেপিষ্টে মুড়ে কাটারি পেতে বউটা আনাজ কুটছে। বড্ড চেনা লাগে যে বউটার ধরন-ধারন!

বাচ্চাগুলো চুপচাপ এতক্ষণ গল্প শুনছিল, গল্প বন্ধ হওয়ায় তড়াক করে উঠে খেলায় নামল। একটা ভাঙা পোর্টম্যাণ্টো বেড় দিয়ে ছুটোছুটি। ছেঁড়া চট কিম্বা যা-হোক কিছু পেতে সন্ধ্যাবেলাতেই মহানন্দে কতজনা ঘুম দিচ্ছে—কর্মহীন মানুষ কি করবে? মাটির গেলাসে জল খেয়ে ধুয়েমুছে সন্তর্পণে রেখে দিল খুনখুনে বুড়োমানুষটি—সাত রাজার-ধন মাণিক তিলেক অসাবধানে অন্য কেউ হরণ করে নেবে এমনিতরো ভাব। এরই মধ্যে বই শেলেট নিয়ে মনোযোগে বিদ্যাভ্যাস করছে নোলক-পরা মেয়েটা।

চলুন। বউটার মুখ দেখিনি, তবু চেনা-চেনা লাগে। নাকি গৌরী—আমাদের গৌরীরাণী? ছোটবেলা থেকে কলকাতা দেখার বড় শখ—সেই শখ মিটল বুঝি এবার? আর নয়, এক মিনিটও নয় আর এখানে। ভয় করছে, গৌরীর মুখোমুখি পড়ে না যাই।

কাচের বাক্সে রকমারি খাবার নিয়ে খাবারওয়ালা ছুটেছে—তাক করেছে আপনাকেই। খদ্দের ঠাউরেছে—উত্তম জামা-কাপড়ের গুণ। সামনাসামনি বাক্স এনে নামায়।

ছুটেছে গল্পকর্তা সেই লোকটাও। কাতর কণ্ঠ: কিছু মনে করবেন না বাবুমশায়রা। চিরকেলে গৃহস্থমানুষ—ভিক্ষেসিক্ষে আসে না। কিন্তু পুরো দিনের মধ্যে পেটে কিছু পড়েনি, চুপচাপ থাকতেও তো পারিনে।

খাবারের বাক্সর দিকে লোলুপ চোখে তাকাচ্ছে।

সে কী! মাছ নইলে মশায়ের মোটে রোচে না—দুবেলায় মিলে দেড় সের পৌনে দু-সের রুই-কাতলার দাগা। বাক্সে যা দেখা যায়—নিতান্তই নিরামিষ। সস্তার সামান্য মিঠাই—

লোকটা লজ্জায় জিভ কাটল: ওসব কেন কানে নিতে যান? মিছে কথা বাবু, একেবারে বানানো। বড়বউঠাকরুনের কথা হচ্ছিল—ওই যে তিনি শুয়ে। না খেয়ে খেয়ে শুকনো সলতে হয়ে গেছেন—বসবার তাগত নেই, সেইজন্য শুয়ে থাকেন।

আবাব বলে, ছিল কোন-একদিন বাবু, পুবোন গল্প করে ক্ষিধে মারি এখন। পেটে কিছু নেই, সেই সময়টা খাওয়ার কথা বলে সুখ পাওয়া যায়। একটা মোক্ষম কায়দা বলে দিচ্ছি, দরকার মতন খাটিয়ে দেখবেন। যদি কখনো উপোস করতে হয়—কিছু বিশ্বাস নেই বাবুমশায়রা, মহামারী এসেছে, চোখ বুঁজে থেকে যম ঠেকাতে পারবেন না। আমরাই কি কোনদিন ভেবেছি শিয়ালদার উপর এমনি-ধারা পড়ে থাকব? আমার আজ, আপনার কাল—কিম্বা বড়জোর পরশু। সেই উপোসের দিনে বানিয়ে বানিয়ে খাওয়ার গল্প করবেন। বেধড়ক বলে যাবেন– পেট তাতে ভরা-ভরা ঠেকবে।

আরে ছি-ছি, পয়সা দিতে যাচ্ছেন বুঝি– মিঠাই খাবে, তার মূল্য? দয়া তো অঢেল আপনাদের, পুনর্বাসনের কলাও ব্যবসা ফেঁদেছেন—খুচরো সদাশয়তা না-ই দেখালেন! কথায় চিঁড়ে ভেজে না—মুখের শাপশাপান্তে ছন্নছাড়ারা কী আর মন্দটা করবে! সেকালের মানুষ বিবেক নামে কোন এক বস্তুর আর্তনাদ শুনত বুকের নিচে, শঙ্কিত হয়ে স্বার্থহীন এক-একটা কাজ করে বসত। আদর্শ নামে এক মায়াবিনী ছিল, তার পিছনে দৌড়ে মরত। এখন তারা আর শব্দসাড়া দেয় না—আপদগুলো সবংশে নিপাত গেছে অনুমান করি। কম চেষ্টা হয়েছে এর জন্য—সভ্যতার সেই আদিযুগ

থেকে। যাঁদের মুখে নীতিমূলক কথা, বিষ খাইয়েছি তাঁদের। ক্রুশের উপর ফেলে পেরেকে গেঁথেছি। ফাঁসিতে ঝুলিয়েছি, গুলিবিদ্ধ করেছি। বোকামি ও ভীরুতার অবসান বুঝি এতদিনে।

॥ চার ॥

যাবেন আমাদের গাঁয়ে? চলুন যাই।

গেট পার হয়ে রেলিং-ঘেরা প্ল্যাটফরম। গাড়ি চেপে হাসিমুখে বাড়ি যেতাম। আমার সাতপুরুষের বাস্তুভিটায়। যেখানে পথের একটি তৃণ অবধি চেনা আমার।

পাসপোর্ট-ভিসা পকেটে নিয়ে বুঝি ভাবলেন, কেল্লা মার দিয়া! সে জোর খাটবে সাত-সমুদ্র তেরো-নদীর পারে যদি যেতে চান। আমার গ্রাম অনেক বেশি দুর্গম—যদিচ পথের মাপে এক-শ মাইলও হবে না এই শিয়ালদা থেকে। দস্তুরমতো ভোগান্তি আছে, আগেভাগে সামাল করে দিচ্ছি।

বর্ডারের স্টেশনে ট্রেন মড়ার মতন অচল হয়ে রইল। ও-মাথায় গিয়েও অবিকল এমনি। পুলিশ ও কাস্টমসের হুজুররা সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে গজেন্দ্রগতিতে একের পর এক আবির্ভূত হয়ে ইচ্ছামতন গাঁটরি খুলছেন, কোমর টিপছেন, পাসপোর্টের সঙ্গে চেহারা মেলাচ্ছেন, চোখ পাকিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে দাবড়ি দিয়ে উঠছেন ক্ষণে ক্ষণে। প্যাসেঞ্জার মাত্রেই শঠ—এই হল সিদ্ধান্ত; বিপরীত কিছু হতে পারে, তন্নতন্ন পরীক্ষার পরে তবে সেটা বিশ্বাস হবে। সর্বরকম পরীক্ষা অন্তে হাত নেড়ে ইঞ্জিন ছাড়বার হুকুম—সে জিনিস কতক্ষণে হবে, সেটা নির্ভর করছে হুজুরগণের মেজাজ-মরজির উপর। রাত পোহায়ে গিয়ে প্রহরখানেক বেলা হয়ে যায় এক একদিন।

সেই স্বর্ণযুগের কথা বলি। সাড়ে-তিন ঘণ্টায় সদর স্টেশনে

পৌঁছে দিত। এক্সপ্রেস-ট্রেনের বেলা সময় কমিয়ে শেষাশেষি আড়াই ঘণ্টায় দাঁড় করেছিল। এমনি সময় এদেশ-ওদেশ হয়ে টানা-পথের উপর বেড়া তুলে দিলেন। উঃ, কী বুদ্ধি মানুষের—কষ্ট দেবার ও কষ্ট পাবার কত কায়দাই বের করেছে ভেবে ভেবে! সুখও আছে বই কি! শহুরে মানুষ ব্ল্যাক-মার্কেটেরই হদিশ জানেন—ব্লাকে যাতায়াত এবং ব্লাকে মাল-পাচার ব্যাপার দুটো শিখে নিন এইখানে। বর্ডারের গাঁ-গ্রামের একটা অপোগণ্ড শিশু অবধি জানে। কাস্টমস আব বর্ডার-পুলিশের কাজে কত অধমজন তরে যাচ্ছে, ভাগাভাগি না হলে তাদেব পুঁছত কে বলুন দেখি? তাদেব বড সুখ।

ট্রেন থেকে নামলেন তো মোটববাস এবারে। বাস স্টেশনেব উপব এসে দোব খুলে বসে নেই কিন্তু। হাঁটুন। গ্রীষ্মে ধূলো কিম্বা বর্ষায় কাদা মেখে ভূত হতেন, শীতেব দিনে এখন ভালোয় ভালোয় যাওয়া যাবে।

হেঁটে হেঁটে হাজির হব শহবেব কেন্দ্রভূমে চৌবাস্তায়। কপাল ভালো হলে পেতেও পাবি তৈবি বাস। নয়তো অবিনাশ ঠাকুরেব হোটেলেব দাওয়ায হুঁকো টানতে টানতে বাস্তাব দিকে কড়া নজব ফেলে বসতে হবে। ছিপ ফেলে গাঙেব পাডে বসে থাকাব মতন।

বিশ্বাসবাবুদেব বাড়ি। বাস্তা ছেড়ে বিশ কদম এ য়ে যাই চলুন, দেউড়ি পাব হয়ে ঢুকে পড়ি। তাকিয়ে দেখেন কি—ইটের স্তূপ, এই তো দেউড়ি। অন্দবেব দিকে আব বেশি এগোব না। সেকালে লোকে যেত—না বডলোকেব বউ মেয়েদের কড়া আবরু। এখনো যাওয়া ঠিক হবে না। বুনোশুয়োব, কেউটেসাপ, শিয়াল, শেড়েল—বাঘ থাকাও অসম্ভব নয় একেবারে। আবরু ভাঙলে চটেমেটে অনর্থ ঘটাতে পারে। ভাঙাচুরো কয়েকটা দেয়াল—ছোটবাবু শঙ্করমণি বিশ্বাস চিড়িয়াখানা করেছিলেন ওঃ নটা। কত রকমের জন্তু-

জানোয়ার। লোহার জালের সুবৃহৎ খাঁচা বানিয়েছিলেন, তার মধ্যে রংবেরঙের কত পাখি। মানুষজন ঘুরে ঘুরে দেখত। খালি হাতে বড় কেউ আসত না, এটা-ওটা খাবার দিত পশুপাখির মুখে।

ঘোড়ার-গাড়ি হটিয়ে দিয়ে সেই প্রথম আমাদের এ-লাইনে মোটরবাসের চলাচল শুরু। বড়বাবু তারকমণি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে ধরে লাইনটা বিশ্বাস মোটর-সার্ভিসেব একচেটিয়া করে নিলেন। লোকেরও অভ্যাস খারাপ হল ক্রমশ, এক-পা কেউ আর হাঁটতে চায় না। বিশ্বাস-সার্ভিসের দশখানা বাস দিনরাত্রি ছুটোছুটি কবেও সামাল দিয়ে উঠতে পারে না। তিন ভাই বিশ্বাসবাবুরা—তিনজনের ছ'খানা হাতে অবিরত পয়সা কুড়োচ্ছেন। তালুকমুলুক হল দেখতে দেখতে। শহরের কিনারে দশবিঘে ভদ্রাসনের এই অট্টালিকা হল। পয়সা হলে তখন নামকামেব ইচ্ছা হয়। প্রতিপালক সেই ম্যাজিস্ট্রেটকে ধরে রেললাইনের ওধাবে বিস্তর জমি সংগ্রহ করে কলেজ কবলেন বাপেব নামে। বাঘবমণি কলেজ।

রাঘবমণি কলেজেব ছাত্র আমি। লম্বা চালাঘব, গোলপাতার ছাউনি। সেখানে ক্লাস হয় আমাদের। দু-কুঠুবির বহু পুবানো দালান একটা জমির উপরে—তাব মধ্যে অফিস হয়েছে, যাবতীয় কাগজপত্র থাকে। প্রিন্সিপাল ও প্রফেসররা বসেন। তবে এ অবস্থা থাকছে না আর বেশি দিন। সদ্য পুকুব কেটে মাটি তুলে ডাঁই কবেছে, ইট-কাটা হচ্ছে সেই মাটিতে। ক'বছবেব মধ্যে সমস্ত পাকা-দালান হয়ে যাবে।

বাড়ির খেয়ে কলেজ করতে আসে বেশিব ভাগ ছেলে। আমরা ক'জন হস্টেলের। হস্টেলও গোলপাতার ঘর, মাটির মেজে। সিট ভাড়া দিতে হয় না কারো। কলেজের সেক্রেটারি বিশ্বাসবাড়ির ওই তারকমণিবাবুই নিজ খরচায় হস্টেলঘর বানিয়ে দিয়েছেন। ঘর ছাইয়ে দেন বছর-বছর, বেড়া মেরামত করিয়ে দেন। চতুর্দিকে জঙ্গল, সাপখোপের আনাগোনা। বর্ষাকালে মেজে বিষম স্যাঁতসেতে হয়ে

পড়ে। ছেলেদের অতএব মাটিতে শোওয়া চলবে না, যে-যার খাট বানিয়ে নেবে। সেক্রেটারির কড়া হুকুম। বড় বড় বাঁশঝাড় কলেজের আশেপাশে। ঝাড়ের মালিকরা বলে দিয়েছেন, বাঁশের দরকার পড়লে স্বচ্ছন্দে তোমরা কেটেকুটে নিয়ে যেও। খাট বানানোর কিছুমাত্র অসুবিধা নেই। বাঁশ কেটে এনে খাটো মাপের খুঁটি পুঁতে ফেল চারটা, উপরে বাখারি বিছিয়ে নাও। সে খাট নড়ানো-সরানো যায় না, চিরকালের পাকা ব্যবস্থা।

পল্লীগ্রামের ছেলেপুলে সব, বেশি খরচা করে কোন্ গৃহস্থ কলেজে পড়ানোর বিলাসিতা করতে যাবে! কলেজ নতুন বলে খোশামোদ করে নানান রকম লোভ দেখিয়ে ছাত্র আনতে হচ্ছে। ফ্রী পড়ে প্রায় অর্ধেক, বাকি অর্ধেকের মাইনে দেবার কথা। কিন্তু দেয় না বড় কেউ।

কেরানিবাবু খাতায় বাকির হিসাব টেনে টেনে নাজেহাল। প্রিন্সিপালকে তাই একদিন বলছিলেন, দেবে না যখন, এগুলোকেও মাপ করে দিন সার। রাঘবমণি কলেজ পুরোপুরি অবৈতনিক হোক।

ক্ষিতীশ চৌধুরি আমাদেব সেকেণ্ড-ইয়ারের। গ্রাম থেকে এসে কলেজ করে। কেরানিবাবু বলছেন, ক্ষিতীশ তখন সেইখানটা দাঁড়িয়ে। কেরানিবাবুর দিকে নজর হেনে প্রিন্সিপালের কাছে নালিশ করে: মাইনে আমার কিছু বাকি পড়েছে, তাই উনি ঠেস দিযে বলছেন।

প্রিন্সিপাল বলেন, কত বাকি?

কেরানিবাবু বলে দিলেন, ভর্তিব সময়টা সেই যা দিয়েছিলেন। তার পরে উপুড়-হস্ত হন নি। খাতায় জেব টেনে বেড়াচ্ছি।

প্রিন্সিপাল বললেন, দিয়ে দিও তাড়াতাড়ি।

বলতে হয়, তাই বললেন। বলে জল খেতে ঢুকলেন অফিস-কামরায়।

ক্ষিতীশ গর্জন করে ওঠে: না-ই দিয়েছি মাইনে, তা বলে চৌধুরি-ঘরের ছেলে ফ্রী পড়বে, এমন কথা বলে কী করে?

কেরানিবাবু কিছু অপ্রতিভ হয়ে আমতা-আমতা করেন: আপনিই বা গায়ে টেনে নিচ্ছেন কেন? চৌধুরি-চাকি-চক্কোত্তি—ঘরের কোন ইতরবিশেষ নেই। মাইনে কেউ দেন না। আমার এই জের টানার ঝঞ্ঝাট যদি চুকে যায়, সেই সময়টা অনেক কাজ করতে পারি।

ক্ষিতীশের রাগ কিছুতে পড়ে না। গরগর করছে: ফ্রী পড়ার মানেটা কী দাঁড়াল? চ্যারিটি নেওয়া—দান গ্রহণ করে পড়াশুনো। এত বড় অপমানের কথাটা বলতে জিভে আটকাল না আপনার?

কেরানিবাবু সকাতরে বলেন: ভুল হয়েছে ভাই, মাপ চাইছি।

প্রিন্সিপাল সেই সময়টা অফিস থেকে বেরিয়ে ক্লাসে যাচ্ছেন। বলেন, ভুল হয়েছিল সার বলতে। উল্টো বলে ফেলেছি। যারা ফ্রী পড়ছে, তাদের কনসেশন বাতিল করে দিন। হরেদরে হাঁটুজল যখন, ওই ক-জনকে দাগী করে বাখার কী দরকাব!

এই দেখুন, গৌরচন্দ্রিকা ভাঁজতে ভাঁজতে এতক্ষণ গেল, আসল পালায় পৌঁছনো হয়নি। তাড়াতাড়ি সেরে দিচ্ছি। কলেজেব সেক্রেটারি তারকমণিব মেয়েব বিয়ে। কলেজসুদ্ধ নেমন্তন্ন।

এই বিয়ে নিয়ে হৈ-চৈ চলছে অনেক দিন থেকে। নতুন বড়লোক হবার পর ভারী রকমের কাজ বাড়িতে এই প্রথম। তার উপবে পাত্রটি বড় ভাল। ওঁদের সমাজের মধ্যে সর্বোত্তম। এই অল্প বয়সেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছে। পাত্রের বাপও দিক্‌পাল উকিল। রায় বাহাদুর। দু-হাতে খরচপত্র হচ্ছে তাই। বিয়ের দিন তল্লাটেব সকল বিশিষ্ট জনেব পদধূলি পড়বে—বরযাত্রীর মধ্যেও বাঘা বাঘা লোক। নানান জাতবেজাতের ব্যাপার—কার রান্না কে খাবেন না খাবেন, সেজন্য কাঁচা-ফলারের ব্যবস্থা হয়েছে। ছানা, দই, ক্ষীর, বহু রকমের মিষ্টিমিঠাই। বিয়ের পরদিন বাসিবিয়ে। স্বজাতি ও আত্মীয়কুটুম্বের সামাজিক ভোজ সেদিন—গুরুতর রকমের রাজসিক আয়োজন।

আগে থেকেই তারকমণি তড়পে বেড়াচ্ছেন : কাজের মতো কাজ করব একখানা। চিরদিন লোকে নাম করবে—হ্যাঁ, বিয়ে দেখেছিলাম বটে অমুক বিশ্বাসের মেয়ের !

ব্যাপার তাই বটে। গ্রাম ধরে-ধরে গয়লাদের ছানার বায়না দিয়ে এসেছে। বিয়ের দিন দুপুরের ট্রেনের একটা পুরো কামরা বোঝাই হয়ে গয়লারা এসে ছানা দিয়ে গেল। ভলন্টিয়ার হয়েছে ছোঁড়ারা। দলবিশেষে বুকের উপর এক এক রঙের ব্যাজ। কুচকাওয়াজ চলছে ক'দিন ধরে। কোন দল স্টেশনে থেকে বরযাত্রীদের তোয়াজ করবে, পরিবেশন ও ভাঁড়ারের ব্যাপারে থাকবে কোন দল, পান-তামাক দেওয়া এবং সকলের শোওয়া-বসার তদাবক করবে কারা—তালিম দিয়ে দিয়ে ঠিক করা হচ্ছে।

হস্টেলেও আমাদের সাজ সাজ পড়েছে। বড়মানুষের ছেলে কেউ নই। জামা-কাপড়ে সাবান দিয়ে ফ্যান-জলে ডুবিয়ে রৌদ্রে শুকিয়ে নিলাম। ভাঁজ করে তারপর বালিশের নিচে রেখেছি ক'দিন, চাপ খেয়ে ইস্ত্রি করার মতো হয়েছে। নাপিত ডেকে ফ্যাসানদুরস্ত চুল ছেঁটেছি, সর্বাঙ্গে সাবান ঘষে ঘষে নিয়েছি। দুপুরবেলা কেউ আজ ভাল করে খেল না। বলাবলি হচ্ছে, জায়গা রেখো হে পেটে। একযুগ-বারোবচ্ছরে এমন খ্যাঁট জোটে একটা কপালে।

ব্রজভূষণের ঘরে গিয়ে দেখি, কোথা থেকে আদা জোগাড় করে এনে চিবাচ্ছে। খানিকটা আদা চিবোয় আর জল খায় ঢকঢক করে। বলে, ক্ষিধে বাড়ে, পরখ করে দেখেছি। কথায় আছে আদা জল খেয়ে লাগা—সে তো এই !

সন্ধ্যার পর দল বেঁধে রেললাইন পার হয়ে সব চললাম। বর এসে পড়েছে তখন। বাইরের উঠানে বিরাট প্যাণ্ডেল—নারকেল ও সুপারি-পাতায় ছাওয়া। বসবার জায়গা সেখানে। যেমন বরযাত্রী, তেমনি কন্যাযাত্রী—এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। বরের জেলায় ও কনের জেলায় যত ভারি ভারি মানুষ, প্যাণ্ডেলের

আসরে কেউ বোধহয় বাকি নেই। তবলা-হারমোনিয়াম নিয়ে একদল গান গাইছে। তাস পিটছে ছোঁড়ারা। পাশার দান ফেলে প্রবীণরা হুঙ্কার দিয়ে উঠছেন: কচ্চে বারো—। গোলাপজল ছিটিয়ে জামা-কাপড় জবজবে করে দিচ্ছে। সিগারেটের হরির-লুট লাগিয়েছে। সে এক এলাহি কাণ্ড।

আমরা কলেজের ছেলেরা প্যাণ্ডেলের সামনের দিকটা বসেছিলাম গোড়ায়। কিন্তু প্রিন্সিপাল-প্রফেসাবমশায়রা অদূরে—বিয়েবাড়ি এসেও যেন ক্লাস-ক্লাস মনে হয়। ওই যে বাতাবিলেবু-গাছ দেখতে পাচ্ছেন, সরে গিয়ে তখন লেবুতলাব আধ অন্ধকারে গিয়ে বসি।

ডাকতে এসেছে। বলে, আপনাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ যাঁরা আছেন, চলে আসুন।

বোমা-মারা, ফাঁসি-যাওয়াব সেই এক বিচিত্র দিনকাল। সমকণ্ঠে আমরা বলি, ব্রাহ্মণ কেউ নেই আমাদেব মধ্যে, শূদ্রও নেই। সবাই আমরা এক জাত—ছাত্র। সকলেব একসঙ্গে বসবাব মতো ঠাঁই হলে ডাকবেন। আলাদা হয়ে কেউ যাবে না।

তবে ছাতের উপর উঠে যান।

ধুপধাপ ছাতে উঠে গেলাম। মাঠেব মতন বিশাল ছাত।

॥ পাঁচ ॥

ছাতে এসে ঠাহর হল আকাশভরা মেঘ। বাতাস বন্ধ। গাছের পাতাটি নড়ে না। অসহ্য গুমোট।

পাতার সামনে বসে ক্ষুধার্ত ছাত্রদল হাঁকাহাঁকি করছে: কই হে, বসিয়ে রাখলে কেন? নিয়ে এস তাড়াতাড়ি। পরিবেশনেব লোক গেল কোথা?

সাজসজ্জা করে ভলান্টিয়াররা সমস্ত দিন টহল দিয়ে বেড়িয়েছে।

ঐ মার্চ করতেই পারে ছোঁড়াগুলো, কাজের বেলা এখন সরে পড়েছে। এদিক সেদিক থেকে লোকজন ধরে আনতে আরও খানিকটা দেরি হল। পরিবেশনের হাতা-গামলা হাতে নিয়ে মালুম হল, খাবার জিনিষ সব নিচের তলায়—ছাতে এনে রাখার খেয়াল হয়নি। কুচ পরোয়া নেই। বেশি হাত লাগিয়ে দাও। একজনে একতলায় সিঁড়ির মাঝামাঝি নিয়ে আসুক। তার হাত থেকে পরের জন দোতলার সিঁড়ির গোড়ায়। তার হাত থেকে তৃতীয় জন। তার পর চতুর্থ, তার পর পঞ্চম।

আমরা বসেছি সামিয়ানার নিচে। পাতায় সবেমাত্র ছানা পড়েছে, এমনি সময় ঝড় এল। ছাতের উপরে চতুর্দিকে ফাঁকা বলেই বোধহয় প্রকোপটা এমনি। হাজার লক্ষ দৈত্যদানো হানা দিয়ে পড়েছে যেন। বাতাস বেধে সামিয়ানা নৌকোর পালের মতো ফেঁপে উঠেছে, দড়িদড়া ছিঁড়ে নিমেষে তালগোল পাকিয়ে পড়ল। সামিয়ানা খাটানোর বাঁশ-খুঁটি হুড়মুড় করে পড়ে যাচ্ছে। সামিয়ানার তলে চাপা পড়ল অনেকে। আমরা ক-জন ছিটকে বেরিয়ে এসেছি—সামিয়ানা সরিয়ে সকলকে উদ্ধার করি।

পংক্তিভোজনে আমার ঠিক পাশেই ক্ষিতীশ বসেছিল। সুবিখ্যাত চৌধুরিবংশের ক্ষিতীশ। তাজ্জব দেখলাম, চাপা-পড়া অবস্থায় ঠিক আগের মতন বসে রয়েছে সে। জায়গা ছেড়ে নড়েনি, এবং পাতের ছানা তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে। আমাকেও বসে পড়তে বলে। মুখ ভরতি বলে কথা বেরুচ্ছে না, হাতের ইঙ্গিতে আমায় জায়গা দেখিয়ে দেয়।

কিন্তু আমি রাজি নই। ধূলোবালি কত কি পড়েছে পাতের ছানায়। কালবৈশাখীর ঝড় এখনি থামবে, ভাল জিনিষ দিয়ে যাবে। গোড়া থেকে শুরু করব তখন।

এতক্ষণে ক্ষিতীশের মুখ খালি হল। বলে, আমিই তবে খেয়ে নিই, নষ্ট হতে দেবো কেন?

ভাইনে আমার পাতের শুধু নয়, বেওয়ারিশ বাঁয়ের পাতার ছানাও সবটুকু নিয়ে নিল।

ঝড় থামল বটে, তার পর বৃষ্টি। ছাতের নল দিয়ে হুড়-হুড় করে যেমন জল পড়ে, আজ যেন আকাশ থেকে তেমনি ধারায় পড়ছে। প্রিন্সিপাল বাইবেল পড়াতেন ক্লাসে—মহাপ্লাবনের সময় আকাশের দরজা খুলে দিয়েছিল, বর্ণনাটা জীবন্ত হল চোখের উপরে। কাপড়-জামা ভিজে পুরোপুরি স্নান হয়ে গেছে, ঠক-ঠক করে কাঁপুনি লেগেছে, ছাতের নিচে আশ্রয় না হলে রক্ষা নেই।

নিচে যাবার জন্য সিঁড়ির দরজায় হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

দরজা ভিতর দিক থেকে বন্ধ। এত ধাক্কাধাক্কি,উপরের মানুষগুলোর প্রাণ যাবার দাখিল—তবু কিন্তু খুলবে না। শোনা গেল, সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় পড়েই যে দরদালান, সেখানে ব্রাহ্মণসজ্জনেরা ভোজনে বসেছেন। এতগুলো ছেলে হুড়দাড় করে পড়লে ব্রাহ্মণভোজন পণ্ড হবে।

দরজার উপরে তখন লাথির পর লাথি। মরীয়া হয়েছি আমরা। কিন্তু ভারী শালকাঠের দরজা পাথরের মতো অনড়।

ছাতের আলসেয় ঝুঁকে পড়ে দেখি, উঠানেও লণ্ডভণ্ড ব্যাপার। প্যাণ্ডেলের ছাউনির রকম বারোআনা উড়ে গেছে। বরযাত্রী-কন্যাযাত্রী-মশায়দের বিপুল দেহগুলো একটুকু জায়গায় পিণ্ডাকার হয়ে বৃষ্টি থেকে কোন রকমে আত্মরক্ষা করছে। তা-বড় তা-বড় লোকের দুর্গতিতে এরই মধ্যে যা-হোক কিছু তৃপ্তি। তাক করে আমরা পাতের কোলের খুরি-গেলাস ছুঁড়ছি তার উপরে। ঐ বয়সে চোখের দৃষ্টি আর হাতের তাক দুটোই প্রখর থাকে। খুরির ঘা খেয়ে নরপিণ্ড ছিটকে খানিকটা পৃথক হয়ে যায়, পুনশ্চ এক হয়ে আসে।

এই মজা চলছে। বৃষ্টিটা কমল। একেবারে থামেনি, পড়ছে টিপিটিপি। ব্রাহ্মণসেবা ততক্ষণে সমাপ্ত হয়েছে। নিচের মুরুব্বিরা সদয় হয়ে দরজার খিল খুলে দিলেন।

সিঁড়ির মুখে সেই দরজার পাশে দাঁড়িয়ে একজন বলছেন : ব্রাহ্মণ যাঁরা আছেন, দক্ষিণা নিয়ে যান।

স্তম্ভিত সকলে : আগে খাওয়া, তার পরে তো দক্ষিণা? খাওয়ালেন কোথা মশায়, যে দক্ষিণার কথা বলেন?

ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন।

চুপ করে থাকলে হবে না। খাওয়াবেন কিনা বলুন। এখানে মচ্ছব বলে হস্টেলের ঠাকুরকে বিকালবেলা ছুটি দেওয়া হল। আপনাদের ঐ দু-আনা দক্ষিণায় পেট ভরে যাবে?

হস্টেলের বাইরের যারা, তারাও হৈ-হৈ করে ওঠে : খেয়েদেয়ে বাড়িতে এখন ঘুম দিচ্ছে। খালি পেটে ফিরে গিয়ে কী খাব বলুন। না খাওয়ালে ছাড়ছিনে।

এতগুলি জোয়ান-ছেলে ক্ষিধের চোটে রাক্ষস কুম্ভকর্ণ হয়ে উঠেছে। বিপন্ন ভদ্রলোক বলছেন : আমি কিছু জানিনে। বিশ টাকার দুয়ানি হাতে দিয়ে আমায় দাঁড় করিয়ে দিল। কর্তাবাবু জানেন সব, তিনি বলতে পারবেন।

কোথায় কর্তাবাবু?

নিচে আছেন।

বলে দক্ষিণাদাতা ভদ্রলোক দরজা ছেড়ে চক্ষের পলকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

নিচের বড় হলঘরে বিষম ভিড়। ভিড় দেখে আমরাও ঢুকে পড়ি। দেখা গেল, আমরা এই একটি দল শুধু নয় বহু লোকে খোঁজাখুঁজি করছে : কোথায় সে কর্তাবাবু? কোন্ দিকে?

যাকে প্রশ্ন করা যায়, হুঁ-হাঁ করে মুখ ফিরিয়ে সরে পড়ে।

এই ভিড়ের ভিতর বরের পিতা রায়বাহাদুর এসে উপস্থিত। তাঁর ভিন্ন প্রশ্ন : শোওয়ার ব্যবস্থা কি তোমাদের?

কর্মকর্তাদের একজন তটস্থ হয়ে এগিয়ে আসে : আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে বই কি! উত্তম ব্যবস্থা। বালিশ তো বটেই, এমন কি পাশবালিশ অবধি পাবেন একটা করে।

আমাদের দিকে চেয়ে বলে, শেষ হল আপনাদের? ওই যা বললাম, এখন কর্তাবাবুকে পাওয়া যাবে না। আসুনগে এবার। ঘর খালি করে দিন, ওঁদের সব বিছানাপত্তর হবে।

ভিড়ের ভিতরের কে একজন বলে ওঠে: মাইরি আর কি! আমাদের পেটে বাপান্ত করছে, ওঁরা এবারে নিদ্রাসুখ উপভোগ করবেন। সেটি হচ্ছে না। সারা রাত্তির চেপে বসে থাকব এই জায়গায়। এই ভিজে কাপড়ে।

আর একজন ফোড়ন দেয়: শুধু এখানে কেন, যতগুলো ঘর আছে চারিয়ে বসে যাব। বাসরঘরও বাদ নয়। কাউকে শুতে হবে না। আর নয় তো তোমাদের কর্তাবাবু কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছেন, বের করে এনে দাও।

রায়বাহাদুর শান্ত কণ্ঠে বলেন: হিংসে করছ কেন বাপধনেরা? হিংসের কিছু নেই। যত বাছাই মানুষ বরযাত্রী এনেছিলাম, সকলের আজ ভীম-একাদশী গেল। বুড়োমানুষ আমরা সব—উপোস করে মাথা ঘুরছে, বসা যাচ্ছে না। সেইজন্যে দেখছি, চোখ বুঁজে কোথাও যদি একটু পড়ে থাকতে পারি।

মুখের আস্ফালন যতই হোক, ভিজা কাপড়ে রাত দুপুরে কতক্ষণ ঠায় বসে থাকা চলে! বুঝে-সমঝে রায়বাহাদুরের প্রতি সদয় হওয়া গেল। হলঘরের দখল ছেড়ে ক্রোশখানেক দূরের হস্টেলে ফিরে চললাম টিপটিপে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে। সে রাত্রে কেউ আমরা ঘুমোইনি—ক্ষিধের চোটে ঘুম আসে না। তারস্বরে গালিগালাজ করছি তারকমণির নাম ধরে।

সকালবেলা বরযাত্রী বিদায় হয়ে ভিড় একেবারে পাতলা। তারকমণি তখন অজ্ঞাতবাস ছেড়ে বেরোলেন। ভিতরের ব্যাপার ইতিমধ্যে জানাজানি হয়েছে—আদ্যন্ত আমরা ক্ষিতীশের কাছে শুনতে পেলাম। তল্লাটের কোনো বাড়িতে দুটো-তিনটে দিন এখন আর

উনুন জ্বলবে না। জ্বালবার আবশ্যক হবে না। হুড়হুড় করে বৃষ্টি হচ্ছে, ভলন্টিয়াররা সেই সময়টা মহাব্যস্ত। নিঃশব্দে ভোজের জিনিষ-পত্র বওয়াবয়ি করছে। সিঁড়ি ধরে সেগুলো ছাতের উপর যায়নি, বর্ষার অন্ধকারে গ্রামপথে পাচার হয়েছে। বিস্তর দিন ধরে তালিম-দেওয়া পাকাপোক্ত ভলন্টিয়ার, সঙ্গে সাহায্যকারী গ্রামবাসীরা। বৃষ্টি থামলে দেখা গেল ভাঁড়ার একেবারে শূন্য। জামাইয়ের জন্য মেয়েরা খানকয়েক চন্দ্রপুলি ক্ষীরের-ছাঁচ গড়েছিল, থালাসুদ্ধ তা-ও চলে গেছে অন্য কার জামাইয়ের ভোগে।

সকালবেলা ভাঁড়ারে ঢুকে তারকমণি নিজ চোখে দেখে হাসতে লাগলেন: কাজের মতন একখানা কাজ করব বলেছিলাম। লোকে যা মনে করে রাখবে। সত্যি সত্যি তাই হল কিনা বল। অন্তুতপক্ষে দুটো জেলার সদরের মানুষ কোনদিন ভুলবে না—আমার জেলা আর আমার বেহাইয়ের জেলা। কিন্তু একটু যে খুঁত রয়ে গেল—

এক ফর্দ কাগজ নিয়ে হাতবাক্সর সামনে বসে খসখস করে হুকুম লিখলেন—হুকুমটা ম্যানেজারের উপর: দিকে দিকে এক্ষুনি খবর পাঠিয়ে দাও, স্বজাতি ও আত্মীয়কুটুম্ব-ভোজনের যে নিমন্ত্রণ আছে সেটা বাতিল।

ছোটভাই শঙ্করমণি ছুটে এসে পড়ে: সে কি দাদা, সমাজে যে মুখ দেখানো যাবে না। আজকের ভোজের তো অসুবিধা নেই। পোলাও-এর চাল-ঘি খোয়া যায়নি। জেলেরা এসে এক্ষুনি পুকুরে মাছ ধরতে নামবে।

তারকমণি বলেন: কিন্তু খাওয়ারই তো লোক পাচ্ছ না। রাত্তিরবেলা হরদম ছানা-মিষ্টি ঠেসেছে, আজকের পুরো দিনের মতো মজুত রয়েছে। বোধহয় কালকের দিনেরও। এর ফাঁকে পোলাও গুঁজবে কেমন করে তারা?

বলতে বলতে আবার হাসেন: লোকে যত রকম কীর্তিই করুক, পাঁচখানা গাঁয়ে সামাজিক নেমন্তন্ন করে সেটা ফের বাতিল করে দেওয়া

—এ কাজ আমি ছাড়া অন্য কেউ করেনি। নাম তবে আমার অক্ষয় হবে কিনা বলো তোমরা।

জঙ্গল দেখছেন আপনি। আর ইতস্তত ছড়ানো ইটের স্তূপ। আমার চোখে অট্টালিকা, মানুষজন গমগম করছে। সেই অট্টালিকার ছাতের উপর ভোজ খেতে গিয়ে নিরাশ হলাম। যেন সেদিনের কথা। বছরগুলো পাখনা মেলে উড়ে চলে গেল, সেই সঙ্গে লণ্ডভণ্ড হল যত-কিছু ছিল। ওরই কিছুদিনের মধ্যে তারকমণি মারা গেলেন, মরে গিয়ে মানে মানে বঁ'চলেন। হস্টেলে থেকে তখনও পড়াশুনা করি আমি।

ছোটভাই শঙ্করমণি বেঁচে আছে, শুনতে পাই। হিন্দুস্থানের রিফিউজি-ক্যাম্পে সরকারি ডোল নিয়ে বিনা খাটুনিতে পরমানন্দে আছে। শঙ্করমণির শখের চিড়িয়াখানা আছে আজও। এই যেখানটা দাঁড়িয়ে আমরা—তাদের বাস্তুভিটার জঙ্গলেই আছে। পশুপাখি খাঁচায় থাকে না এখন আর, বাড়ির চৌহদ্দিতে চরে-ফিরে বেড়ায়। কত পাতিশিয়াল বুনোশুয়োর খরগোস সজারু বনবিড়াল। সাপ কত রকমের। আর এই প্রহর বেলায়, দেখতেই তো পাচ্ছেন, কত রকমের পাখি গাছে গাছে কিচমিচ করছে।

॥ ছয় ॥

কলকাতার চৌরঙ্গি, আর আমাদের মফস্বল শহরের এই চৌরাস্তা। অতিথিআত্মীয় নতুন কেউ এলে শহরবাসী পরম গর্বে এইখানে এনে দেখায়। পাকাগাঁথনির প্রাচীন এক ইঁদারা—চারদিক নিচু পাঁচিলে ঘেরা। পাঁচিলের বাইরে নানান দিকে রাস্তা চলে গেছে। থানা এবং যাবতীয় ভাল ভাল দোকানপাট এই রাস্তাগুলোর উপরে।

ওই যে একতলা একটা সাদা দালান, নতুন-বউদি অর্থাৎ

রত্নপ্রভা-বউদির বাপের বাড়ি ওখানে। গাঁঅঞ্চলের আর দশটা ঝি-বউয়ের তুলনায় বউদি অনেক বেশি লেখাপড়া করেছিলেন। স্মাইলসের সেল্‌ফ-হেল্প ইত্যাদি বই পড়তেন। সাহিত্য লিখি বলে আমার বড় খাতির ছিল। তারপর কী হয়ে গেল—দেখা হলেই গালিগালাজ। মাথা খারাপের লক্ষণ দেখা দিয়েছে তখন। এখন তো বদ্ধ উন্মাদ। বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান—মেয়ে নিয়ে মা পড়ে আছেন ওখানে। মনেব সান্ত্বনার জন্য ডাক্তার দেখানো, এবং ওষুধপত্র খাওয়ানো হয়। শুনতে পাই কখনোসখনো বউদি কথাবার্তা বলেন সুস্থ মানুষেব মতন। কিন্তু যথাপূর্ব পরক্ষণে—ওটা বোধহয় দামি দামি অষুধের সাময়িক ক্রিয়া।

সেবাব বাড়ি যাবাব পথে বত্নপ্রভা-বউদির খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম। যেইমাত্র দেখা, সিংহিনীর মতো গর্জে উঠে বোঁ করে ইট ছুঁড়ে মারলেন। লাগলে শেষ হয়ে যেতাম। বউদির মা চেঁচাতে লাগলেন: পালাও, পালাও। আব তুমি এসো না বাছা। উত্তেজনাব কাবণ না ঘটে, ডাক্তাব পই-পই মানা করেছে।

যাক সে সব। চেয়ে দেখুন, সবগুলো লাইনেব মোটরবাস এই চৌরাস্তায় মোতায়েন। ছুটিব দিন বুঝি আজ। লোক চলাচল কম বলে বারোটার বাস আজ ছাড়বে না, তিনটের বাসে যেতে হবে আমাদের। বারোটাব বাস তিনটের বাস এসব নিতান্তই হাল আমলের ব্যাপার। ঘড়ির ভৃত্য কোনদিনই ছিলা না আমরা পাড়াগাঁয়ের মানুষ। এখনো নই। বাজাবাদশা ক-জন আছে যে ঘড়ি রাখবে? সকাল দুপুর সন্ধ্যা এই সমস্ত সময়ের হিসাব। কালেভদ্রে আপনাদের পদধূলি পড়ে, ঘড়ি দেখে সেই সময় শুনিয়ে আসেন—ছ'টা বাজল, ন'টা বাজল। বারোটা বেজে গেল রে, খাওয়া-দাওয়া হবে কখন? মন্টুর পিসেমশায় শুনে বলতেন, যে কটা বাজবার বেজে যাক রে বাবা। তাড়াহুড়োর মধ্যে জুত হবে না—ধীরেসুস্থে তার পরে আমরা খেতে বসব।

আপনারাই এসে মাথা ঘুলিয়ে যান। তার উপরে আছে ট্রেন। ছটো-সাতান্নর এক্সপ্রেস, সাড়ে-বারোটার মেল। দেখাদেখি বাসওয়ালারাও গৌরবের নাম দিয়েছে—তিনটের গাড়ি, পাঁচটার গাড়ি ইত্যাদি।

ঘাবড়াবেন না, নামই শুধু। চড়ন্দারের অভাবে তিনটের গাড়ি রাতদুপুরেও ছাড়ে এক একদিন। নতুন লোক যাচ্ছেন আমাদের গাঁয়ে—আগেভাগে তাই সামাল করছি, বেটাইম দেখে বেজার হবেন না কিন্তু। আমাদের পাড়াগাঁয়ে গতিক এই।

সতীঘাটা এসে গেল। মুক্তীশ্বরী নদী—খিলানেব গাঁথা প্রাচীন পুল। নদীব উপর বটতলা, এইখানে থেমে থাকবে গাড়ি খানিকক্ষণ। ইঞ্জিন ঠাণ্ডা হবে। দোকান আছে—বিড়ি কিনে নিন, ডাব ইচ্ছে করুন। শীতের সময়ে দোকানে ডাব রাখে না, চা বানায়। শেওলায় ঢাকা নদী—বাঁশ ও আম-কাঁঠালের গাছ ঝুঁকে পড়ে দুই-পাড়ে ঘন অন্ধকার। শেওলা ঠেলে নৌকো এগোতে পাবে না। বর্ষার সময়টা জল বাড়ে, স্রোত দেখা দেয়, ওই ক-টা মাস শুধু নৌকোর চলাচল। ভরা আসে নানা অঞ্চল থেকে। ঘাটে ঘাটে কেনাবেচা। মানুষের পায়ে পায়ে পথ পড়ে যায়। আশ্বিনের পূজো অবধি এমনি। শেওলা ও জঙ্গলের মধ্যে জলধারা ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হয়ে আসে, নদীর কথা লোকে ভুলে যায়।

আগে ছিল না এমন—মুক্তীশ্বরীর পারাপার হতে ভাবনা হত মানুষের, মাঝনদীতে টানের মুখে খেয়া টলমল কবত। বিড়ির দোকানের সামনে বাঁশের বেঞ্চির উপরে খুব বয়স্ক এক গ্রামবৃদ্ধকে দেখা যায়। হাত ঘুরিয়ে তিনি দেখান: শ্মশানঘাট ছিল ওই বটতলায়। বটের শিকড়ের ভিতর জল খলবল করত। একবার হল কি, মস্তবড় রুই জলের সঙ্গে এসে শিকড়ের জালে আটকে গেল। হাতে ধরে তোলা হল সেই মাছ—ওজনে আধ মনের ধাক্কা।

মোটরের কল বিগড়ে সেবারে বুড়োমানুষটির পাশে অনেকক্ষণ বসে ছিলাম। সতীঘাটার গল্প বললেন তিনি। সে গল্প আবার তাঁর কোন ঠাকুরদাদা সম্পর্কিত একজনের কাছে শোনা। ব্রাহ্মণবাড়ির এক বউ সতী হল ওখানে—ওই বটতলার শ্মশানঘাটে। স্বামীর চিতা সাজিয়েছে। সোনার মতন গায়ের রং বউটির, রুক্ষ আলুল চুলের বোঝা সারা পিঠ ঢেকে দিয়েছে। পূর্ণচাঁদের মতো সিঁদূরফোঁটা কপালজোড়া, পাড়ার মধ্য থেকে বউ পায়ে হেঁটে বেরিয়ে আসছে। আপনিই আসছে—ধরে আনবার লোকেরা আসছে পাশে পাশে, কিন্তু ধরবার দরকার হয়নি। ওই যে শেয়াকুল-আশশ্যাওড়ার জঙ্গল—মস্ত পাড়া তখন ওখানে। চতুর্দিকে তোলপাড়, শঙ্খ বাজছে উলু দিচ্ছে, বউ শুনতে পাচ্ছে না যেন কিছু। ফোলা-ফোলা দৃষ্টি—হুটো চোখে দেখছেও না মনে হয়। চিতাব আগুন হাজার জিভ মেলে লকলক করে, তার মধ্যে ধীরে সুস্থে বউ গিয়ে যোগাসনে বসল। কত কালের কথা—সেই তাদের নাম পরিচয় সঠিক কেউ বলতে পারবে না। সতীঘাট নামটাও মুখে মুখে বিকৃত হয়ে দাঁড়িয়েছে স্মৃতিঘাটা।

(হায়রে হায়, এই স্মৃতিঘাটার গল্প আবার আমায় নতুন করে লিখতে হল। এইতো সেদিন। 'কান্নার-গাড়ি' সে গল্পের নাম। নজবে পড়েছে ?)

কুয়োদহ ছাড়িয়ে এসে মণিরামপুরে গাড়ি অনেকক্ষণ দাঁড়াল। ভারি গঞ্জ—সেকালে আরও ভাল ছিল। মোটরবাস পড়ে মরুক, ঘোড়ার-গাড়িরও চল হয়নি তখন। যত সব পায়ে-হাঁটা লোক—স্ত্রীলোক কিম্বা বুড়োহাবড়া হলেই কেবল গরুর-গাড়ি। টিকিয়ে টিকিয়ে চলছে গরুর-গাড়ি—সে এক বিষম ল্যাঠা—গায়ে একটু তাগত থাকতে কেউ কখনো গরুর-গাড়ি চড়ে না। রাত কাটাবার জায়গা তখন মণিরামপুর। লম্বা লম্বা চালাঘর ছিল, দাওয়ার উপর

অগণ্য উনুন। রাঁধা-বাড়া করে খেয়ে শুয়ে থাকবেন। শোওয়ার বাবদ কিছু লাগবে না। চালডাল নুনতেল কিনবেন—সেই মুনাফা দোকানির। কলাপাতা কিম্বা পদ্মপাতা কিনবেন আধপয়সা-এক-পয়সায়, ভাত ঢেলে খাবেন। বাসনকোশন ফ্রী। আরও কিছু খবচ আছে—হরিদাসী ফুলমণি নিস্তার এমনি এক দল ছিল। জল তুলে উনুন ধরিয়ে বাটনা বেটে বাসন মেজে সর্ববকম খেদমত কবছে, যাবাব সময় একটা দুটো পয়সা দিয়ে যাবেন। তাতেই তিন-চার আনাব মতো হয়ে যায় তাদেব। লাট-সাহেবেব বোজগাব—বলুন তাই কিনা!

টেমি জ্বলছে উনুনের ধাবে ধাবে কাঠেব দেলকোয়। হুঁকো মোটমাট দুই বকমের—নলচেব গলায় কডি-বাঁধা এবং কড়িহীন নলচে। কড়ি-বাঁধা হুঁকোয় ব্রাহ্মণেরা টানবেন, যে হুঁকোয কডি নেই সেটা কায়স্থর। পথে ঘাটে জাতি হল দুটো—ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ। পৈতে থাকলে ব্রাহ্মণ, না থাকলে কায়স্থ—এব বাইবে তৃতীয় জাতি নেই। গাঁয়ে-ঘরে ঢুকে গেলেন তো দুটোব জায়গায় দু-শ হয়ে গেল আবাব। এত প্রগতির জাঁক কবে বেড়ান—আপনারা বেশি কি আব কবলেন শুনি? পথেঘাটে দু-জাতের জাযগায় একটা কবে ফেলছেন এই মাত্র। আজ্ঞে হ্যাঁ, কলকাতা কিম্বা হিল্লিদিল্লি—পথঘাটই বলব ওদের। তা শহবের উপব দশ-বিশখানা বাড়ি বানিয়ে কায়েমি বসবাস করুন না আপনি—সে-ও পথে থাকার সামিল। গাঁয়ের লোকে আমরা তাই মনে করি।

চালাঘরের নিচে শুয়ে বসে আলাপ হচ্ছে এ-তল্লাটে ও-তল্লাটে। বিয়ের ঘটকালি। জমিজিরেত বোগপীড়া দুঃখসুখেব হবেক বকম খবর। তিন প্রহরের শিয়াল ডাকে, তখনই হুঁশ হয়। নাঃ, চুপচাপ এবারে ঘুমানো যাক—ভোর থেকে হাঁটতে হবে।

সে সমস্ত উড়েপুড়ে গেল একেবারে। সেই মণিরামপুব নির্জীব। সে সব চালাঘরের পাত্তা নেই। মোটর থামিয়ে টিউ-কলের (ছোট্ট কথায় সুখ পান না বুঝি আপনারা, থেঁতলে চওড়া করে নিয়েছেন—

টিউবওয়েল) জল ধরে ঢালছে ইঞ্জিনে। গাড়ি থেকে নেমে এক লহমা রাস্তায় দাঁড়াবেন, তা-ও যেন আলস্য লাগে। মশায়রা যেন ছুটতেই এসেছেন দুনিয়ায়, বয়েসয়ে দু-দণ্ডের রসালাপ আপনাদের পোড়া অদৃষ্টে নেই।

॥ সাত ॥

এবারে বাঁধাঘাট। ঘাট কোথা জানিনে, কোন দিকে ঘাটের চিহ্ন পাবেন না। বড় বড় গাছের উঁচু জঙ্গল—মাঝখানটায় সেই জঙ্গল হঠাৎ নিচু হয়ে গিয়ে ঝুপসি গুল্মলতায় ভবে আছে। প্রাচীন ইটের পুল সেই নিচু জায়গাব এ-মুড়ো ও-মুড়ো। জঙ্গলের মধ্যে এক খাটো মাপেব জঙ্গল—ইনিই নাকি নদী। উঁহু, ভুল হল, নদী বললেও অপমান হবে—নদ। হবিহর-নদ নাম এঁর।

তাই বোধহয় হবে। বাস থেকে নেমে পড়ে পুলের চাতাল থেকে খুব যদি ঠাহর করে দেখেন, এবং কাচা বয়সের দৃষ্টির জোর যদি থাকে, লতাপাতার আড়ালে জল একটু-আধটু না দেখবার কথা নয়। আষাঢ়-শ্রাবণে জোরদার বর্ষা হলে গুল্মরাশি ডুবিয়ে দিয়ে ঘোলা সুস্পষ্ট দীর্ঘ জলরেখা চলে গেছে, তা-ও দেখবেন।

এই হরিহরের দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল একদিন। রও নাবালে কেশবপুর অবধি গিয়ে খানিকটা তার আঁচ পাবেন। একটু গল্প বলে নিই। আমাদের পাশের গাঁয়ে বনেদি বোসেরা আছেন। চক-মিলানো বাড়ির ঘরে ঘরে এখন চামচিকার বাসা। ওই বাড়ির ত্রৈলোক্য বাবু এককালে অনেক দাপট দেখিয়েছেন। সেই মানুষের শেষকালে আর এক দশা দেখেছি। অতি দরিদ্র। হাট ভেঙে গিয়ে অনেক রাত্রে দোকানিরা হিসাবপত্র সারা করে ঝাঁপ বন্ধ করতে যাচ্ছে, ত্রৈলোক্যবাবু নির্জন অন্ধকারে এদিক-ওদিক তাকিয়ে ঘরে ঢুকে চাপা

গলায় বলেন, এক সের চাল দাও তো হে! পাত্র আনেননি, পথে কারো সঙ্গে দেখা হলে তবে তো ধরা পড়ে যাবেন—পাত্র নিয়ে নিজ হাতে চাল আনতে যাচ্ছেন। কোঁচার কাপড় মেলে ধরেন ত্রৈলোক্যবাবু : দাও, দাদখানিটা থাকে তো তাই দিয়ে দাও এক সের। কোঁচায় বেঁধে চাল নিয়ে যাচ্ছেন, তবু সেটা দাদখানির নিচে নয়। এবং পয়সায় কুলায় তো চার পয়সার কর্পূরও কিনে নেবেন খাবার জলে দেবার জন্য। কেশবপুরের হরিহর-নদেরও এই বনেদি রীতি। অন্য সময় মানুষজন হেঁটে এপার-ওপার করে। বর্ষার সময় বুক-জল, গলা-জল। আবার দেখবেন সেই জলে একবার এ-মুখো আবার ও-মুখো টান। জলসম্পদ কিঞ্চিৎ মিলল তো জোয়ার-ভাঁটাও খেলিয়ে নেবে সেই জলের উপর।

এই দশা নাকি সেকালের এক ঋষিব কোপে পড়ে। বাঁধাঘাটের এই কসাড় জঙ্গলের কোনখানে কাণ্ডটা ঘটেছিল। ছলছল খলখল খেলা করছিল নদের জলধারা। হঠাৎ দুষ্ট মতলব হল—জোয়ারের স্রোত হয়ে ডাঙার উপর উঠে ঋষিব কমণ্ডলু ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আসন ছাপিয়ে জল। ধ্যানভঙ্গ হয়ে মহাক্রোধে ঋষি অভিশাপ দিলেন : যে স্রোতের দেমাকে সকলকে এত তাচ্ছিল্য, সে স্রোত থাকবে না। নদী শুকিয়ে যাবে, কূলের উপর ধেয়ে উঠবার শক্তি হারাবে।

কোন যুগের কথা, গালগল্প বলে তো ভ্রূ কুঁচকান আপনারা, কিন্তু চোখ তাকিয়ে চেহারাটা দেখুন আজ হরিহরের। শাপশাপান্ত নইলে এমন হয় না। সরকারি তরফে কতবাব কথা হল, হরিহরের মাথাব দিকে খানিকটা কাটিয়ে খাতের মধ্যে কপোতাক্ষীর জলস্রোত নিয়ে আসবার। শেষ অবধি পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। পাপ কলিযুগের প্রায় তো কল্পান্ত হয়ে এল, ঋষিশাপের তবু জোর কমল না।

বাঁধাঘাটে পুল্লের চাতালে উবু হয়ে বসে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করছেন তো? সর্বনাশ, উঠুন—উঠে পড়ুন বাসে। বেলা পড়ে আসে, দেরি

করবেন না। জায়গা খারাপ। কেঁদোবাঘ তো বটেই, অবরেসবরে সুন্দরবনের মানুষখেকোও আসেন জনালয়ের হালচাল বুঝতে। বাঁধাঘাটের এই তল্লাট তাঁদের উত্তম বসতিস্থান। এবং আপনি যদি এমনি তদ্‌গতভাবে প্রকৃতির শ্যামশোভা নিরীক্ষণ করতে থাকেন, জঙ্গলের মধ্যে থেকে তাঁরা কেউ টুক করে বেরিয়ে এসে টুঁটিটা চেপে নৈশভোজে নিয়ে ফেলবেন না, তা-ও হলপ করে বলা যায় না। গরু-ছাগলের বেলা হরবখত ঘটে, মানুষের ব্যাপারে অবশ্য শুনিনি। কিন্তু আগে হয়নি বলে ভবিষ্যতেও যে হবে না, তার নিশ্চয়তা কি ?

শুনুন তবে। মোটরবাস চালু হবার আগে এ লাইনে ঘোড়ার-গাড়ি চলত। সেই আমলে একবার বাঘ দেখেছিলাম। কোন একটা মচ্ছবের ব্যাপারে প্যাসেঞ্জারের বড় ভিড়। ঘোড়ার-গাড়ি দিনরাত ক্ষেপ দিয়েও সামাল দিতে পারছে না। রাত্রিবেলা চলেছি—পূর্ণিমার রাত, দিনমানের মতো জ্যোৎস্না। মেজাজ সরিফ মাদারবক্স কোচোয়ানের। গাড়ির আষ্টেপিষ্টে মানুষ বোঝাই। রীতিমতো দুটো পয়সা হচ্ছে, সেই এক কারণ তো আছেই—তার উপরে অতিরিক্ত খাটনির দরুন মণিরামপুরের বাজারে বসে এইমাত্র মাদার আচ্ছা করে গাঁজা টেনে এসেছে। জোর ছুটিয়েছে গাড়ি, এই বোঝা নামিয়ে দিয়েই ছুটবে সদরে, সেখান থেকে আবার এক ক্ষেপ ধরবার জন্য। ঘোড়া ছুটছে, আর মাদারও চেঁচাচ্ছে : উড়ে যা বাবা পক্ষীরাজের বাচ্চা, উড়িয়ে নিয়ে যা আমার বোম্বাই-মেল—

হঠাৎ ঘোড়া থমকে দাঁড়ায়, চাবুকের শপশপানিতে এক পা নড়ে না। আমি কোচবাক্সে বসেছি মাদারের পাশে। মাদারের দেখছি মুখ শুকনো, এত স্ফূর্তির চেঁচামেচি বন্ধ হয়ে গেছে। হল কি গো ? কথার জবার মুখে না দিয়ে মাদার আঙুল দেখাল সামনের দিকে। এবং আড়ষ্ট ভাব অচিরে কাটিয়ে ফেলে ভীমবেগে কাঠের উপর পা দাপাচ্ছে। আর গাড়ির সঙ্গে যে বিউগিল থাকে, মুখ ফুলিয়ে বাজাচ্ছে সেটা। তাকিয়ে দেখি, অদূরে পাকা-রাস্তার মাঝামাঝি থাবা পেতে

রয়েছে বাঘ। দুটো চোখ জ্বলজ্বল করছে—আর এগিয়ো না, এগোলে রক্ষে নেই, এমনিধারা 'রণং দেহি' ভাব। ভেঁপুর আওয়াজ এবং বড্ড বেশি চেঁচামেচিতে শেষটা যেন বিরক্ত হয়ে পড়ল। যা, যা, ভারি তোরা ইয়ে হয়েছিস—বাক্যহীন ভাষায় এমনি কোন উক্তি করে লেজের একটা ঝাপটা মেরে ব্যাঘ্রবব ধীরে ধীবে বনেব আডালে চলে গেল।

এই দেখুন, শহুবে মানুষ ঘাবডে যাচ্ছেন বুঝি! কিছু না, কিছু না। এত কালের মধ্যে সেই আমাব একটিবাব পলকেব জন্য বাঘ দেখা। কি জাতেব বাঘ, তা-ও বলতে পারব না। সকল মানুষ যেমন মুরগি খায় না, সকল জাতেব বাঘও মানুষ খায় না তেমনি। দু-পেয়ে জীব দেখে ববঞ্চ ডবায়। তা ছাডা আপনি তো যাচ্ছেন মোটববাসে। ভালো কবে সন্ধ্যে হয়নি, গাড়ি তবু দু-পাশে জোবালো হেড-লাইট জ্বেলে ছুটছে। আলোব খোঁচা খেয়ে গাছেব তলাব জন্তু-জানোয়ার এবং গাছেব মগডালেব ভূত-পেত্নী-ব্রহ্মদৈত্য দুডদাড কবে পালাচ্ছে।

সুন্দলপুবের (বাবুভেয়েবা বলবেন বোধহয় সুন্দবপুব) হাট-বার আজকে। হাটে পৌঁছবার বিস্তব আগে থেকে মালুম হচ্ছে। হাটুরে মানুষ চলেছে। সিকাবাঁক নিয়েছে কাঁধে—সিকার ধামায় ধানচাল তরিতরকারি বেচতে নিয়ে যাচ্ছে। কানায় দড়ি-বাঁধা কেরাসিন আর সর্ষের-তেলের বোতল। খেজুবগুড়েব মবশুম এটা, ভাঁড ভাঁড গুড় নিয়ে চলেছে। গুড়েব নাগবি বোঝাই গরুব-গাডি যায় ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলে। আব যাচ্ছে পাটা-শেওলার গাড়ি। শেওলা হাটে বেচতে নিয়ে যাচ্ছে, খদ্দেরে পয়সা দিয়ে কিনবে। এই শেওলার ভারি গুণ, খেজুর-চিনি বানাতে লাগে। ঢাউশ এক পাত্রের তলদেশে ছিদ্র, তার মধ্যে গুড় ঢেলে দিন। টপটপ করে ঝিরানি বেরিয়ে গুড় শুকনো হয়ে যায়। পাটা-শেওলা চাপিয়ে দিন উপরে। এক শুকোচ্ছে, তার উপর আবার চাপাচ্ছেন। শেওলার কী ক্ষমতা—গুড় ক্রমশ বাদামি

তারপর শাদা হয়ে চিনিতে দাঁড়াল। সে চিনির অপরূপ স্বাদ। একমুঠো চিনি চিবিয়ে খেয়ে এক ঢোক জল খেলেই সর্বদেহ ঠাণ্ডা। সে বস্তু উঠে গেল। কেউ আর খেজুর-চিনি বানাতে চায় না, কারিগররা মরেহেজে গেল। স্বাদহীন কলের চিনি সহজে মেলে, বেশি দর দিয়ে খেজুর-চিনি কিনবে তেমন মানুষই বা আছে ক'জন ?

কাঁসরের বাজনা পান আম-কাঠালের ছায়ান্ধকার থেকে ? মন্দির আছে। সবাই হিন্দুস্থানে সরে পড়ল, বাড়িব এক বিধবা মেয়ে কিছুতে নড়লেন না কুল-বিগ্রহ ছেড়ে। বিয়ের তিন দিনের দিন ঠাকরুন বিধবা হন। শ্বশুরবাড়ির জমজমাট সংসার—টপাটপ সব মরে যেতে লাগল। বছব তিনেকের ভিতরেই চুকিয়েবুকিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি বাপের বাড়ি ফিরলেন। এলেন একটা তোরঙ্গ শুধু সঙ্গে নিয়ে। তারপরে মন্দিরেব ঠাকুবসেবা নিয়ে মেতে গেলেন। অষ্টপ্রহর পড়ে আছেন মন্দিরে। আমি দেখেছি তাঁকে। ঘনকালো চুলেব বোঝা আধাআধি পেকে গেছে।

বাড়িসুদ্ধ চ.ল গেল, কেউ বইল না। তোমাব চলবে কিসে ?

ঠাকুর চালাবেন।

ঠাকুরেরই বা কেমন করে চলবে ?

সে ঠাকুরের ভাবনা।

চলে কিন্তু আসছে, ভোগারতি বন্ধ হয়নি এক দিনের রে। চাষী মুসলমানরা প্রতিবেশী—যখন যেটা আটকায়, চাইলে তারা না বলে না। চাইতেও হয় না অনেক সময় মুখ ফুটে। বামুন-ঘরের বিধবা হলেও চাষীদের মেয়ে-বউর সঙ্গে ভাবসাব খুব। ছোঁয়াছুয়ি নেই, তবু একেবারে পেটের মেয়ের মতো করেন তাদের সঙ্গে। তারাও ঠাকরুন বলতে অজ্ঞান। (এই কিন্তু একমাত্র স্থান নয়। এমনিই বেশি—নিজে আমি নাম করে করে সাক্ষ্য দিতে পারি। দেখুন, সামান্য মানুষের ছোটখাট ঝগড়াবিবাদ -বড় বজ্জাতি তারা বোঝে

না। কত লিখলাম এদের নিয়ে—সারা জীবন ধরে। কত গল্প ইচ্ছে করেই সামান্য আয়তনে সেবেছি, ব্যস্ত মানুষও যাতে ঝটিতি চোখ বুলাতে পারেন। কী হল, কার মাথাব্যথা বলুন এ জিনিষে! নিরর্থক আমার কলমেব কণ্ডুয়ন।)

পূজারি বামুন দেশছাড়া তো ঠাকরুন নিজেই এখন পূজো কবেন। স্ত্রীলোক অনধিকাবী, কিন্তু উপায কি? ধার্মিক পুরুষমানুষ ঠাকুর জুটিয়েপুটিয়ে এনে নিন। তত দিন তো উপোসি বাখা চলে না। শুধু ওই কাঁসব শুনছেন, কাঁসব ছেড়ে তাবপব ঘণ্টা বাজাবেন। একলা একটি মানুষ—একজনকেই সমস্ত কবতে হয়।

॥ আট ॥

অত জোবে নয় ড্রাইভাবমশায়, হাটবাব যে আজ। সুন্দলপুবের হাট শীতকালটা ভাবি জমে। হাটখোলা ছাপিয়ে পাকাবাস্তাব ধারে ধারে দোকান দিয়েছে। টেমি জ্বলছে টিমটিম কবে—দূব থেকে জোনাকির মতন দেখা যায়। আব ওই আলো দেখাব অনেক আগে থেকেই তো আওয়াজ শুনছেন। অনেক গলা একসঙ্গে মিলে গিযে অর্থহীন এক বিচিত্র ধ্বনি।

মন কেমন কবে ওঠে, গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে ওদেব মধ্যে মিশে যেতে ইচ্ছে করে। ওই হাজার গলাব মধ্যে আমাব একটিও মিলিয়ে যাক। একদিন যেমন ছিল। হাট কবে বাডি ফেবা—খালি-পা গায়ে-গেঞ্জি কিংবা কাঁধেব উপর চাদব, এক হাতে মাছের খালুই, কাঁধের ঝুড়িতে তরিতরকারি। হাটের বাইরে রাস্তার মোড়ে আকাজ মোল্লার তেল-কেরাসিনের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, সঙ্গীসাথী যদি জোটানো যায়। কথাবার্তা বলতে বলতে যাওয়া যাবে দিব্যি। সঙ্গী না পেলে একাই—একা

হলে তখন কথাবার্তা নিজের সঙ্গে। মনে মনে নয়, সশব্দে নিজের সঙ্গে কথা। চুপচাপ যাওয়া চলবে না। অন্ধকার পথ—তুপাশের ঘাসবনে পথের অনেকটা ঢেকে গিয়েছে। সাপ থাকতে পারে পথের উপর শুয়ে। জীবজন্তু যত হিংস্র হোক, তু-পেয়েকে ভয় করে না এমন কেউ নেই। শব্দসাড়া করে সুযোগ দিন তাদের সরে যাবার।

মানুষ পেলেন, তবে তো কথাই নেই। কত দিকের কত মানুষ হাট করতে আসে। পিওন তুর্গম গাঁয়ে যায় না, হাটে হাটে চিঠি বিলি করে—সাপ্তাহিক খবরের-কাগজও কয়েকটি। কী আশ্চর্য ব্যাপার বলুন তো—কাগজের মোড়ক ছিঁড়লেই গোটা তুনিয়া চোখের সামনে! আর উল্টো পিঠে, সে-ও বিষম আশ্চর্য—পাঁচ কৌটা দাদের মলম পাঁচ সিকেয়, তৎসহ একশ-ষাট দফা বিনামূল্যের উপহার।

গোলদারি দোকানে ঝুলানো লণ্ঠনের আলোয় তু-কথা পাঁচ কথা তাড়াতাড়ি পড়ে নিয়ে হাটুবে লোক টাটকা জ্ঞান সঞ্চয় করে। সেই জ্ঞান অজ্ঞ সাধারণকে বিলোতে বিলোতে চলেছে হাট ফিরতি পথে। ঘর ব্যাভারি সুখতুঃখের কথাও হয়। জ্বরে ভুগছে আজ আট মাস। পাশ-ডাক্তারের পাল্লায় পড়েছে—হোমিওপ্যাথি ডাক্তার, আসলে ডাকাত। পুরো আটমাস চিকিৎসা হচ্ছে, জ্বর তবু সারে না। পয়সা দিয়ে যাচ্ছে খালি। গোড়ায় পুরোপুরি টাকাই দিয়েছিল। এক মাস ওঁষুধ দিয়ে ডাক্তার ফের বলে টাকার কথা। কিন্তু টাকা নয়, এবারে আধুলি দিল একটা। চলল আবার মাস তুই-তিন। অসুখ যেমন-কে তেমন, আবার এখন টাকা-টাকা করছে।

বড় এক বাঁক ঘুরে তার পর সোজা সড়কে খানিকটা গিয়ে দেখবেন চীনাটোলা এসে গেছি। চীনাটোলা—নামের মধ্যে ইতিহাস যেন চক্কোর দিয়ে ফিরছে। চীনারা এসে টোল ফেলেছিল—কিন্তু অজ পাড়াগাঁয়ে কোন দিকে আজ তার চিহ্ন নেই। তবু বিশ্বাস করি শীতকালে ওরা উদয় হত সিল্কের প্রকাণ্ড বোঁচকা কাঁধে করে, গাঁয়ে

গাঁয়ে ফিরি করে বেড়াত। আমাদের ছোটবয়সে দেখেছি। তা চীনাদের বাস থাকুক আর না-ই থাকুক, চীনাটোলা এই সেদিন অবধি নামি গঞ্জ ছিল আমাদের তল্লাটে। পাকারাস্তাব উপর বটতলায় বাস দাঁড়াত অনেকক্ষণ, লোকজন ওঠানামা কবত। মুজগন্নিব পুরানো সায়ের ভেঙে গিয়ে ফি শুক্রবারে বাজার বসত এখানে। বিস্তব দোকানপাট। তার উপরে মেলা জমত পুবো বৈশাখমাস ধরে। নানা-বকম কাঠের জিনিস—তক্তাপোশ, পিঁড়ি, ছাপবাক্স, বারকোশ, চাকি-বেলন, মায় চন্দ্রপুলি বানাবাব ফুল-কাটা ছাঁচ অবধি। গৃহস্থ সাবা বছর হা-পিত্যেশ কবে থাকে মেলা থেকে এই সমস্ত কেনাব জন্য।

ছোট্টবয়সে মেলায় একবার হারিয়ে গিয়েছিলাম। খুব ছোট—সাত-আট বছব বয়স। কান্নাকাটি কবে পবন মোড়লেব সঙ্গে চলে এসেছিলাম—বাড়িতে সেদিন বড়দেব মধ্যে কেউ উপস্থিত ছিলেন না। তা নামে পবন তো কাজেকর্মেও তাই। লহমাব জন্য স্থিব হয়ে থাকা তার কোষ্ঠীতে নেই—যেন উড়ে বেড়ায়। জনতাব মধ্যে আমি তখন আড়াল হয়ে গেছি। এদিক-সেদিক খোঁজাখুঁজি কবছি। পবন, পবন—বলে ডেকেছি কতবাব। মানুষজন যে যাব ধান্দায় ব্যস্ত, কে বা শোনে কার কথা। ছেলেমানুষ ভয় কবছে আমার।

কালোকোলো একটা মেয়েব নজব পড়ল: কাদেব পোলা গো, একলা এয়েছ? সঙ্গের মানুষ খুঁজে পাচ্ছ না বুঝি—তা এসো গো, ইদিক পানে চলে এসো।

দাওয়ায় নিয়ে বসাল পরম যত্নে। ছোট্ট ঘব—বিচালিতে ছাওয়া, দরমার বেড়া। অনেকগুলি এমনি পাশাপাশি—মেলা থেকে এই সব ঘর মেয়েদের জন্য বানিয়ে দিয়েছে—ভাড়া পায়। দাওয়ায় বসিয়ে জামরুল খেতে দিল সে আমায়। আম কেটে দিল, মুড়ি আর খেজুর-গুড় দিল এনামেলের বাটিতে করে।

এ-ঘর ও-ঘর থেকে আরও সব মেয়ে আসছে: ছেলে কোত্থেকে আনলি ও পটলি?

আমার লজ্জা করছে খেতে। অন্য মেয়েরা ডাকে: ঘাটে চল রে পটলি, গা ধোয়া হবে আর কখন?

পটলি কানেই শুনছে না। অন্যেরা রাগ করে চলে গেল।

খেয়েদেয়ে বেরিয়ে আসছি—পটলি আগে আগে আমার। পবনের দেখা পেলাম। খানিকটা গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পবন চোখ গরম করে: এখানে মরতে এসেছিলি, আর আমি ত্রিভুবন খুঁজে বেড়াচ্ছি। খারাপ মেয়ে ওগুলো, মেলায় এসেছে ব্যবসা করতে, মেলা ভাঙলে নৌকো ভাসিয়ে আর এক দেশে চলে যাবে যেখানে নতুন মেলা জমছে।

সাত-আট বছরের ছেলে—তখন বুঝবার কথা নয়, খারাপ মেয়ে ওরা। এত বয়স হয়েছে—আজকেও কিন্তু বুঝতে পারিনে খারাপ মেয়ে ছিল সেই পটলি।

এখন মেলা বসে না। ফি শুক্রবারে হাট বসত, সে-ও সরে গিয়েছে আধক্রোশটাক দূরে নাগরগোপের ফকির-রাস্তার মোড়ে। প্রাচীন আমগাছগুলো রয়েছে আগেকার মতোই। আমতলা ছিল তখন মানুষের চলাচলে সাফসাফাই, আজকে নাটা-ভাঁট-আশশ্যাওড়ার জঙ্গল হয়েছে। সুঁড়িপথ তার ভিতর দিয়ে বিস্তর কষ্টে ঠাহর করতে হয়।

ড্রাইভার সাহেব, নেমে যাবার চড়ন্দার না-ই থাকুক, একটুকু রোখো এই জায়গায়। মোটরের ভটভটানি থামাও।

ঘন জঙ্গল, অন্ধকার। ঝুপসি-ঝুপসি গাছে ঝাঁক বেঁধে জোনাকি জড়িয়ে আছে। ঝিঁঝিঁ ডাকে, তক্ষক ডেকে ওঠে এক-একবার। আর আপনি শুনছেন না, আমি কিন্তু শুনতে পাচ্ছি গানের কলি: 'অমৃতনাথ নাথে বলে অন্তে দিও পদতরী: অন্তিমে বঞ্চিও না, দিও দিও পদতরী—'

আবছা অমৃত নাথকেও দেখছি যেন—মাথায় টাক, দোহারা শ্যামবর্ণের মানুসটি। মুখভরা হাসি সব সময়—বোধকরি মুখের হাসি নিয়েই জন্মেছিলেন। এবং অন্তকালের অবস্থা চোখে দেখিনি—তবু অনুমান করি, হাসি তখনও লেপটে ছিল ঠোঁট দুখানি ও সারা মুখ

ভরে। ত্রিলোক-চরাচরের নাথ ওই মানুষকে পদতরীর আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাতে সন্দেহমাত্র নেই।

কবি মানুষ অমৃত নাথ—আবার কবিরাজও। বাপ বলহরি নাথ ডাকসাইটে কবিরাজ ওদিগরের। সুস্থ সমর্থ মানুষের হাতের নাড়ি ধরে বলে দিতে পারতেন—কবে মরণ হবে। এমনি নাড়িজ্ঞান! আর অতিশয় স্বল্পভাষী। রোগির দিকে একনজরে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ বলে উঠতেন, অষুধ কিনে কেন আর পয়সা নষ্ট করছিস? ভালমন্দ খেয়ে নে যে ক'টা দিন আছিস। মুখের উপরে এমনি চাঁচাছোলা কথায় রোগি কাছ ঘেঁসতে চাইত না। আবার না এসেই বা উপায় কি, অষুধ যে ডেকে কথা কয়। আরোগ্যের তিলেক সম্ভাবনা যদি থাকে, সেটা বলহরি নাথের দ্বারাই হবে।

এ হেন বলহরি নাথের ছেলে অমৃত নাথ। সামান্য কিছু সংস্কৃত শিখে অল্পবয়স থেকে বাপের সঙ্গে কবিরাজিতে পাঠ নিয়েছেন। আরও এক পাঠ নিয়েছেন বোধকরি ছায়াচ্ছন্ন এই আমতলা জামতলা আর উজ্জ্বল রৌদ্রে-ভরা মাঠ, বাঁশঝাড় ঝুঁকে-পড়া স্বল্পবারি হরিহরের কাছ থেকে। এই শেষের পাঠই বড় হয়ে উঠল পরবর্তী জীবনে। কবি অমৃত নাথ।

খেরোর মলাটের মস্ত এক খাতা বেঁধে নিয়ে গানের পর গান লিখে যান। নিজের বাঁধা গান গেয়ে গেয়ে বেড়ান। নামডাক হল দেখতে দেখতে। নতুন ধাঁচের কীর্তন। কৃষ্ণ রাধিকা কুব্জা-বৃন্দার মনের কথা সুর করে শুধুমাত্র গানে নয়, গদ্যভাষাতেও বলেন। শ্রোতার চোখে ধারা বয়ে যায়। এক-এক সুরের পদ সমাধা হয়ে গেলে ভনিতা: হে নাথ, অমৃতনাথের অন্তিমে তুমি পদাশ্রয় দিও। নাথ সেটা নির্ঘাত দেবেন—আশ্রয় দেবার এমন সদাশয় মানুষ কলির ভুবনে ক'টি মেলে?

পৌষমাসের কনকনে শীতে রাতদুপুরে একবার বাস থেকে নামলাম এই চীনাটোলায়। নাগরগোপের ফকির-রাস্তা হয়নি তখনো—মাটি দিয়ে সবে নিশানা করেছে। এখনকার মতো দোকানপাটও হয়নি

ফকির-রাস্তার মুখে। সঙ্গে ভারী বোঁচকা—বাড়ির লোকের কিছু কাপড়চোপড়, এবং কপি ও কমলালেবু। সেকালে কপির চাষ হত না আমাদের ওদিকে—যে-কেউ বাড়ি যাবে, কপি-লেবু একবোঝা নেবেই। রাত্রির অন্ধকারে বোঝা ঘাড়ে করে দুইক্রোশ পথ যাওয়া মুশকিল—রেখে যাব নাথমশায়দের বাড়ি, কাল সকালে গ্রাম থেকে লোক এসে নিয়ে যাবে। তাই পথ কিছু বেশি হলেও নাগরগোপ অবধি না গিয়ে চীনাটোলায় নেমেছি।

কৃষ্ণপক্ষের শেষাশেষি কোন একটা তিথি। বিষম আঁধার। আমবাগান ছাড়িয়ে নাথমশায়দের উঠানে পা দিতে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল। এই, এইও—করে কুকুর সামলাচ্ছি। ঘরের ভিতর থেকে স্ত্রীকণ্ঠের সাড়া : কে?

বাড়ি ডোঙাঘাটায়—

দরদালানের ভিতর থেকে অমৃত নাথ চেঁচাচ্ছেন : উঠোনে কেন? চালের নিচে রোয়াকে উঠে বসুন। পোষা কুকুর, কামড়াবে না।

আমাদের এদিকে কেন জানিনে, শীতটা বড় বিষম। পৌষ-মাঘে হাড়-কাঁপানো শীত পড়ে। টেমি জ্বেলে কাচের চৌখুপির মধ্যে ভরে অমৃত নাথ কোঁচার মুড়ো গায়ে শীতে তুরতুর করতে করতে বেরিয়ে এলেন। আর আগে যে স্ত্রীকণ্ঠ শোনা গেল—অমৃত নাথের বিধবা বোন তিনি—বেরিয়ে এসে হুকুম ছাড়েন : বাইরে কেন, হাত-পা ধুয়ে ঘরের মধ্যে ভাল হয়ে বসুন। পাটকাঠি ধরিয়ে জল গরম করে এনে দিচ্ছি।

আমি কি বলব! আমার চারগুণ বয়সের স্ত্রীলোক, কথাগুলো হুঙ্কারের মতো শোনালেও, 'আপনি' 'আপনি' করে বলছেন। বলতে বলতে পাটকাঠির আঁটি নিয়ে ঢুকে গেলেন রান্নাঘরে। অমৃত নাথকে বলি, জিনিস রইল—বাড়ি চলে যাব আমি এক্ষুনি।

অমৃত হেসেই উড়িয়ে দেন : যাবেন বই কি! যা-হোক দুটো মুখে দিয়ে শুয়ে পড়ুন আপাতত। অন্ধকারে দু-ক্রোশ পথ ভাঙা সোজা! সকালবেলা যাবেন।

কী বিপদে পড়লাম বলুন তো! আজ্ঞে হ্যাঁ, বিপদই। কলকাতা থেকে প্রায় এক-শ মাইল এসে এখন তিন-চার মাইলের জন্য পড়ে থাকা অন্য এক জায়গায়। শহুরে ভদ্রতা নয় যে মুখের একটা কথা ছেড়ে দেওয়া হল—তার পরে প্রত্যাশায় আছে, ওদিক থেকে ঘাড় নেড়ে প্রতিবাদ আসবে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তাব বাতিল। এঁরা যা মুখে বলেন, করতেও চান ঠিক-ঠিক তাই।

বারম্বার না-না করায় স্ত্রীলোকটি ভাবলেন, রান্নার আলস্য। তখন পাথরের বাটি ভরতি নতুন-চিঁড়ে মর্তমানকলা এবং নলেনপাটালি এলো। পুো বাটি গলাধঃকরণ করে ছাড় হল কোনরকমে।

কিন্তু পরেও আছে। অমৃত নাথের ছোটভাই ডাক্তার—তার উপরে হুকুম: যাবেনই যখন, লণ্ঠন ধবে গাঙের সাঁকো পার করে দিয়ে এসো। শিশির পড়ে সাঁকোব বাঁশ পিছল—অন্ধকারে একা ছেড়ো না।

নিশিরাত্রে লণ্ঠন হাতে ডাক্তার আমাব আগে আগে সাঁকোর উপব উঠল। পার হয়েও এগিয়ে চলল। ফেরাতে পারিনে।

যাচ্ছি গো যাচ্ছি, এই বাঁশবনটা পার কবে দিয়ে যাই....

আজকে দেখুন, চীনাটোলার বাজাবে নীরন্ধ্র অন্ধকাব। আম-বাগানের ওপারে নাথমশায়দেব দালান আছে কি নেই, জানিনে। দেশ ভাগ হয়ে যাবার পব তাঁরা শুনেছি ভিটামাটি ছেড়ে ওপারে ভেসে পড়েছেন। মেলার দিনে আলোয় মানুষের হাঁকডাকে চারিদিক সরগরম থাকত, এখন কান পেতে শুনতে পাবেন ঝিঁঝির ডাক। আর অনেক দূরে কোনখান থেকে তক্ষক এক একবার কাকে যেন অভিশাপ দিয়ে উঠছে।

॥ নয় ॥

নাগরগোপে এসেছি। বটতলায় বাস দাঁড়াল। নেমে পড়ুন। পূবমুখো সোজা পথ—ফকির-রাস্তা। চোখ বুঁজে চলে যাবেন, পথ হারানোর ভয় নেই।

কী কষ্টের পথ ছিল এইটুকু! পথই বা কোথা? বর্ষাকালে এখানে কোমর-জল, ওখানে গলা-জল, হাঁটুভর কাদা। ধানক্ষেতের আ'ল ধরে চলেছেন, কখনো বা এর ঘরের কানাচ দিয়ে ওর পুকুরপাড় দিয়ে। দুটো মাত্র যান—গরুর-গাড়ি আর পালকি। তার মধ্যে গরুর-গাড়ি আষাঢ় থেকে আশ্বিন-কার্তিক অবধি অচল। এঁটেল কাদায় চাকা বসে যায়, গরুতে মানুষে কাঁধ দিয়ে চাকা ঠেলে তুলতে পারে না। পায়ে হাঁটতেও চোখের জল বেরিয়ে যায়, দু-দণ্ডের পথে দশ দণ্ড লাগে।

আর আজকে আপনার ট্যাঁকের জোর থাকে তো ট্যাক্সি ভাড়া করুন না সদর থেকে একেবারে গ্রাম অবধি। হরিহরের উপর দিয়ে ফকির পাকা-পুল করে দিয়েছেন 'পিতামাতার ছুওবার্থে'—কোনো চিন্তা নেই, ধুলোর ঝড় উড়িয়ে মোটরগাড়ি আমাদের হরিতলায় গিয়ে পৌঁছবে। ভাগ্যবান কত ধনীজন যান এমনি মোটর হাঁকিয়ে। জীপগাড়ি তো হরবখত ছুটোছুটি করত সেবারের ইলেকশনের সময়ে। ছোটবেলা দেখেছি, একটা সাইকেল অঞ্চলে এসে পড়লে তামাম মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসত। আর এখন মোটরগাড়ি ভকভক করে আসছে, গরুটা অবধি দু-পা সরে গিয়ে পথ দেবে না।

আরও হত ফকির যদি বেঁচেবর্তে থাকতেন। অনেক রকম বাসনা ছিল তাঁর—মেটে-রাস্তা নয়, খোয়া পড়ত রাস্তার আগাগোড়া,

লাইনের বাস চলত গড়ডাঙার-হাট বেলকাটি সাতাশকাটি পেঁজে নারাণপুর হয়ে সেই কাটাখালি অবধি। কিন্তু খোদাতালাহ্ হতে দিলেন না। নানারকম জটিল অসুখে ভুগে অনেক কষ্ট পেয়ে ফকির মাটি নিলেন। সারা জীবন হিত ছাড়া কারো অহিত করেন নি, সে মানুষের এমন কষ্ট কেন শেষ-সময়ে? এবং একমাত্র ছেলে অপঘাতে মরে জীবনকালেও কম দাগা পান নি তিনি।

এতবড় রাস্তার সমস্ত মাটি একলা ফকিরের পয়সায়। সরকারের সাহায্য চাননি। একবার এমন কি ইউনিয়ন-বোর্ড থেকে রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণের কথা হলে সাতগ্রামের মানুষ নিয়ে তিনি রুখে দাঁড়িয়েছিলেন: ঠিকাদার বাবুদের বড়লোক করবে, আর দেশের মানুষ শাপমন্যি দেবে—ও-সমস্ত হতে দেবো না আমার এই রাস্তা নিয়ে। বড়রাস্তা থেকে ফকির-রাস্তা বেরিয়েছে, সেই তেমাথার উপরে পুকুর কেটে শানের ঘাট বাঁধিয়ে দিলেন। পথিকজন এসে আশ্রয় নেবে, তার জন্য পাকা-দালান একটা বানালেন ঠিক ঘাটের উপর।

বেলকাটি গাঁয়ে ফকিরের বাড়ি। উষাকালে স্নান করে ফকির থানে এসে বসেন, রোগিপত্তর ও শিষ্যসেবকের ঝামেলা সেরে উঠতে বেলা পড়ে যায় প্রতিদিন। শুক্রবারের দিন থানে বসেন না, ওই দিনটা ছুটি। কাজ থাকুক বা না-থাকুক, প্রতি শুক্রবারে ঘুরে বেড়াতেন তিনি নিজের রাস্তার উপর। চার মাইলের মাথায় এই নাগরগোপ অবধি চলে আসতেন; আবার ফিরে যেতেন। জ্যৈষ্ঠের খর দুপুরে দেখেছি, শ্রাবণের ভন্নার মধ্যে দেখেছি। উত্তর-দক্ষিণ পূব-পশ্চিম যেদিকে পা ফেলবেন, ফকিরের ভক্ত। ছাতা নিয়ে ছুটছে কেউ ফকিরের মাথায় ধরবার জন্যে, ফনফন করে নারকেলগাছের মাথায় উঠে যাচ্ছে ডাব পেড়ে ফকিরের মুখে ধরবার জন্যে। ফকির ভ্রূক্ষেপ করেন না—চলেছেন, এটা-ওটা দেখতে দেখতে নিজের সঙ্গে আলাপ করতে করতে অবিরত পা ফেলে চলেছেন।

হরিহরের পুলের আগে রশি-দুই জায়গায় বিষম কাদা হত।

এক পা বসে গেছে—সেটা তুলবার চেষ্টায় অপর পায়ে চাপ দিচ্ছেন, সেটাও বসে যাচ্ছে কাদার নিচে। এমনি অবস্থায় যাচ্ছি আমি একদিন। বাঁকের আড়ালে চটচট আওয়াজ—সেখানেও অতএব কাদা ভেঙে চলেছে অন্য কেউ। সেই মানুষ কথা বলে উঠল : দেখি কাদা, আসছে-বার থাকিস তুই কেমন করে!

মোড় ঘুরে সামনাসামনি এসে দেখি গোলাম আলি ফকির। দ্বিতীয় মানুষ নেই সঙ্গে। একাকী শাসাচ্ছেন কাদাকে।

সে কেবল মুখের শাসানি নয়। মাসখানেকের ভিতরে দেখি, নৌকো বোঝাই পাথুরে-কয়লা এনে গাদা দিচ্ছে আমাদের তালতলার ঘাটে। বিলের প্রান্ত দিয়ে রাস্তা, রাস্তার ধারে তালগাছ, সেই গাছ হল ঘাটের নিশানা। বর্ষার সময়টা বিলে অথই জল, নৌকো আসে কাটাখালি পার হয়ে, পুবঅঞ্চলের ব্যাপারিরা এসে পড়ে। ওই কয়েকটা মাসই শুধু—জল শুকিয়ে তারপরে আবার শুকনো ডাঙা, ভূঁই ফেটে চৌচির। ধান কেটে-নেওয়া মাঠ হা-হা করে মরুভূমির মতো। তখন কে বলবে, জল খলবল করত বর্ষায় এখানে—জাল ফেলে লোকে মাছ ধরত।

এই আমাদের বিল। চলুন গাঁয়ে, চলুন আমাদের বাড়ি। বাইরের উঠানে দাঁড়িয়েই আমাদের বিল দেখতে পাবেন।

অতএব যত কিছু আমদানির ব্যাপার, বর্ষার ভিতরে আমরা সেরে ফেলি। ফকির তাই করলেন—পাঁজা পোড়াবেন বলে কয়লা এনে গাদা দিয়ে রাখলেন ঘাটে। জল শুকিয়ে গেলে তখন বিস্তর বখেড়া—কাটাখালি মাল খালাস করে সেখান থেকে গরুর-গাড়ি করে আনো। কয়লার যা দাম, তার দুনো তেদুনো লেগে যাবে গাড়িভাড়ায়।

কয়লা এসে গেল তো তারপর শীতকাল পড়লে ইট কেটে বড় বড় পাঁজা সাজানো হল ফকির-রাস্তার ধারে ধারে। ইট পুড়ল, কড়া-রকম পুড়িয়ে ঝামা হল।

চলুন এগিয়ে—জুতো পায়ে খটখটিয়ে চলে যাবেন পুলের ধারের

সেই জায়গা দিয়ে। ফকির যা বলেছিলেন তাই, ফকিরের কথা মিথ্যা হয় না। কাদা জব্দ হয়েছে। ইচ্ছা ছিল, গোটা রাস্তাই অমনি পাকা করে দেবেন। মারা গেলেন বলে হয়ে ওঠেনি। আর ফকির মুখেও বলেন নি মনের সেই ইচ্ছাটা। মুখ ফসকে দৈবক্রমে বেরিয়ে গেলেও ইচ্ছার ঠিক পূরণ হয়ে যেত। ফকিরের কথার নড়চড় হয় না।

শুনুন তবে। গল্পের মতন শোনাবে। একালে এমনও হয়! খেজুরগাছের চাষ এই অঞ্চলে অনেক পুরনো আমল থেকে। খেজুর-গুড়, খেজুর-পাটালি, খেজুর-চিনি। এই সেদিন অবধি ঠাকুরমশায়রা পুজোআর্চায় কলের চিনি আনতে দিতেন না, খেজুর চিনির নৈবেদ্য হত। পুরনো দিনের সে সমাদর নাই থাকুক, খেজুরগাছের চাষ এখনও ঘোরতর চালু আমাদের তল্লাটে। রস-গুড় বানিয়ে বেশ দু-পয়সা পায় চাষিরা।

গাছ কেটে রস আদায়ের কায়দাটা দেখেছেন? শীর্ষদেশের খানিকটা আড়াআড়ি কেটে দেয়। লম্বা ধিড়িঙ্গে গাছগুলো দাঁত বের করে বিকট হাসি হাসছে আপনার দিকে চেয়ে, এই রকমটা মনে হবে। অতি ছোটবেলায় আমার ভয় করত একা-একা খেজুরবনে ঘুরতে, দাঁত বের করে সত্যিই তারা ছেলেমানুষকে যেন ভয় দেখাচ্ছে। ওই যে কেটে দিয়েছে, বাঁশের নলি পোঁতা তার নিচে। সেখানে ভাঁড় ঝুলিয়ে দেয়, নলি বেয়ে রস টপ-টপ করে ভাঁড়ের ভিতর পড়ে। গাছের সঙ্গে যে-দড়ি দিয়ে ভাঁড় ঝুলায়, তাকে বলে উড়ো-দড়ি।

ফকিরের আড়াই পণ খেজুরগাছ—গুড়-চিনিতে কম করে ধরলেও দেড়-দু'হাজার টাকা রোজগার। দড়ি ছিঁড়ে ফকিরের গরু একজনের মটর-ক্ষেতে ঢুকেছিল। লোকটা নালিশ জানাল। মাহিন্দারকে ডেকে ফকির বলেন, নতুন কোষ্টা উঠেছে,গরুর ভাল দড়ি হয় নি কেন?

মাহিন্দার বলে, কোষ্টা রেখে দেওয়া হয়েছে উড়ো-দড়ির জন্য।

ফকির রাগ করে বলেন, গরুর দড়ি বানা আগে, দরকার নেই উড়ো-দড়ির।

বলেই জিভ কাটলেন। কী কথা বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে! কিন্তু যা বলেছেন, অন্যথা হবে না। উড়ো-দড়ির দরকার নেই অর্থাৎ খেজুরগাছ কাটা হবে না রস আদায়ের জন্য। আড়াই পণ গাছ এমনি পড়ে থাকবে। যে শোনে সে অবাক হয়—অত টাকা লোকসান একটা মুখের কথার জন্য! বোকামিও বলছে অনেকে। ফকিরও যে না বোঝেন, এমন নয়। কিন্তু কথা কিছুতে মিথ্যা হতে দেবেন না।

কথার এতদূর দাম দেবার জন্যই বোধহয় অদ্ভুত রকমে তাঁর কথা খাটত। একটা ঘটনা আমি নিজচোখে দেখেছি। বড়দাকে সদরের আদালতে গিয়ে সাক্ষি দিতে হবে। কিন্তু জ্বর এসে গেল মামলার তারিখের আগে। অনেকবার গরহাজির হয়েছেন, এবারে হাকিম কিছুতে সাবকাশ দেবে না। মামলা ফেঁসে যাওয়ার যোগাড়। ফকিরকে গিয়ে বললেন বিপদের কথা। জ্বর আপাতত না-ই যদি সারে, চাপা থাকুক মামলার এই ক'টা দিন।

ফকির রাজি হলেন। সন্ধ্যার মুখে বড়দা রওনা হবেন—ঠিক দুপুরবেলা তাঁর হাত-পা ঠাণ্ডা, কাঁপুনি দিয়ে যথানিয়মে জ্বর আসছে। ছুটলেন ফকির-বাড়ি। ছেলেমানুষ আমিও সঙ্গে আছি। ফকিরকে বড়দা যাচ্ছেতাই করে বলতে লাগলেন, কেন মিথ্যে ভরসা দিয়েছিলে? মামলায় হেরে তো ভিটে ছাড়তে হবে আমায়।

শোরগোল পড়ে গেছে ফকিরের থানে—ফকির কিন্তু অচঞ্চল, মৃদু-মৃদু হাসছেন তিনি বড়দার দিকে চেয়ে। চেঁচামেচি ঠাণ্ডা হয়ে এলে তখন বললেন, জ্বর আসবে না। বন্ধ করে দিয়েছি, চলে যান আপনি মামলায়।

কী আশ্চর্য ব্যাপার! বড়দার গা ঘামতে লাগল একটু পরে, তিনি আরাম বোধ করলেন। আমার নিজের চোখে দেখা ব্যাপার, কেমন করে হল বলতে পারব না। যথাধর্ম বলছি, একবর্ণ মিথ্যা নয়।

সকাল-বিকাল দেখতাম, গাঁয়ের পথ ধরে বিস্তর মেয়েপুরুষ

বেলকাটি চলেছে। আট-দশ ক্রোশ দূরের মানুষও আসে—পায়ে হাঁটে, গরুর-গাড়িতে আসে। বেলকাটি ফকিরের পৈতৃক বাড়ি, বাইরের এক দোচালা খোড়োঘরে তাঁর থান। সেই ঘরে তিনি আসন-পিঁড়ি হয়ে বসেন, নানান তল্লাটের রোগিরা কাতারে কাতারে এসে জড়ো হয়। হাতে সকলের ঘটি বা ফেরো। পুকুর-ঘাট থেকে জল ভরতি করে ঘটি-ফেরো ফকিরের সামনে এনে রাখল—ফকির মন্ত্র পড়ে বার তিনেক ফুঁ দিলেন ওই জলে, এবং ফুলের একটা পাপড়ি ফেলে দিলেন। ওই হল একমাত্র অষুধ। সকল রকম রোগের অব্যর্থ অষুধ ওই জলপড়া। ঢকঢক করে রোগি জলপড়া খানিকটা খেয়ে নেবে। তার সঙ্গে অন্য যে ব্যবস্থা—শুনলে তো ডাক্তারবাবুরা মার-মার করে উঠবেন। বিশ থেকে একশ-বিশ ভাঁড় জলে ত্রিসন্ধ্যা স্নান, এবং ভাতের সঙ্গে তেঁতুল-গোলা পথ্য। রোগ যত কঠিন, ভাঁড়ের সংখ্যা এবং তেঁতুল-গোলার পরিমাণ সেই অনুপাতে বাড়বে। যা ভাবছেন তা নয়—মরত কালেভদ্রে, বিস্তর নিরাময় হতে দেখেছি। নয় তো এত মানুষের ভিড় হবে কেন বলুন। খরচপত্র অতি সামান্য—পাগলবাবার নামে পাঁচটা পয়সা দিয়ে যাবেন পয়লা জলপড়া নেবার সময়। আর মনে-মনে কিছু মানত করবেন। রোগ-পীড়া নিরাময় হলে ঢাকঢোল বাজিয়ে মনের আনন্দে মানত শোধ দিয়ে যাবেন আর একবার এসে।

বাড়ির সামনে পুকুর কেটে প্রশস্ত ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছেন ফকির। ঘাটের দু-পাশে দুই লম্বা চালা। একটায় হিন্দুরা এসে ওঠে, একটায় মুসলমানরা। হিন্দুরা পাঁঠা বলি দিয়ে মানত শোধ দিয়ে যাচ্ছে, মুসলমানরা মুরগি জবাই করছে। একই উঠানের এপাশে-ওপাশে। সেই প্রসাদি গোস্ত রেঁধে সদলে খাওয়াদাওয়া করে তবে নড়বে ফকির-বাড়ি থেকে। ছেলেবয়সে ফকির-বাড়ি কত আনাগোনা করতাম!

মেলা হত বছরে একবার, হপ্তা-খানেক ধরে। দূর-অঞ্চলের ভক্তশিষ্যরা আসত, ফকির খাওয়াতেন সকলকে। বিস্তর দোকানপাট,

বিকালে কুস্তি ও ঢালিখেলা, সন্ধ্যার পর জারি, কবি কিংবা ঢপগানের আসর। শিষ্যরা প্রণামি পয়সা দিত থানে, সারাদিন ধরে জমত, প্রকাণ্ড ধামা পুরে যেত পয়সায়। তার মধ্যে একটি পয়সাও ফকির নিজের ভোগে নিতেন না। দশের কাছ থেকে এসেছে, দশের কাজে ব্যয় হবে। এই ফকির-রাস্তা সেই পয়সায়। ফকির মারা গেছেন, দশেধর্মে আজও তাঁর নাম করে।

।। দশ ।।

ফকির-বাড়ি এক বন্দুক ছিল। ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব এক রকম জোর করে চাপিয়েছিলেনঃ আপনাকে সবাই ভালবাসে ফকিরসাহেব, আপনার দরকারে না লাগুক তবু রেখে দেওয়া ভাল। না-ই বা কামড়ালেন—ফোঁস করবেন, তাতেই খুব কাজ হবে। রাত্রিবেলা ফাঁকা আওয়াজ ছাড়বেন তুটো-একটা, গাঁয়ের মধ্যে চোর-ডাকাত আসবে না।

এর পরে ফকির আর আপত্তি করেন নি। বন্দুক থাকে দালানের দেয়ালে টাঙানো। একটি মাত্র ছেলে ফকিরের, বড়-ইস্কুলে পড়ে। বয়স যাই হোক, খায়দায় ভাল, দিব্যি গায়ে-গতরে হয়েছে। একদিন কখন বন্দুক নিয়ে বেরিয়েছে, ফকির কিছু জানেন না, থানে বসে যথারীতি ব্যবস্থা দিচ্ছেন। ঠিক তুপুরে খবর এলো, অনেক দূর কোন্ খেজুরবাগানে চষা-ভূঁয়ের উপর ছেলে পড়ে আছে। অচেতন, রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে—পাশে বন্দুক। যে লোকটা খবর দিতে এসেছে, গরু খুঁজতে খুঁজতে দৈবাৎ ওই খেজুরবাগানে গিয়ে পড়ে। দেখেই ছুটতে ছুটতে এসেছে। কতক্ষণ ধরে ছেলে সেই অবস্থায় পড়ে আছে, কেন গিয়েছিল ওদিকে, সঙ্গে আর কেউ ছিল কিনা—কেউ কিছু বলতে পারে না।

অটল ডাক্তার আমাদের গাঁয়ের। ডাক্তার তাস খেলছেন। ডাক্তার-বাড়িতে গাঁয়ের লোকের আড্ডা—আজ নয়, দু-পুরুষ ধরে। এমনি সময় খবর এলো, গোলাম আলি ফকিরের ছেলের এই অবস্থা। চলুন ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে উঠলেন। উঠে এদিক-ওদিক তাকান। ফকিরের বিপদে নানা গ্রামের বিস্তর মানুষ জুটবে। একলা ডাক্তার গেলে পশার থাকে না, কম্পাউণ্ডার সঙ্গে চাই। কম্পাউণ্ডার কাকে পাওয়া যায়?

সুশীল এক ৎ বঘুরে ছোকরা—গ্রামেরই বটে, কিন্তু বাইরে বাইরে থাকে। হেন কাজ নেই যা সে পাবে না। মানুষ পটাতে আর সেই মানুষকে অতর্কিতে বড় রকমের ঘা দিয়ে সরে পড়তে, চাকরি বাগাতে এবং নিরুদ্বেগে চাকরিতে ইস্তফা দিতে তার জুড়ি নেই। ইদানীং কাজকর্ম না থাকায় বাড়ি এসে চেপেছে, এবং যেদিন এসেছে সেই দিন থেকেই পালাই-পালাই করছে।

অটল ডাক্তার সুশীলকে বললেন, তুমি চলো। পারবে না?

সুশীল হেসে বলে, কম্পাউণ্ডাবিই তো পড়েছি এতদিন বাইরে থেকে। পাকা কম্পাউণ্ডার। ফকির-বাড়ি যাব, নিশ্চয় পাওনাগণ্ডা আছে। বাক্স বের করে দিন, ঘাড়ে তুলি।

নিজের দিকে চেয়ে বলে, একটা জামা চড়িয়ে আসব নাকি বাড়ি থেকে? কি বলেন?

অটল বললেন, তাই যাও, দেরি কোরো না। শুধু অষুধে হবে না, যন্ত্রপাতি লাগবে। সেই সব গুছিয়ে আমি ততক্ষণ ব্যাগে ভরে ফেলি।

অটল হোমিওপ্যাথি ডাক্তার। পড়ার সম্পর্কে সুশীল যা বলল, সে ইতিহাস অটলেরই। হোমিওপ্যাথিতে গেলেন—যেহেতু পাঁচ সিকায় হোমিও-বিজ্ঞান বই এবং আড়াই টাকায় বাক্স সহ বত্রিশ দফা অষুধ—একুনে তিন টাকা বারো আনা মূলধনে পুরো ব্যবসা চালু করা যায়। প্রথমে বয়সে অটল দেশে থাকতেন না—কখনো মামার-

বাড়ি কখনো দাদার-বাসা করে করে বেড়াতেন। দাদা ন্যাশনাল কলেজের ডিপ্লোমা-পাওয়া ডাক্তার। কর্মস্থলে যোগাড়যন্তর করে তিনি অটলের বিয়ে দিয়ে দিলেন। বিয়ের পরও অটল কিছুকাল এখানে-সেখানে ঘুরে অবশেষে গাঁয়ে এসে উঠলেন। চিরকাল বসে খাওয়া চলে না—একটা-কিছু করতে হবে। একবার ভাবলেন সুপারির ব্যবসা। অথবা ইউনিয়ন বোর্ডের কনট্রাক্ট নিয়ে রাস্তায় মাটি ফেলার কাজ। হঠাৎ এক সুবিধা হয়ে গেল। ডাক্তার আহ্লাদ সরকার হাতে-গাঁটে ছু-পয়সা জমিয়ে শহরে গিয়ে ডিসপেনসারি খুলে বসলেন। সকলে হায়-হায় করে: গাঁয়ে কেউ ডাক্তার রইল না, ছু-বার ভেদবমি হলে ছোটো সেই কেশবপুর অবধি।

অটলকে বলে, এতকাল দাদার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করলে, তুমি কিছু শিখে আসতে পার নি?

শিখিনি মানে? কলেজে বসে বসে ঘোড়ার ঘাস কেটেছি নাকি এতদিন! ডিপ্লোমা রয়েছে। নাম-লেখা ছাপা ডিপ্লোমা।

সেই মুহূর্তে মনস্থির হয়ে গেল। ডাক্তার হবেন অটল। ভি-পি-তে বই-অষুধ এসে গেল। বাড়তি আরও কয়েকটা টাকা ডিপ্লোমার দরুন পাঠাতে হল কলকাতার এক হোমিওপ্যাথি-কলেজে। ডিপ্লোমাও ডাকে এসে পৌঁছল। দেয়ালে ডিপ্লোমা ঝুলিয়ে ঘোড়া কিনে অটলচন্দ্র ষোলআনা ডাক্তার হয়ে বসলেন। দাদা ডিস্ট্রিকবোর্ডের ডাক্তার—একবার সুবিধামতো সেখানে গিয়ে কুইনিন আ.য়াডিন ইত্যাদি এবং মরচে-ধরা কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে এলেন। কাজে না লাগুক, সাজিয়ে রাখতে হয় এ সমস্ত। ভেক ধারণ করলে তবেই লোকে ভিখ দিতে আসে।

তা যাই বলুন, বই দেখে দেখে ছু-চারটে রোগি যে না সারছে এমন নয়। অষুধও বাড়ছে—শিশি খালি হলে অটল তা ফেলেন না, জল ভরতি করে আলমারিতে রেখে দেন। আলমারি ক্রমশ ভরে উঠল শিশিতে। আর ঈশ্বর মুখও একখানা দিয়েছেন বটে, সে মুখে কোনো-

কিছু আটকায় না। দাদার বাসায় যান, চতুর্দিকে রটনা হয়ে যায় কলকাতার ইউনান সাহেব একটা কঠিন রোগের হদিস পাচ্ছেন না, কেঁদেকেটে অটলকে চিঠি দিয়েছেন রোগিকে একবার দেখে যাবার জন্য।

পুরানো কথায় অনেকটা সময় নিলাম। স্ফূর্তি করে অটল ডাক্তার সাজপোশাক করলেন, যন্ত্রপাতি বের করবার ভাল মওকা মিলেছে অনেক দিনের পরে। ফকিরের বিপদে দশগ্রামের মানুষ এসে ভিড় করবে, তাদের সামনে যত কিছু কেরামতি দেখিয়ে দেবেন আজ। ডাক্তার কদম-চালে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। সুশীল কোথা থেকে সাইকেল জুটিয়ে এনেছে, ঘোড়ার পিছন ধরে তার সাইকেল চলল।

সুশীলের মুখে বৃত্তান্ত শুনেছি পরে। পেটের একদিকে ক্ষত, রক্ত তখনো বন্ধ হয়নি। ডাক্তার একলম্ফে ঘোড়া থেকে নেমে পাশে উবু হয়ে বসলেন। জনতা হাঁ হয়ে দেখছে। ক্ষতমুখে কড়েআঙুল ঢুকিয়ে দেখে নিলেন একটু, তার পরে ডাক্তারি-সূঁচ দিয়ে ফড়ফড় করে সেলাই করে ফেললেন। চামড়াটা মানুষের, কিন্তু সেলাই করলেন চটের থলে বুনানির কায়দায়। এক রকম প্রলেপ, দু-তিন রকমের খাবার অষুধ দিয়ে ভিজিটের টাকা পকেটে পুরে এবং কম্পাউণ্ডার সুশীলের টাকা তাকে দিয়ে তখনই ঘোড়া ছুটিয়ে বেরোলেন। দেখিয়ে গেলেন ডাক্তারি করা কাকে বলে।

ভোর না হতে ফকির-বাড়ির লোক ছুটেছে আবার। অর্ধ-অচেতন ছেলে অসহ্য আর্তনাদ করছে। সদরেও কাল লোক পাঠানো হয়েছিল, সেখান থেকে বড়-ডাক্তার জন্মেজয় এসে পড়লেন। রোগির অবস্থা দেখে তিনি তো আগুন: কোন আহাম্মক এসেছিল? সেলাই অমনি করলেই হল!

হেন কালে অটল ডাক্তারকে দেখতে পেলেন। দেখে সামলে নিলেন। এক ব্যবসায়ের মানুষ—লোকজনের সামনে গুমর ভাঙতে

নেই। তাড়াতাড়ি বললেন, সেলাই না করে উপায় ছিল না অটলবাবুর। নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়ে, ঠেকাবার মতো অষুধপত্র কোথায় পাড়াগাঁয়ে? তা আমি সমস্ত সঙ্গে নিয়ে এসেছি। গুলি পেটের ভিতর রয়েছে—সেলাই কেটে গুলি বের করে ফেলি আগে।

গুলি বেরুল, কিন্তু জ্ঞান ফিরল না আর ছেলের। জন্মেজয় অটলকে আড়ালে নিয়ে খুব বকাবকি করলেন। সুশীল কেমন করে তা শুনে ফেলেছিল: আচ্ছা ডাক্তার হয়েছেন মশায়, ধুলোমাটি-সুদ্ধ সেলাই দিয়ে চৌরস করে ফেললেন। হোমিওপ্যাথি ফোঁটা ফেলেন, বেশ করেন—ওতে ক্ষতিলাভ নেই। কিন্তু যে বস্তু বোঝেন না, আগ বাড়িয়ে করতে যান কেন?

নানান রকমের লোক থাকে, অটল ডাক্তারের বিরুদ্ধে কেউ কেউ বলেছে ফকিরের কাছে। ফকির বলেন, আল্লাহ্ নিয়ে নিলেন, মানুষের কি হাত! জন্মেজয়ের ভিজিট গাড়িভাড়া হিসাব করে সমস্ত মিটিয়ে দিয়ে ফকির বললেন, এই দশ ক্রোশ পথ ভেঙে গরিবের ডাকে চলে এলেন, আপনার কাছে চিরজীবন কেনা হয়ে রইলাম ডাক্তারবাবু।

একমাত্র ছেলে গিয়েছে, ছেলের মা বাড়ির ভিতর আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছেন, সেখানে গিয়ে ফকির বলেন, আল্লাহ্ নিয়ে নিয়েছেন, কাঁদতে নেই। অঞ্চল জুড়ে কতই তো ছেলেমেয়ে আমাদের!

এবং পরের দিন থেকে থানে বসে ঠিক সেই রকম জলপড়া, ফুলপড়া, তেলপড়া বিলোচ্ছেন।

ফকিরের গল্পে গল্পে কতদূর নিয়ে এলাম দেখুন। হাঁটার কষ্ট টের পেলেন কিছু?

॥ এগারো ॥

হাঁটার কষ্ট সত্যিই শেষ হয়ে এলো। গোটা তিনেক গ্রাম পার হয়ে বাড়ি। ক্রোশ দেড়েক পথ বড় জোর।

হালদারপাড়া। হিমে হালদার মশায়ের বাড়ি পাড়ার মধ্যে। সত্যিকার সম্পর্ক কিছু নেই, হিমচাঁদ-কাকা বলে ডাকি। আসছেন তিনিই যেন। ছাতা খুলে আড়াল করে ধরুন। তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি —মুখ যেন না দেখতে পান। সর্বনেশে মানুষ, চিনে ফেললে রক্ষে নেই।

যে ভয় করেছি, তাই। টিকিয়ে টিকিয়ে যাচ্ছি যে আমরা! হিমে হালদারের কবলে পড়েছেন, বুঝুন ঠেলা এইবারে।

কারা যায়? মুখ দেখাচ্ছ না কেন? নাম বলো। বাড়ি কোথায় তোমাদের?

মাঠ থেকে গরু তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছেন হিমচাঁদ-কাকা। সাড়া না দিয়ে জোরে পা চালাচ্ছি তো গরু ছেড়ে ছুটলেন এইদিকে। আপনি নতুন লোক, আপনাকে নয়—আমায় ঠিক চিনেছেন। লাঠি উঁচিয়ে আসছেন, মেরে পড়েন বুঝি বা!

আচ্ছা ছোকরা তুমি হে! বাড়ির উপর দিয়ে চোবের মতন চলে যাচ্ছ। ডাকলে জবাব দাও না।

বাড়ি কোথায় কাকা? এ তো পথ।

(আপনি দেখছেন, পথও নয়—জঙ্গল। মানুষও কেউ নেই, ঝিঁঝিঁ ডাকছে পল্লীর নিঃশব্দ রাত্রে। সকালবেলা যেমন বিশ্বাস-মশায়দের বাড়ি দেখিয়ে আনলাম, হালদারপাড়ার মাঠও দেখাচ্ছি তেমনি। আমার সেকালের চোখ দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আপনি না দেখলে নাচার।)

হিমচাঁদ-কাকা চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটছেন : তাই তো বলছি হে! পথ দিয়ে যাওয়া হচ্ছে বাবুদের ছাতি আড়াল দিয়ে। বাড়ি ঘুরে যেতে কি হয়েছিল?

বলতে বলতে লাফ দিয়ে পগার পার হয়ে রাস্তার উপর। একেবারে সামনাসামনি। তবে নতুন লোক আপনার সামনে বলেই আজকের কথাবার্তা পলকের মধ্যে মোলায়েম হয়ে গেল।

কলকাতা থেকে আসছ? ডুমুরের ফুল হয়েছ, দেখা পাওয়া যায় না। এদ্দিন পরে এলে, আমাদের বাড়ি হয়ে ছুটো খবরাখবর শুনিয়ে যাওয়া তো উচিত।

আপনাকেও সাক্ষি মানলেন : বলো না হে বিদেশি কুটুম্ব। অন্যায় বলছি কিছু?

কতকাল পরে আসছি হিমচাঁদ-কাকা। বাইরের মানুষ এঁকে সঙ্গে নিয়ে এলাম। বাড়ির জন্যে মন উতলা, কাল-পরশুর মধ্যে একদিন আসা যাবে।

সেইজন্যেই তো আরও থাকতে বলি। বাইরের কুটুম্ব কি ভাববে? কিছু নয়, চাট্টি ডাল-ভাত খেয়ে রাত্তিরটা শুয়ে থাক। সকালে উঠে গুটগুট করে চলে যেও।

ক্ষমা দিন হিমচাঁদ-কাকা, এই তো সামান্য একটু পথ—

জলে পড়ে যাওনি হে। এত করে বলছি, থেকে যাও।

তারপরে আমাদের গ্রাম্য লোকের পক্ষে যা মোক্ষম অস্ত্র, সেই জিনিষ প্রয়োগ করলেন : ডাল-ভাত মানে ভেবেছ ভাতের সঙ্গে শুধুই ডাল, আর কিছু নয়? কাল হাট বার ছিল—কাটা-ইলিশ এনেছিলাম, ইলিশের ঝোল কাঁচকলা দিয়ে।

ইলিশ চাকা-চাকা করে কোটা, নুন-মাখানো—হাঁড়ি ভরতি হয়ে আসে পদ্মা-মেঘনার অঞ্চল থেকে। সেই বস্তুর লোভে আমি এবং আপনি আর এক পা-ও এগবো না, হিমচাঁদ হালদার তাই অকাট্য রূপে ধরে নিয়েছেন। কথাটা বলে ফেলে তাকাচ্ছেন একবার আপনার

মুখে একবার আমার মুখে। ষোলআনা ভিজেছি বলে মনে হল না। তখন নরম সুরে বলেন, বাড়িটা ঘুরে চলো একবার বাবা। নইলে তোমার কাকিমা কথা বলবে না তেরাত্রি। সে কী জ্বালা—বিয়ে করোনি বাবাজি, আর বিদেশি কুটুম্ব করেছে কিনা জানিনে—বিয়ে না হলে সে জ্বলুনি বোঝা যায় না।

দেখতে পাচ্ছেন, পঞ্চাশের উপর বয়স, তার উপর কাকা বলে ডাকি। কিন্তু মুখের আঁটঘাট নেই। নিজের মেয়ের সঙ্গেও ঠিক এমনি সব বলতে পারেন। বাড়িটা একবার ঘুরে যাওয়া ভাল। এ মানুষকে ঘাঁটিয়ে কাজ নেই—কি বলেন ?

বাড়ি গিয়ে মেয়েকে ডেকে নিশ্চয় বলবেন, কেমন সুন্দর বর জুটিয়ে আনলাম রে গৌরী—

আমায় দেখিয়ে বলছেন। এমন বলা শতেকবার হয়ে গেছে। এবং একলা আমায় নিয়ে নয়—পছন্দসই ছেলেছোকরা যাকে পান, তার সম্বন্ধেই বলেন। আপনাকে নিয়েও বলতে পারেন।

ফর্সা মেয়ে গৌরী। পাড়াগাঁয়ে এমন ফর্সা কদাচিৎ পাবেন। ছুটে বেড়ায়, হাঁটে না। বুঝি পারেই না হাঁটতে।

হিমচাঁদের মা বেঁচে আছেন—নিস্তারিণী। ফোকলা দাঁত, শনের মতো চুল, মাজা পড়ে গিয়েছে। তিনিও বলতেন নাতনিকে ডেকে, ও দিদি, বিয়ে করবি এই ছেলেকে ? কলকাতার ইস্কুলে পড়ে। জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হবে। দেখতে কার্তিক।

গৌরী আড়চোখে তাকিয়ে লাল-টুকটুকে ভ্রূ নাচিয়ে বলত, লোহার কার্তিক !

রংটা কিছু ময়লা আমার। তাই বলে এত দেমাক একফোঁটা মেয়ের ! রাগ হয় কিনা, বলুন আপনি ? রং-ই মানুষের সব নয়। তুমি ইংরেজি অক্ষরে নামটা লিখতে পার না, আমি ঝর-ঝর করে পুরো একখানা ইংরেজি চিঠি লিখে ফেলি। তবে ? এর পরে রোখ চাপে কিনা বিয়ে করবার জন্য, বলুন। বিয়ে হয়ে গেলে জাঁক তখন কোথায়

থাকে, দেখব। পতি পরম গুরু—পায়ের তলায় কাদা হয়ে থাকতে হবে।

(হায় রে, অন্ধকার বনজঙ্গলে কোথায় পাব সে-আমলের গৌরীদের! আন্দাজ করুন, বাইরে-বাড়ির শেষ এখানটা—ওদিকে ভিতর-বাড়ি। দু-দুটো উঠানের চতুর্দিকে দোচালা-ঘর আর চৌরি-ঘর। খান দুয়েক পাকা কুঠুরিও। সমস্ত গিয়ে বনজঙ্গল এখন। হবে না কেন বলুন? হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হয়ে বাড়ি সুদ্ধ সরে পড়ল—তার পরে ক'টা মানুষের পা পড়েছে এই জায়গায়! গৌরী বেঁচে আছে শুনেছি। শিয়ালদা স্টেশনে গৌরীর কথা বলেছিলাম—রন্ধনরত সেই বউটার মুখ দেখতে পাইনি, তবু কেমন আমার গৌরী বলে ঠেকল।)

পুকুরঘাট দেখিয়ে আনি আপনাকে। শেয়াকুলের ঝোপ ডাইনে-বাঁয়ে, পায়ের নিচে শিয়ালকাঁটা। কাঁটা না ফোটে, সতর্ক হয়ে আসুন।

একটুকু নাবাল জায়গা পেলেন এইবার। কাঠশোলা আর হোগলার ঝাড়—ঠাহর করে দেখুন, জলও চিকচিক করছে ওর মাঝে। মাঠের-পুকুর ডাকনাম। নিচু হয়ে দেখুন ভাল করে, না হয় ঘাসের চাপড়ায় জুতো ঠুকে দেখুন। ইট আছে, পাতলা পাতলা ইটের গাঁথনি। কোদাল এনে খুঁড়ে ফেলেন যদি, ঘাটে নামবার পুরো সিঁড়ি পেয়ে যাবেন। সিঁড়ির পাশে ছাই আর নারকেল-ছোবড়ার মাজুনি পড়ে আছে হয়তো বা। সকালবেলা পাড়ার গিন্নিরা বাসন মাজতে আসতেন। থালা-বাটি, হাতা-খুন্তি, গামলা-কড়াই। এবং গাঁয়ের যাবতীয় খবর এই ঘাটে :

কি রান্না হয়েছিল দিদি?

ডুবো-তেলে গোটা কয়েক বড়ি ভেজে তাই গুঁড়িয়ে দিও, তার হবে দেখো লাউয়ের ঘণ্টর।

বাড়ির বুড়োকর্তাকে নিয়ে পারা যায় না। হাটের সময় তেলের কথা বলেছি তো—দেখি, ভাঁড়টা দেখি। তেলের ভাঁড় ছুঁড়ে দিলেন, ভেঙে চুরমার। তেল অবিশ্যি একটু বেশি খরচা হয়েছে, আরও একটা দিন চলবার কথা। কিন্তু বিবেচনা কর, এতগুলো মাথায় মাখছে, *ভাজাটা পোড়াটা* তাতেও তেল লাগে—আঁকে-মুখের অত হিসাব চলবে কেন? বুঝবেন না কিছুতে বুড়োকর্তা, ভাঁড় ভাঙবেন। ভেঙে রাগ দেখিয়ে আবার খানিক পরে সেই মানুষই হিসাব করে তেলের দাম দেবেন, সেই সঙ্গে নতুন ভাঁড় কেনার পয়সা। এই মাসে কতগুলো ভাঁড় য গেল!

এ হল সকালবেলার কথা। আর যখন বেলা ডুবে সন্ধ্যে হয়ে যায়—

সরে আসুন, সরে আসুন, মেয়ে-বউরা গা ধুতে আসে ওই যে! হিমচাঁদ-কাকা কিছু দিন আগে বড়ছেলে অনন্তর বিয়ে দিয়েছেন। বউ বাড়িতে ভিজে-বিড়ালটি। ঘাটে এসে এখন অন্যরকম। সমবয়সি অনেক মেয়ে জুটেছে নানা সম্পর্কেব। ওর মধ্যে গৌরী তো আছেই—গৌরীর সাহসেই বউ ডানপিটে হয়ে উঠেছে। চোখ মুখ নাচিয়ে কথা বলছে বউ—কখনো গলা উঁচু, কখনো ফিসফিসানি। অবাধ্য চুলের গোছা এসে পড়ে মুখের উপর, বাঁ-হাতে তুলে দেয়, আবার এসে পড়ে। রাতের খবর জানতে চায় মেয়েগুলো—কারো এদের বিয়ে হয়েছে, কারো বা হবো-হবো, বিয়ের কথাবার্তা চলছে। গৌরীর গুরুজন দাদা-বউদির ব্যাপার—সে নিজে কিছু বলে না, হাঁ করে গিলছে সমস্ত কথা।

বলিসনে, বলিসনে—এমন বদরাগী পুরুষ! ক্ষেপে যায়। কিন্তু আমি কি করব বল দেখি। হাট থেকে ফেরা হল ওই রাত্রে। তারপরে মাছ-তরকারি কোটা-ধোওয়া রাঁধা-বাড়া। বেটাছেলে আর জনমনিষদের খাওয়ানো, এঁটোপাড়া—এত সব করে তবে তো নিজেরা দুটো মুখে দেব। বলে, অতক্ষণ ধরে কি খাও? বল না ভাই, হাত তো একটা বই দশখানা নয়—সকলে একসঙ্গে বসেছি। ঠাকুর-

পুজো কি সন্ধ্যা-আহ্নিক নয়, মুখ বুজেই বা থাকি কেমন করে? অন্ত সকলে খাচ্ছে, আমি আগেভাগে উঠে আসতে পারিনে। কোন কথা কানে নেবে না—মিছামিছি দুষবে আমায়। ঘরে ঢুকে দেখি, আলো কমিয়ে দিয়ে উল্টোমুখ করে আছে, পাশবালিশটা মাঝে দেওয়া হয়েছে। আমিও তেমনি—আর একটা পাশবালিশ তার পাশে দিয়ে একেবারে তক্তাপোশের মুড়োয় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুমও এসেছে। তারপরে অনেক রাত্রে সাড় হলে দেখি, মাঝের ডবল বালিশ সরে গেছে কখন। কই ভাই, আমি তো কাউকে সাধতে যাইনি। সেই যখন আপনা-আপনি রাগ ভাঙতে হবে, তবে মানুষ রাগ করতে যায় কেন? বল না ভাই। ঘুম এসে গেলে আমার যে একেবারে হুঁশ থাকে না—অত সহজে হত না তবে। আরও ঢের নাকানি-চুবানি খেতে হত—

খিলখিল হাসি, ফষ্টিনষ্টি। ঝপাঝপ ঝাঁপিয়ে পড়ে সব জলে। কলহাসি জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে মিলেমিশে যায়।

বড়রা আসেন কেউ কেউ। কলসি কাঁখে গিন্নিবান্নিরা আসেন। ও মা, জল ঘুলিয়ে দই-দই করেছে—কলসি ভরি কোথায়? আচ্ছা সব হয়েছে! মেয়েছেলে নয়, দস্যি এক একটা।

গোলমাল শুনে হিমচাঁদের মা নিস্তারিণী, ওই দেখুন, এসে পড়লেন।

সোমত্ত বয়স, তা বলে ভয় করে না গা? শ্যাওড়াগাছের শাকচুন্নি চুল ধরে টেনে তুলবে এক একটা কবে, ডালের সঙ্গে চুলের গোছা বেঁধে ঝুলিয়ে দেবে। হবে সেই সময়!

অনেক পায়ের দাপাদাপি জলের উপর—কানে শোনবার জো আছে! বুড়োমানুষ মিছাই চেঁচিয়ে মরছেন।

বউ পরের বাড়ির মেয়ে, দল-ছাড়া হয়ে সে-ই কেবল ঘাটের দিকে আসছে। বুড়ির নজর পড়ল: নাতবউ এর মধ্যে, ও মা আমার কি হবে! তুমিও জল দাপাচ্ছ?

গৌরী করকর করে ওঠে: তোমার মতন হাতে-পায়ে যখন বাত

ধরবে ঠাকুরমা, তখন আর জল দাপাবে না। শুয়ে শুয়ে তেল মালিশ করবে।

তা বলে ঝি-এর বেলা যা চলে, বউয়েরও তাই? পাড়ার লোকে বলবে কি! উঠে আয়, বাড়ি চলে আয় সব।

বউ প্রায় তো ঘাটে এসে পড়েছে। গৌরীর কাণ্ড দেখুন— সাঁ-সাঁ করে জল কেটে এসে বউয়ের পা ধরে দিল টান। জোর করে তাকে আবার মাঝপুকুরে নেবে। নিস্তার-বুড়িরও মাথায় বুদ্ধির প্যাঁচ খেলে: উঁ, আসতে দিবিনে? গৌরীটা হয়েছে পালের গোদা, ও-ই সব খারাপ করে দিচ্ছে। দেখ্ তবে—

মাঠে চাষ দিয়েছে, বড় বড় মাটির ঢিল। ঢিল ছুড়ছেন ঠাকুরমা, কুপ-কুপ করে জলে পড়ে। বুড়োমানুষের হাতের জোর কতটুকু, ঢিল ঘাটের উপরে পড়ছে, ওরা সবাই কত দূরে! (আসুন না, আমরা দু-জনে ঢিল এগিয়ে দিই। কিংবা আমরাই ছুড়ি খুব দূরে থেকে। বজ্জাত গৌরীটাকে জব্দ করব।)

ঢিল গিয়ে পড়ে, আর ডুব দেয় গৌরী জলের নিচে। ডুব-সাঁতার দিয়ে খানিকটা দূরে ভুস করে ভেসে ওঠে। আবার মারলেন, সঙ্গে সঙ্গে সে ডুবেছে। দিব্যি এক খেলা চলল। নিস্তার-বুড়ি টের পেয়ে রুখে ওঠেন আমাদেরই উপর: এই, ঢিল মারবিনে বলছি। ভর সন্ধ্যেয় জলের মাঝে রয়েছে। কাণ্ড ঘটাতে চাস একটা?

তুমি তো মারছ।

আমি আর তোরা? আমি দেখেশুনে মারি। আমার ঢিল কত দূরে পড়ে। তোদের মতন!

এবার বুড়ি কাতর হয়ে বলছেন, উঠে আয় গো বাছারা। ঢের হয়েছে, চলে আয়।

সহসা বড়মামীর আবির্ভাব। হিমচাঁদের বড় শ্যালকের স্ত্রী। নাকি রাজবংশের মেয়ে। কাঁচা সোনার মতন রং—চেহারা দেখে

অবিশ্বাসের কিছু নেই। গৌরীর বিয়ে সাব্যস্ত হয়েছে, সেই উপলক্ষে হিমচাঁদ-কাকা নিয়ে এসেছেন।

পুকুরপাড়ে কলরব শুনে বড়মামী এসে পড়লেন: রাত দুপুরে মাঠের-পুকুরে পড়ে কারা খলবল করছে শুনি?

ব্যস, ঠাণ্ডা। ভিজে কাপড় সপ সপ করতে করতে চক্ষের পলকে ঘাট ছেড়ে সব বাড়িমুখো দৌড়। রাশভারি মানুষ বড়মামী। দিন পনেরো এসেছেন, এরই মধ্যে যজ্ঞিবাড়ির সর্বময়ী। এরা তো পুঁচকে মেয়ে—তা-বড় তা-বড় জোয়ানপুরুষ অবধি বড়মামীর কথায় আঁতকে ওঠে। মেয়েগুলো চক্ষের পলকে ঘরে ঢুকে নিঃসাড় হয়ে গেছে। নিরীহ নিপাট ভালমানুষ সব।

(ঘর? মুশকিল হল, ঘর কোথা দেখাই আপনাকে! ভাঁট-কালকাসুন্দে-নাটা-আশশ্যাওড়ায় চতুর্দিক ছেয়ে আছে। আর পুরানো ইটের পাহাড়। ঘর নেই, ঘরের ভিটা। ভিটা দেখবেন তো লম্বা একটা ডাল ভেঙে নিন হাতে, জন্তুজানোয়ার বেরিয়ে পড়তে পারে। এই যে জামগাছ!)

বারোয়ারি কালীপূজো হত—কালীঘরের পাশের এই গাছ। গৌরীর বিয়ের পরদিন এইখানে জামতলায় পাশাপাশি পালকি দুটো রেখেছিল, যাবে বর আর বউ। বেলাবেলি রওনা হয়ে পড়বে, সমস্ত ঠিকঠাক। যাত্রামঙ্গল পড়ানো হবে, কিন্তু বউ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আচ্ছা কাণ্ড, গেল কোথায় রে হতভাগা মেয়ে?

গৌরী, ওরে গৌরীরাণী, গেলি কোনখানে তুই?

।। দশ ।।

শানাই বাজে, শুনতে পান? কান পেতে শুনুন, সুরের মধ্যে গানের কথাও ধরতে পারবেন :

আজ গৌরীর অধিবাস
কাল গৌরীর বিয়ে,
বর আসবেন মহাদেব
ধুচনি মাথায় দিয়ে।

ও-বছর হিমচাঁদ বড়ছেলে অনন্তর বিয়ে দিয়েছেন, গৌরীর বিয়ের ফুল ফুটল এবার।

বিয়ের আগের দিন। গায়ে-হলুদ দুপুরবেলা। নিকানো তকতকে পাছ-দুয়ারে চারটে কলার-বোগ। ঢোল, শানাই। পাড়ার ঝি-বউ সব এসেছে। দুপুরে কেউ আজ বাড়ি যাবে না। খাও-দাও, শোওয়া-বসা কর। মানুষ জমবে না তো বিয়েবাড়ি কিসের?

জল ঢালাঢালিতে উঠান কাদা-কাদা হল যে! সবাই আছাড় খাবে কাদার উপর। পরনের শাড়ি তেল-হলুদে মাখামাখি। গৌরী আবার নিজের গায়ের হলুদ খানিকটা নিয়ে ভাজকে মাখাচ্ছে।

ও মা, কী কাণ্ড! ও ঠাকুরঝি, আমাদের আবার কি জন্যে? আমরা তো এসব সারা করে এসেছি।

বড়মামী ধমক দিয়ে এসে পড়লেন : সবাই এই রঙ্গে মেতে থাকলে হবে? নাড়ু-কোটা আছে—সেই জোগাড়ে যাও।

সকলে নয়, আধাবয়সি ক'জন ঢেঁকিশালে চলে গেলেন। ফচকে ছুঁড়িগুলোর উপর ভরসা হয় না। হাসাহাসি করতে করতে ঢেঁকির ছেয়ায় দিল হয়তো হাত থেঁতো করে।

রীতিকর্মগুলো সকলের আগে। পাঁচটা আস্ত পান পাঁচটা গুয়া আর তেল-সিঁদুর রেখে দাও গড়ের কাছে। চাল-তিল-নারকেল এক-সঙ্গে মিশিয়ে কোট এইবারে। এয়োস্ত্রীরা পাড় দাও, বিধবা কেউ ঢেঁকিতে পা ছোঁয়াবে না। ঢ্যা-কুচ-কুচ ঢ্যা-কুচ-কুচ—ঢেঁকির মাথা উঠছে আর পড়ছে। হয়ে গেছে, হয়ে গেছে—ওলো ও রাজ্যেশ্বরের মা, আর কতক্ষণ? চটচটে কাদার মতন হল কি না হাতে তুলে দেখ। গুড় মিশিয়ে গোল গোল করে পাকিয়ে সর্ষের তেলের খোলায় ফেল এবারে। প্রথম খোলার নাড়ু হাঁড়িতে ভরে সিকেয় টাঙিয়ে রাখতে হয়। গৌরী শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরবে, এ নাড়ু নামানো হবে সেইদিন।

নাড়ু-ভাজার গন্ধ ভুরভুর করছে। ছেলেপুলে ছুটেছে নাড়ুর লোভে। নোনা-ধরা সেকেলে ইটের দালান এক দিকে, অন্য তিন পোঁতায় খড়ের ঘর। সামিয়ানা খাটিয়েছে, আকাশ ঢেকে গেছে, উঠানটাও কেমন ঘর-ঘর দেখাচ্ছে।

ছেলেপুলে এক জায়গায় হলে রক্ষে আছে! সময়ের অপব্যয় না করে কুমির-কুমির খেলছে এরই মধ্যে। দালানের রোয়াক আর ঘরের দাওয়া তিনটে যেন ডাঙা; উঠান জল। কুমির হয়েছে জন দুই। দক্ষিণের ঘরের পৈঠা আর পূবের ঘরের পৈঠা দিয়ে নামছে সব উঠানে। যেন জলে নেমে পড়ল। ভুচুত-ভুচুত, ঝাপুস ঝুপুস—মুখে চানের আওয়াজ—শব্দসাড়া করে ডুব দিচ্ছে যেন গাঙের জলে। পানকৌড়ি পানকৌড়ি ডাঙায় ওঠসে, তোমার শ্বশুর বকে গছে বেগুন কোটসে—যেমন ওরা শোলোক বলে থাকে বড়দীঘিতে চানের সময়। দু-হাত উঁচু করে সাঁতারও কাটছে—সাঁতার কেটে কেটে উঠান-নদী পারাপার হবে। অর্থাৎ এক ঘরের দাওয়া থেকে উঠবে গিয়ে আর এক দাওয়ায়। কুমিরেরা ওত পেতে আছে, ছুটেছে ধরবার জন্য। ছুঁয়ে ফেললেই মরা। যে মরে তক্ষুনি সে কুমির হল; যে মারে সে হয়ে গেল মানুষ।

ধুপধাপ ছুটোছুটি, হাসি-চিৎকার। হতে হতে ঝগড়া: দেখ না, মিথ্যে মিথ্যে আমায় মরা করেছে। ছোঁয়নি, কিছু না—

মিথ্যে মিথ্যে ? বেশ, এইবারে কি বলবি ?

উঃ, চটাস করে চাপড় কষে দিল। ও গৌরী-দিদি, তুই তো দেখছিস সব। বল্, ছুতো করে মারল না ?

পাড়ার মুরুব্বিরা এসে বসেছেন রোয়াকের উপর। মুহুর্মুহু তামাক চলছে। জরুরি কথাবার্তা। বাইরে থেকে কাল অতগুলো ভদ্রলোক বরযাত্রী হয়ে আসছে। গ্রামের সকলে কন্যাযাত্রী। কন্যাযাত্রী নিয়ে ভাবিনে। এরা নিজেদের লোক—জিনিসপত্র বাড়তি থাকলে খাবে, নয় তো বাড়ি গিয়ে খেয়ে আসবে। তা নিয়ে বাইরে কোন কথা যাবে না। ভাবনা বরযাত্রী নিয়ে। বর সামলানো সোজা, বরযাত্রী নিয়ে যত হাঙ্গামা। লাটসাহেব এক একটি। দুটো দিনের লাটসাহেব—পান থেকে চুনটুকু খসেছে তো রক্ষে নেই। কন্যাপক্ষকে জব্দ করতেই যেন আসা—যতক্ষণ আছেন, ছুতো শুঁকে শুঁকে বেড়াবেন। শীতকালের দিন—লেপ চাই সকলের একটা করে। বালিশ তো চাই-ই, পাশবালিশেরও বায়না তুলবেন কেউ কেউ। কার বাড়ি কি বিছানা আছে, ফর্দ করে ফেল দিকি। প্রফুল্ল বরঞ্চ কাগজ-পেন্সিল হাতে করে এ-পাড়ার বাড়িগুলো একবার ঘুরে এসো। কোন বাড়ি ক'জনে গিয়ে শুতে পারবে। গ্রামের মানুষ কাল বিনা লেপে বিনা বালিশে শোবে। খাটাখাটনিতে রাত কেটে যাবে, শোবেই বা কোন সময় ?

এর মধ্যে বিপ্রদাস বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন: ছ্যামড়া-ছেমড়িগুলো যেন গলায় বাঁশ দিয়ে চেঁচাচ্ছে। ভেবেচিন্তে ঠাণ্ডা মাথায় কিছু করবার জো আছে! এই হতভাগারা, গিয়ে পড়ি তো ঠ্যাং ধরে এক-একটাকে গোলার পিলপেয় আছড়াব। এই বলে রাখলাম।

তারকেশ্বর বলেন, ছেলেপুলে উঠোনে খেলা করছে, তাতে আমাদের কি ? বিয়েবাড়ি এসে মুখ বুঁজে থাকতে বললে শুনবে কেন ? তিনটে দিন তো মোটে—আজ কাল আর পরশু। তরশু দিন থেকে যে যার

ঘরের দাওরায় পা ছড়িয়ে বসে কোষ্ঠা কাটছি। হ্যাঁ, যে কথা হচ্ছিল। বরযাত্রীর মধ্যে কুলীন মৌলিক থাকবে, সে এক বিচারের কথা বটে।

বিপ্রদাস বলেন, কুলীন কতজন আসবেন, তার হিসাব চেয়ে পাঠিয়েছে? হিমচাঁদ গেল কোথায়? কুলীন বিদায়ের একটা ব্যাপার আছে, খেয়াল রাখতে হবে।

প্রফুল্লর বয়স যা-ই হোক, চালচলন ও কথাবার্তায় পরম আধুনিক। তিনি বলেন, ও-সমস্ত সেকালে হত সেজকাকা। আজকাল উঠে গেছে। শহরের হোটেলে ছত্রিশ জাতে এক হুঁকো টানছে, একসঙ্গে পংক্তি-ভোজন করছে। জাতই রইল না, তা জাতের ভিতরের কুলীন আর মৌলিক!

বিপ্রদাস চটে বললেন, শহুরে কাণ্ডকারখানা ছেড়ে দাও বাপু। গাঁয়ের মধ্যে সমস্ত আছে। গাঁয়েব সমাজ যতক্ষণ আছে, রীতিনিয়ম মানতে হবে. এক কথায় কেটে দেওয়া যাবে না।

হিমচাঁদ-কাকা বাটায় করে পানের খিলি এনে রাখলেন। বিপ্রদাস বলেন, তোমায় খুঁজছিলাম হিমচাঁদ। বিবেচনা কর, আমরা হলাম মৌলিক। বেশি হোক কম হোক মর্যাদা না দিলে কোন কুলীন আমাদের বাড়ি পাত পাড়বে না। প্রফুল্ল বলছে, দরকার নেই। তাই যদি ভেবে থাক, যজ্ঞি পণ্ড হবে কিন্তু।

হিমচাঁদ সভয়ে বলেন, না প্রফুল্ল, বিপ্পুর-দা'র কথাই ঠিক। হাত-পা ধরে মর্যাদার মাপ চাইতে পারি, কিন্তু চেপে থাকলে খাপাপ হবে।

দরদালানের ভিতর থেকে নিস্তারিণীর চিঁ-চিঁ গলার আওয়াজ আসছে: হিমে, তুই শুতে যা।

বিপ্রদাস বলেন, শোন খুড়িমার কথা। কালকে কন্যাদান, বাড়ির উপর এত বড় সমারোহ—ছেলেকে উনি শুয়ে পড়তে বলছেন।

হিমচাঁদ-কাকা লজ্জিত হয়ে বলেন, ছেড়ে দাও বুড়োমানুষের কথা। বুড়ো হলে বাহাত্তুরে হয়। তা হলে বিপ্পুরদা, কুলীন বরযাত্রীর একটা ফর্দ চেয়ে পাঠানো উচিত—

বুড়ি আবার বলেন, রাত হয়েছে। অনেক রাত হয়ে গেছে, শুয়ে পড় তুই হিমে। কাসছিলি তখন—বউমাকে ডেকে নিয়ে যা, পায়ের তলায় গরম তেল মালিশ করে দেবে।

হিমচাঁদ তাড়া দিয়ে ওঠেন: কাজে ভণ্ডুল দিও না মা। চুপ করে থাক।

(আপনাদের শহরের বিয়ে কত সংক্ষিপ্ত। বিয়ের দিনই হয়তো সকালবেলা কন্যাকর্তার অফিসের ভাত রান্না হচ্ছে। সন্ধ্যার পর বর-বরযাত্রীরা মোটরে চড়ে এল, কিছু মেয়েপুরুষ জমল। পরের দিন বরকনে বিদা' হবার সঙ্গে সঙ্গে বিয়েবাড়ি সাফসাফাই একেবারে।)

আমাদের গাঁ থেকে আদিত্য নারায়ণের বউ সুশীলাকে আহ্বান করে নিয়ে এসেছে। ঘোড়সওয়ার নামে যে আদিত্য নারায়ণের পরিচয়। ভারি কাজের মানুষ সুশীলা-বউ—হাতপা-ঝাড়া মানুষও বটে। এক ছেলে রাজ্যেশ্বর—বউ তাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। নাড়ু ঝাঁঝরি দিয়ে তুলে তুলে বারকোষে রাখছে। খেলা ভেঙে ছেলেমেয়েরা নাড়ুর জায়গায় ভিড় করল।

বড়মামী বাঘের মতন গিয়ে পড়লেন: এতখানি বয়স, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান কই তোমার রাজ্যেশ্বরের মা? আব্যুতিকের ষষ্ঠীপূজোয় নাড়ু লাগবে—মা-ষষ্ঠীর নামে তুলে রাখ আগে। দ্বিরাগমনের জন্যে রাখ। রীতকর্ম না সেরে আগ ভেঙে ছেলেপুলের হাতে দিচ্ছ কোন বিবেচনায়?

কী বিপদ, এত করতে করতে কলি তো কাবার হয়ে যাবে। কে থাকে কে যায়, দেখ, ওই রাত্রি অবধি! তাড়া খেয়ে ছেলেপুলে আবার উঠানে সামিয়ানার তলে গেল।

গৌরী উত্তরের-ঘরের কবাট ধরে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে।

এসো না গৌরী-দি। পুণ্টুলকে কেউ কুমির করতে পারে না, তুমি এসো দিকি। গাছকোমর বেঁধে নেমে পড়। তোমার সঙ্গে পুণ্টুল ছুটে পারবে না।

লোভী দৃষ্টিতে তাকায় গৌরী। কিন্তু বিয়ের কনে সে—লোকে কি বলবে! আর বড়মামী ওই চোখ-কটমট করে সকল দিকে নজর হেনে বেড়াচ্ছেন। খেলাধুলোর পাট চুকে গেল এবার থেকে—কী বাপের বাড়ি, কী শ্বশুরবাড়ি!

গৌরী ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়। চোখে দেখে মন খারাপ করা শুধু।

উত্তরের-ঘরের পৈঠায় দাঁড়িয়ে বড়মামী বলছেন, ঠাকুরমশায় আছেন এখানে?

দাবা খেলছে দু-জনে—ও হরি! একজন তার মধ্যে অনন্ত, হিমচাঁদের বড়ছেলে, গৌরীর বড়দাদা। অপরটি হলেন আমাদেরই গাঁয়ের সীতেশ্বর—দাবা খেলেন, আর দেহচর্চা করেন। মারামারিতে তাঁর জুড়ি নেই। বিদেশি বরযাত্রীদের সঙ্গে খেলে যুঝবেন, সেজন্য তড়পে বেড়াচ্ছেন বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়ে যাবার পর থেকে। যাঁকে পান, টেনেহিঁচড়ে খেলায় বসিয়ে অভ্যাস পাকা করে নিচ্ছেন। সীতেশ্বরের হাত এড়ানো অসম্ভব।

নিঃশব্দে খেলা চলছে। হেরিকেন জ্বলছে পাশে—আলো চোখে না লাগে, সেজন্য কাচের গায়ে পুরানো পোস্টকার্ড গোঁজা। অল্প আলোয় বড়মামী আগে ঠাহর করতে পারেননি। তা ছাড়া ভাবতেও পারা যায় না, রাত পোহালে যে বাড়িতে তোলপাড় লেগে যাবে, পাড়ার লোক এসে পড়ে কাজকর্ম করে দিচ্ছে—নিশ্চিন্ত দাবায় বসেছে সেই বাড়ির বড়ছেলে।

রাগ করবেন কি, বড়মামী হতভম্ব হয়ে গালে হাত দিয়ে রইলেন ক্ষণকাল। বলেন, বলিহারি আক্কেল তোমার অনন্ত!

অনন্ত এখন ঘোরতর বিপদের মধ্যে। প্রতিপক্ষের ব্যূহের ভিতর তার মন্ত্রী ঢুকে পড়েছে। সরানো যাচ্ছে না, আবার রেখে দিলেও দু-চাল পরে মারা পড়ে যায়। এরই মধ্যে বড়মামী এসে মাথা খারাপ করে দিচ্ছেন।

অনন্ত বলে, কোন কাজটা ফেলে এসেছি বলো। গোয়ালে লুচি-ভাজার উনুন খুঁড়ে উনুনের পাশে কাঠকুটো গাদা করে রেখে একটুখানি এসে বসেছি। আবার এক্ষুনি জেলে নিয়ে মাছ ধরতে ছুটব। এক-হাত একটু জিরিয়ে নিচ্ছি, অমনি সকলের চোখ-টাটানি!

বড়মামী আগুন হলেন: সারা রাত্তির ধরে জিরোও না বাপু। কে বলতে যাচ্ছে? জেলের সঙ্গে না যেতে চাও, তা-ও বল।

আমায় দেখিয়ে বলেন, কলকাতা থেকে ছেলেটা এই মাত্তোর এসে গেল। কাজ-কাজ করে বেড়াচ্ছে—বলি তো সোনা হেন মুখ করে জেলেদের সঙ্গে যাবে। কি রে, যাবিনে? কাজ আটকে থাকবে না। আমি তোমাদের কাছে আসিনি বাপু—ঠাকুরমশায় কোন দিকে গেলেন, তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

সীতেশ্বর মুখ তুলে জবাব দেন: না, কই—আমরা তো আছি সন্ধ্যে থেকে, ঠাকুরমশায় থাকলে কি আর দেখতে পেতাম না!

দাওয়ায় কোণে তক্তাপোশ পাতা, কাচনির বেড়ায় ঘেরা জায়গাটা। গায়ের কম্বল সরিয়ে ফেলে পুরুতঠাকুর তড়াক করে তক্তাপোশের উপরে উঠে বসলেন: নেই কি রকম! রয়েছি আমি মামীঠাকরুন। এই যে, এখানে। আচ্ছা মানুষ সব! সামনের উপর দিয়ে উঠে এলাম—জলজ্যান্ত মানুষটাকে নেই বলে উড়িয়ে দিচ্ছে।

সীতেশ্বর বলেন, দেখিনি তো আপনাকে—

দেখনি, তা জানি। দাঁড়িয়ে রইলাম তোমাদের খেলার পাশে। তা কথাবার্তা না-ই বলো, পায়ের ধুলোটা অবধি নিলে না। তখনই জানি—চোখ মেলা বটে, দেখতে পাচ্ছ না কিছুই। কাল বিস্তর ঝামেলা—লগ্ন রাত দেড়টার পরে। কালকে ঘুমের দফা গয়া। সেইজন্যে ভাবলাম, সেই ঘুমটা আজ সারা করে রাখি।

বড়মামী বলেন, উনুন ধরানো হয়েছে ঠাকুরমশায়। এইবারে এসে চাট্টি মুগের ডাল চাপিয়ে দেন।

পুরুতঠাকুর হাই তুলে বলেন, কড়াইটা ভাল করে ধুয়ে আপনি

চাপিয়ে দিন মামীঠাকরুন। ওতে দোষ নেই। ঘোঁটাঘুঁটি করতে যাবেন না। আর করলেই বা কি! নুন না পড়া পর্যন্ত এঁটো হয় না।

আবার হাই তুলে পুরুতঠাকুর মুখের সামনে তিন বার তুড়ি দিলেন।

'এতক্ষণে অনন্ত পুরুতের মুখোমুখি চেয়ে বলে, মুগ কেন, মটরের ডাল চাপিয়ে দাওগে বড়মামী। আসিদ্ধ মটর অনেকক্ষণ ধরে হবে। ঠাকুরমশায় ততক্ষণে আর একঘুম ঘুমিয়ে নিতে পারবেন।

পুরুতঠাকুর কিন্তু উঠে পড়েছেন। অনন্ত দেখেছে এবার, রঙ্গরসিকতাও করল—খড়ম খটখট করে পুরুত কাছে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। পায়ের বুড়োআঙুল ইঞ্চিটাক উঁচু করে তুলেছেন খড়মের উপরে। ধুলো না থাকলেও আঙুলের নিচে হাত ছুঁইয়ে মাথায় ঠেকানোর বিধি। কিন্তু কোথায়! ঘাড় নিচু করে মাথায় প্রায় মাথা ঠেকিয়ে অনন্ত ও সীতেশ্বর যথাপূর্ব দাবায় মজে আছেন।

উঠানে নামবার জন্য পুরুত পৈঠায় পা দিয়েছেন, সীতেশ্বর অমনি হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন: চলে যাচ্ছেন—বাঃ রে, প্রণাম করা হবে না? দাঁড়ান। এই কিস্তি।

নৌকোটা দু-ঘর সরিয়ে দিয়ে অনন্ত বলে, যাবেন না ঠাকুরমশায়। এই সুস্থি—হল তো? মাত করা আজকের রাত্রে হবে না।

দেখা যাক, আজ রাতে হয় কি ক'টা রাত্রি লাগে।

পুরুতঠাকুর রাগ করে উঠলেন: আমি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকব, আর সারা রাত তোমরা কিস্তি-সুস্থি চালাবে?

সীতেশ্বর মুখ বাঁকিয়ে বলেন, দুটো মিনিট দাঁড়িয়ে তালুকমুলুক নিলামে উঠে যাচ্ছে নাকি? বলছি প্রণাম করব, তা যেন ঘোড়ায় জিন চড়িয়ে আছেন। বলি, মাংনা কাজ করছেন—চালে-কাপড়ে নগদে-দক্ষিণেয় ভরা সাজিয়ে নিয়ে যাবেন না?

দাবার দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি রেখে ঘাড় বেঁকিয়ে দুজনেই যুগপৎ পদধূলি নেবার পর পুরুতঠাকুরের অব্যাহতি হল।

(ঝুনঝুন ঝুনঝুন করে মল-পরা বিয়ের কনেই যেন ঝোপের মধ্যে ছুটে পালায়। মলের আওয়াজ স্পষ্ট পাওয়া গেল। ভয় পাবেন না—গৌরী বেঁচেবর্তে আছে, এই সেবারও খবর নিয়ে গেছি। পালিয়ে গেল অন্ধকারের প্রেতিনী নয়, সজারু। আমাদের দেখে ছুটেছে)।

গোয়ালা-ঘোষ বড়মামীর পিছু পিছু ভিতরবাড়ি ছুটেছে। রোয়াকের নিচে থেকে ডাকে : মামীঠাকরুন কোথায় গেলে আবার? এই যে, কর্তাবাবুই এখানে। মাত্নর আর কম্বল চাই হুটো হুটো করে .

বিপ্রদাস ব্যঙ্গ করে বলেন, ও আমার লাটসাহেব গো! শুধু মাত্নরে হচ্ছে না, তার উপরে কম্বল পাতা হবে। আর লেপ-তোষকের কথা বলছ না যে ঘোষমশায়?

ঘোষ বলে, আমার শোবার জন্যে নয়, দই ঢাকবার বিছানা। ঢাকা দিয়ে দই জমাব।

হিমচাঁদ বিরক্ত হয়ে বলেন, দই আর জমেছে তোমার! ভোজের সময় কাল একখানা কেলেঙ্কারি ঘটাবে। হুধ সম্পূর্ণ জোগাড় করতে পারে নি—তাই করল কি বিপ্ল্‌র-দা, জল ঢেলে ঢেলে হুধের পূরণ দিল। অত জলে দই কক্ষনো জমবে না। ঘোল খাওয়াবে কুটুম্বদের।

ঘোষমশায় জাঁক করে বলছে, জমে কিনা কালকে দেখে নিও মশায়রা। সভার মধ্যে দাঁড়িয়ে হাঁড়ি উপুড় করে দই কেটে কেটে দেব। নন্দ ঘোষের দই কেউ তো আজ অবধি নিন্দে করতে পারল না। এ তবু বিস্তর হুধ হয়েছে—শুধু-জল জমিয়ে দিতে পারি। পুকুরসুদ্ধ জমানো যায়, তেমন-তেমন বিছানার সরবরাহ দিতে পার যদি। ও মামীঠাকরুন, কম্বল হুখানা নয়, চারটেই দাও তবে। বাবুদের কাল দেখিয়ে দেব, কাকে বলে দই।

ওদিকে নিস্তার-বুড়ি কাতরাচ্ছেন : ওরে হিমে, শুতে যা। কিছু ভাবতে হবে না তোর। পাড়ার বাবাসকল যখন এসে পড়েছে, ওরাই

সমস্ত করে দিয়ে যাবে। বউমাকে নিয়ে যা—পায়ে তোর মালিশ করে দেবে।

হিমচাঁদ বলেন, জ্বালাতন, জ্বালাতন! মা তুমি চুপ করবে কি না বল। আর নয়তো উত্তরের-ঘরে গিয়ে আমরা কাজ করিগে।

॥ তেরো ॥

ঢোল-কাঁসি বাজে, শানাই বাজে। বিয়ের দিন আজ। ভাল করে সকাল না হতেই বাজনদারে তোলপাড় লাগিয়েছে। মানুষ বাড়িতে এমনিই কিলবিল করছে। তার উপর আজ একেবারে বন্যার জলের মতো মানুষ আসতে লেগেছে।

হরি-দা এলেন। লম্বা লিকলিকে, পাকা-চুল পাকা-গোঁফ—দেহের মধ্যে পেটটাই নজরে পড়ে সকলের আগে। এই হলেন হরি-দা। পেটই যেন আসল বস্তু—পেট চলে ফিরে বেড়াবে বলেই যেন পেটের নিচে একজোড়া পা এবং পেটের উপরিভাগে সুপারি প্রমাণ একটি মাথা ও চোখ-কান। যে বাড়ি ভোজ, হরি-দা সেখানে। নিমন্ত্রণ লাগে না। হরি-দা ভোজ ধরতে যাচ্ছেন, সেই সময়ের হাঁটা যদি দেখেন! কোলকুঁজো মানুষটা খাড়া সরলরেখা হয়ে গেছেন—সাঁ-সাঁ করে ছুটছেন বাতাসের বেগে। সামাজিক আসরে বসে সমারোহে ভোজ তো খাবেনই—আবার ভোজের আগে আগ-ভোজ, ভোজের পিছে বাসি-ভোজ রয়েছে। ক্রিয়াকর্মের বাড়ি মিষ্টি-মিঠাইয়ের ভিয়ান হয়ে গেছে, মাছ জালে ধরে গাদা করছে এনে উঠানে, গোয়ালা হয়তো খান দুই দইয়ের হাঁড়ি এনে দিল গরখ করে দেখবার জন্য। দু-চারটে মিষ্টি, দু-চার দাগা ভাজা-মাছ, দু-এক হাতা দই সহযোগে অতিথি-কুটুম্বর সাধারণ খাওয়াটাও পরম উপাদেয় হয়ে ওঠে। এই হল আগ-ভোজ। আর ভোজের ব্যাপার চুকেবুকে

যাওয়ার পর জিনিষ নিশ্চয় বেশি হবে—বাসি-ভোজে সেইগুলো পাতে এসে পড়বে। খাইয়ে-মানুষ যিনি, চেটেমুছে যাবতীয় আয়োজন শেষ করে তবে তিনি কাজের বাড়ি থেকে নড়বেন।

তল্লাটের সকল লোকে চেনে হরি-দা'কে। হরি-দা ছুটেছেন তো ছেলেপুলে খেলা ছেড়ে রাস্তায় এসে জুটল হরি-দা'র আশেপাশে। জোয়ান-যুবারাও পিছু নিয়েছে। চাষীরাও, এমন কি, গোনের মুখে লাঙল ছেড়ে দৌড়ে এল মজা দেখবার জন্য।

হাত-পা শলা শলা
পেটটা ঢাকাই জালা—

অতদূর বলতে হবে না। শুধুমাত্র 'হাত-পা' কথাটুকু বেরিয়েছে কি না বেরিয়েছে—হরি-দা লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে এসে পড়বেন সকলের মধ্যে। সামনে যে পিঠখানা, তার উপরে বাড়িও পড়ল দু-একটা। কিন্তু মার খেয়ে রাগ করে না কেউ, সরে গিয়ে আবার ছড়া কাটে। হরি-দা'ও ছাড়বেন না, ছুটবেন সেদিকে। ইতিহাস আছে নাকি পিছনে। এক বয়সে হরি দা'র বিয়ে করার ঝোঁক হয়েছিল। কিন্তু বরের আকৃতি দেখে কন্যা ঘরে দুয়োর দিল। 'হাত-পা শলা শলা'—বর্ণনাটা নাকি সেই কন্যার মুখের। সেই জন্যে হরি-দা'র এত রাগ।

আরও একটু বেলায় মুজগন্নি গ্রাম থেকে গৌরীর বড়বোন উমা এসে পড়ল। শাশুড়ির অসুখ বলে আগে পাঠায় নি—বউ গেলে সংসার দেখে কে? আজকেও একরকম জোর করে এসেছে: সংসার আছে বলে কি বোনটার বিয়ে দেখব না?

পালকি নামাল কালীঘরের পাশের জামতলায়। উঠানে আলপনা দিচ্ছিল, আই গড়াচ্ছিল—বউ-মেয়ের দঙ্গল ছুটল সেদিকে। উমা পালকি থেকে বেরিয়ে এসে ফিচ করে পানের পিক কাটল। পালকির মধ্যে এই বড় ডাবর ভরতি পান, কাটা-সুপারি, চুন-খয়ের—সারা পথ পান সেজে খেতে খেতে এসেছে। উমা নেমেছে তো তার পরে তার ছাবাচ্ছাগুলো নামছে। নামছে তো নামছেই। অফুরন্ত।

গণলে পাঁচ ছ'টা তো হবেই। মাদারকাঠের এইটুকু এক পালকি—অতগুলো ঢুকিয়েছিল কেমন করে ভিতরে ?

রমজান কাহার বলে, তাই বোঝেন দিদিসকল। কাঁধের এক পর্দা ছাল উঠে গেছে। পালকির ডাঁটি ভাঙেনি সর্বরক্ষে—আমাদের গতরের উপর দিয়ে গেছে। একঘটি পানি যদি দিতেন দিদিঠাকরুন।

শীতকালেও গা-ময় ঘাম, গামছা নেড়ে নেড়ে তারা বাতাস খাচ্ছে। কিন্তু শতেক কাজকর্মের বিয়েবাড়ি—রমজানের কথা কে কানে নেয়! আইবুড়ভাতের জিনিষপত্র বেরোল পালকি থেকে। অনন্তর বউ তুলেপেড়ে রাখছে। বলে, আরও বিস্তর জায়গা থেকে আসছে। সমস্ত এক জায়গায় রেখে দিই, মানষে একসঙ্গে দেখবে। কি বল দিদি ?

কাপড়-সেমিজ সাবান-তরলআলতা ছাড়া আরও আছে। উমা ডাকছেঃ ও গৌরী, ইদিকে আয় তো একবার। পার্শি-মাকড়ি গড়িয়ে আনলাম কেশবপুর থেকে—প্যাটার্নটা নতুন উঠেছে। ফুল দুটো খুলে ফেলে পরে দেখ কেমন মানায়। বিয়ের কনের কানে একরত্তি ফুল মানাবে কেন, খুলে ফেল্।

গৌরী কান খালি করে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু মাকড়ি হাতে হাতে ঘুরছে সকলের।

বাঃ, খাঁসা জিনিষ, চমৎকার! গয়না হাতের তেলোয় রেখে হাত নেড়ে ওজনের আন্দাজ নেয়। চোখ ঠেরে ফিসফিসিয়ে বলাবলি হচ্ছেঃ কত আর—আধ ভরিও হবে না। ফঙ্গবেনে জিনিষ। পয়সাকড়ি থাকলে কি হবে, উমার বর কঞ্জুষ বড্ড। ওরা কি আর বেশি খরচা করবার মানুষ!

বড়মামী ভিয়েনের কড়াই থেকে একবাটি পান্তুয়া এনে উমার ছেলেমেয়েদের একটা একটা করে দিচ্ছেন।

রমজান বলে, অ ঠাকরুন, পানির পিয়াস লেগেছে বড্ড—

র বাপু। ঘরের বাছারা তেতে-পুড়ে এল, এরা এখনো ঠাণ্ডা হতে

পারল না। তোদের বায়নাক্কা কে কুলোয়? অমন পুকুরঘাট রয়েছে—যত ইচ্ছে খেয়ে আয়।

পাড়াময় আইবুড়ভাত দেবে। (আজ একটা মানুষ দেখছেন না, অমন বিশঘর গৃহস্থ তখন এই পাড়ায়।) আইবুড়ভাত উপলক্ষ করে সবাই চাট্টি ভাত খাইয়ে দিতে চায়। আহা, গাঁয়ের মেয়েটা পরঘরি হয়ে যাচ্ছে! নতুন শাড়ি পরিয়ে গৌরীরাণীকে বসে খাওয়াবে। কিন্তু মুশকিল, গায়ে-হলুদ হয়েছে সবেমাত্র কাল। গায়ে-হলুদের আগে আইবুড়ভাত চলে না। আর বিয়ের দিন আজকে তো কনের উপোস। তাহলে মাত্র একটি বেলা পাওয়া গেল কনেকে ভাত খাওয়াবার। কার বাড়ি খাবে, আর কার বাড়ি খাবে না—মন-কষাকষির সৃষ্টি হবে নিরর্থক। বড়মামী তাই বললেন, কোথাও খাবে না। ও-বেলা গৃহস্থের সংসারে খেয়েছে, এ-বেলা আমার নেমন্তন্ন। আমি তো আর এদের সংসারের নই।

পাড়ার সকলে কনে ডেকে নিয়ে খাবার খাইয়ে আইবুড়ভাত দিচ্ছে। উপায় কি তা ছাড়া?

গৌরী কী যেন হয়ে গেছে হঠাৎ। একদণ্ড বাড়ি বসতে দেয় না—এক বাড়ি থেকে সেরে এল তো অন্য বাড়ির ডাক: চলে এসো গৌরী, তোমার জেঠাইমা বসে আছে সেই কখন থেকে, দেরি কোরো না। গৌরী ভাই, এক বাড়িতে অতক্ষণ কাটালে চলে আজকের দিনে—অন্য সকলের তবে কি হবে? এটা খাও, ওটা খাও—বলে পীড়াপীড়ি: ও মা, এর মধ্যে হয়ে গেল! অত রাত অবধি বসে বসে গোপালভোগ তৈরি করলাম কার জন্যে? একটুখানি মুখে দিতেই হবে।

গৌরী কাতর হয়ে বলে, তিন বাড়ি খেয়ে এলাম যে বউদি, আর পারব না। পেটে জায়গা নেই। এমনি হয়েছে, খাবার মুখের কাছে আনলে পেটের মধ্যে ঘুলিয়ে আসে।

ঠিক ছুপুরে রোদে পুড়ে এক-পা ধুলো নিয়ে ঘটক এসে হাজির।

খবর ভাল ঘটকমশায় ?

ভাল ছাড়া মন্দ কেন হতে যাবে? হরিবাড়ির ঘাটে নৌকো বেঁধে বরযাত্রীরা সব হরিবাড়ি খাওয়াদাওয়া করবে। ঘোর হয়ে গেলে বাজি-বাজনা করে বিয়েবাড়ি আসবে। সমস্ত ঠিক হয়ে আছে। কিন্তু বরযাত্রী বোধহয় কিছু বেশি হয়ে গেল। আর ব্রাহ্মণ আছেন দশজন—সাতজন তার মধ্যে সাত্ত্বিক, লুচি চলবে না। তাঁদের জন্য ছানা-চিনি।

তাতে অসুবিধা হবে না। খবরটা আগে দিয়ে ভাল করলেন ঘটকমশায়। আপনিও তো তেতে-পুড়ে এলেন, স্নান-আহ্নিক হোক এখানে।

ঘটক ঘাড় নাড়ে: উঁহু, একলা আমি খেয়ে যাব, সেটা ভাল দেখায় না। হরিবাড়ি সকলের জন্য খিচুড়ি রান্না হচ্ছে।

দূর মশায়! পথে-ঘাটে খিচুড়ি হয় নাকি? চালে-ডালে ঘুঁটছে, তাই বলুন। একটু জলটল খেয়ে যান, ওখানে গিয়েও খাবেন না হয় ছু-এক গ্রাস।

ঢেঁকিশালের ঢেঁকি তুলে ফেলে মস্ত মস্ত দুই উনুন খুঁড়ে লুচি ভাজা হচ্ছে সেই সকাল থেকে। ধান-রাখা বড় বড় ডোল এনে সাজিয়েছে, লুচি ভেজে ভর্তি করছে। ভোজের খাওয়া রাতদুপুরে,—হয়তো বা শেষরাত্রে। সময় ঠিক করে বলা ছুরূহ—রাত পোহাবার আগে সমাধা হয়ে যাবে, এই পর্যন্ত বলা যায়। এত আগে থেকেই লুচি ভাজছে। খোলা থেকে গরম গরম ভেজে তুলে পাতের উপর দেবে, আমাদের গাঁ-অঞ্চলে এত সব বায়নাক্কা নেই। সম্ভবও নয়। সিকিখানা ফুলকো-লুচি ভেঙে মুখে দিয়ে ঢেকুর তুলে এক গেলাস জল খেয়ে ভোজের ইতি করবে, স্টেশনের লোকটা গল্প করছিল—মনে আছে? গেঁয়ো মানুষ আমাদের তেমন ধাতের পাবেন না। পদ্ম-পাতার সাইজের ইয়া ইয়া লুচি ছু-কুড়ি আড়াই-কুড়ি অবধি টানবে এক এক জনে—কুড়ি হিসাবে গণতি।

চতুর্দিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘটক আয়োজন দেখে নিচ্ছে। মাছের কালিয়া দু-কড়াই নেমে গেল। আর কুমড়ার ছক্কা এক কড়াই। কড়াইয়ের দু-আংটার ভিতরে হুড়কোর বাঁশ ঢুকিয়ে চার জনে বয়ে এনে লুচির ডোলের পাশে রাখল। কুকুর কয়েকটা ছোঁক-ছোঁক করে এসেছে—চেলা-কাঠ ছুঁড়ে মারতে কেঁউ-কেঁউ করে পালাল। বেশ একটা গমগমে ভাব চারিদিকে।

দেখেশুনে পুলকিত কণ্ঠে ঘটক বলে, করেছেন কি, রাজসূয় আয়োজন যে হালদারমশায়। জল খেতে বলছেন—বড্ড ব্যস্ত এখন, পাতায় করে তা গতাড়ি চারখানা লুচি আর একটু তরকারি দিয়ে দেন।

মাছ দেব না?

দেন খান চারেক—

সন্দেশ?

দেন চারটে—

লেডিকেনিও আছে।

ঘটক চটে গিয়ে বলে, দেন না মশায় যা দেবার। অতশত জেরা কিসের?

গৌরী ফিরল কোন বাড়ি থেকে আইবুড়ভাত সেরে। তিন-চারটে সমবয়সি মেয়ে আশেপাশে। অনন্তর বউকে ফিসফিস করে বলে, ও বউদি, শোন—পেয়ারাতলায় তোমাদের কুটুম্ব।

বুঝতে না পেরে বউ বলে, কোথাকার কুটুম্ব? কে?

বড়ভাই।

কার বড়ভাই?

গৌরী হেসে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল: যাও, আমি জানিনে। সেই যে দেখতে এসেছিল আমায়। হাঁটিয়ে চুল খুলে পায়ের নিচে ঝাঁটার কাঠি দিয়ে দেখে গেল।

এবারে বুঝল বউ। অনন্তকে ঘরের ভিতর ডাকিয়ে এনে বলল কথাটা।

ঘটক জলযোগে বসে গেছে। লুচির কাঁড়ি পাতে ধরছে না। অনন্ত বলে, কুটুম্বকে পেয়ারাতলায় দাঁড় করিয়ে এসেছেন কেন ?

অনিলবাবু? হ্যাঁ, আছেন বটে দাঁড়িয়ে। ভুলে গিয়েছিলাম একেবারে। আপনারা ছাড়েন না—এই আবার খেতে বসতে হল।

তাঁকে সঙ্গে করে বাড়িতে আনেননি কেন ?

আসতে চাইলেন না কিছুতে। দিনের আলো থাকতে নাকি কনের বাড়ি আসে না। বাঁক ঘুরে ঘুরে নৌকো যাচ্ছে—অনিলবাবুই বললেন, খেয়া পার হয়ে পায়ে হেঁটে আমরা হরিসভার বাড়ি গিয়ে উঠি। ভারি দু-ক্রোশ পথ—খিচুড়ি খেয়ে আমাদের দিব্যি একখানা ঘুম হয়ে যাবে, ওরা তখন ঢিকঢিক করে পৌঁছবে। পাড়ার মধ্যে এসে বললেন, কাছাকাছি এসেছি যখন, ছানার কথাটা বলে যাও। নয় তো ভদ্রলোকেরা মুশকিলে পড়তে পারেন।

ঘটক সেই যে বিয়েবাড়ি গিয়ে ঢুকেছে, অনিল একলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা করে ফেলল। একটা ফুলো-পেয়ারা ছিঁড়ে নিয়ে চিবোচ্ছে।

অনন্ত গিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল: এখানে কি করেন অনিলবাবু, বাড়ি আসুন।

এখন ?

বর দিনমানে যায় না, বরের ভাই কেন যাবেন না ?

আসুন—বলে হাত চেপে ধরেছে। ষণ্ডামানুষ অনন্ত—আঙুল যেন চামড়া-মাংসের নয়, লোহার। অনিলের হাত মটমট করে উঠল। গোটা মানুষটা যায় ভালই, নয় তো কুমিরের কামড়ের মতন এই ধরা-হাতখানা ছিঁড়ে নিয়েই বুঝি চলে যাবে।

অনিল বলে, পুকুরঘাট কোন দিকে ?

ঘাটের কি দরকার হল ?

বলেই অনন্তর নজর পড়ল অনিলের পিঠের দিকে। দু-পাটি

জুতোর ফিতে একত্র করে বেঁধে ছাতির মাথায় জুতো ঝুলিয়ে নিয়ে চলেছে।

অনন্ত বলে, পা ধুয়ে জুতো পরবেন বুঝি? খেয়া পার হয়ে দু-ক্রোশ পথ খালি-পায়ে আসতে পারলেন তো এইটুকুর জন্য হাঙ্গামা করতে হবে না। চলুন।

যে ভাবে হাত ধরেছে, তার পরে 'না' বলতে অনিলের সাহসে কুলায় না। কৈফিয়ৎ দিতে দিতে চলেছে: খালি-পায়ে না এসে কি করব? যা ধূলো আপনাদের ইদিকে! বুরুষ মেরে মেরে চকচকে-করা জুতো— পায়ে পরে হাঁটলে এ জুতোর বর্ণ খুঁজে পাওয়া যেত না মশায়। আমারই বা কী হয়েছে দেখুন না—কালোকোলো মানুষটা ধূলোয় ধূলোয় রীতিমতো গৌরবরণ হয়ে দাঁড়িয়েছি।

ঘটকের পাশে আরও একটা ঠাঁই হল—এবারে কলার পাতা নয়, কাঁসার থালা। চারিপাশে গোল করে সাজানো বাটি। অনন্ত অনুরোধ করছে, কিন্তু শোনায় হুঙ্কার দেওয়ার মতো: বসে পড়ুন—

তারপর ঢেঁকিশালের দিকে চেয়ে বলে, পরিবেশন কে করছে? কুটুম্বর এই প্রথম পাত পড়ল, দেওয়ার শ্রী দেখ তো! কুটুম্বকে যেন অম্বলের রুগি ভেবে নিয়েছে। পোনামাছের বড় গামলাটা নিয়ে এসো।

থালার উপরে হাত ঢাকা দিয়ে অনিল বলে, উহু, অনেক দিয়েছে, আর পারব না।

অনন্ত দৃকপাত না করে বলে, বেছে বেছে আটখানা দাগা দাও। লাগে তো আবার পরে দেবে। চিংড়িমাছ নেমে গেছে তো? নিয়ে এসো সেটা।

অনিল আর্তনাদের মতো বলে, মরে যাব মশায়। উঠে আর হরিসভা অবধি যেতে হবে না।

বেড়ার ফাঁক দিয়ে গৌরী দেখছে। অনিলের অবস্থা দেখে হাসে খুকখুক করে। ঠিক হচ্ছে। রাগ আছে না বড়দার মনে! যা

বলল মুখ দিয়ে, সত্যি সত্যি তাই না হয়ে দাঁড়ায়! উঠে যেতে না পারে পিঁড়ি থেকে, টেপামাছের মতো পেটটা ফটাস করে ফেটে যায়। কম কষ্ট দিয়েছে মেয়ে দেখবার সময়! হাতের উপর আঙুল ঘষে ঘষে রং দেখেছে, হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে চলন দেখেছে, পায়ের নিচে দিয়ে শলা চালিয়ে খড়মপেয়ে কি না পরখ করেছে। উঃ, কত রকম যে আসে লোকটার মাথায়! এসব হয়ে গেল তো রান্নার পরীক্ষা—

আচ্ছা, কোন জিনিষ বাদ দিয়ে রান্না চলে না?

প্রশ্ন করে অনিল চতুর্দিকে সকলের উপর দৃষ্টি ঘুরিয়ে বুদ্ধির বাহাদুরি জানান দেয়।

ঘামে নেয়ে উঠেছে গৌরী। জবাব দিয়ে দিয়ে আর পারছে না। বলে, নুন।

হল না। ভাত রাঁধতে নুন লাগে নাকি? এমন বস্তু, যার বিহনে কোন রকম রান্নাই হবে না।

থতমত খেয়ে গৌরী বলে, কাঠ—

উঁহু। শহরে তো কয়লা দিয়ে রান্না করে, কাঠ লাগে না। তবে?

গৌরী বলে, আগুন।

অনন্ত সামনে আছে এই কনে-দেখার সময়। রাগে সে গরগর করছে। বাপ হিমচাঁদ আছেন। বাপের সামনে বলেই অনন্ত চুপচাপ আছে। এবারে সকলে খুশি। ঠিক উত্তর হয়েছে এবার। অন্য সমস্ত বাদ দেওয়া চলে—বিনা আগুনে রান্না হতে পারে না।

তবু কিন্তু মাথা নেড়ে দিল অনিল। বলে, আগেকার দিন হলে বলতে পারতে বটে! না মেনে উপায় ছিল না। কিন্তু খবরের-কাগজে বেরিয়েছে, রোদের তাপ ধরে রান্না করেছে কোথায়।

গৌরী আকাশ-পাতাল ভাবছে। অনিল তখন সদয় হয়ে বলে দেয়, মন। মন বিনে রান্না হয় না। এটা ধরে যাবে, ওটা পুড়ে যাবে, রাঁধুনির মন যদি রান্নায় না থাকে।

বড়দার চোখের উপরে হয়েছিল তো—তারই এখন শোধ নিচ্ছেন। পুঁতে ফেলবেন খাইয়ে খাইয়ে—ভেবেছ কি ভাসুরঠাকুর।

শানাই বেজে উঠল, শুনুন। পোঁ-ও-ও—সুর ধরেছে। ঢোল আর কাঁসি সেই সঙ্গে। জল সইতে চলেছে পাড়ায়। এয়োস্ত্রী একজন জলের ঘট নিয়ে আগে আগে যাচ্ছে। নিয়েছে পানসুপারি সিঁদুর আর সরষের তেল। এক একটা বাড়ির উঠানে গিয়ে দাঁড়ায়ঃ কই গো, বাইরে এসো বউঝিরা। ঘটি বের কর, তেল ঢেলে দিই।

ঘটিতে তেল দেয়, একটা জায়গা দেখে নিয়ে সুপারি রাখে। বাড়ির সব এয়োস্ত্রীর সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। গৃহস্থবাড়ি থেকে পাল্টা জল ঢেলে দেবে এদের ঘটে। বেশি নয়, একটুখানি। সব বাড়ি থেকে একটু একটু নিয়ে ঘট ভরবে।

এ বাড়ি হয়ে গেল তো পরের বাড়ি। দল ভারি হচ্ছে ক্রমশ—প্রতি বাড়ির বউ-ঝিরা সঙ্গ নিচ্ছে। এমনি চলল। গোড়ায় বেরিয়েছিল পাঁচটি প্রাণী, জল-সওয়া শেষ করে বিয়েবাড়ি ফিরে এল তখন আর গোনাগণতি নেই। ঘটি ভরতি জল—সকল বাড়ি ঘুরে ঘুরে কুড়িয়ে আনা। সকল গৃহস্থর আশীর্বাদ একটা ঘটের মধ্যে। বিয়ের আগে মেয়ের স্নান হবে ওই জলে।

চণ্ডীমণ্ডপের চওড়া বারাণ্ডায় ফরাস হয়েছে। বর আর ছোকরা বরযাত্রীরা সেখানে। ফষ্টিনষ্টি হচ্ছে, প্রবীণেরা ওর মধ্যে বসেন কি করে! তাঁদের কতক উত্তরের-ঘরে, আর কয়েকজন চণ্ডীমণ্ডপের ভিতর-দিকটায়। বরকর্তা মোটের উপর অনিলকেই বলতে হবে। দুপুরে সেই দেখেছিলেন—এখন চেহারা একেবারে আলাদা। তৈলচিক্কণ চুলে এলবার্ট-টেরি, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, শান্তিপুরে-ধুতির ফুলকোঁচা পা ছড়িয়ে মাটিতে লুটায়। দুপুরের সেই জুতো কাঁধ থেকে পায়ে নেমেছে—জুতো মস্মস করে খুব ব্যস্তভাবে অনিল এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করছে।

গেঁটে-বন্দুক দাগছে দড়াম-দড়াম করে। হাউইবাজি সোঁ-সোঁ করে আকাশ ফুঁড়ে উঠছে। চরকিবাজি পাক দিচ্ছে তারা কেটে কেটে। লোকারণ্য। কপালে কনে-চন্দন, সর্বাঙ্গে গয়নাগাঁটি, আজ গৌরীকে রাজরাজ্যেশ্বরী সাজিয়ে বসিয়ে রেখেছে। ধুপধাপ করে তিন-চারটে মেয়ে ছাতে উঠছে বাজি দেখবার জন্য। গৌরীকে দেখে বলে, তুই যাবিনে? ভাল ভাল সব বাজি নিয়ে এসেছে। তোকে আর কে দেখতে পাবে ওখান থেকে? চলে আয়।

গৌরী বলে, না ভাই, বড়মামী বকবে।

দেখতে পেলে তো! ঠাকুরমশায়ের সঙ্গে তিনি বিয়ের জিনিষপত্তোর সাজাচ্ছেন। এখন আর নড়বার জো নেই।

(আমি তো দূরে দূরে তখন—তৃতীয় ব্যক্তির মতো ঘুরছি। মেয়েরা কি করছে না করছে, সেটা জানি কেমন করে? এই জঙ্গলে যেমন বিয়েবাড়ি দেখাচ্ছি, এ জিনিষও ঠিক তাই। কল্পনায় সাজানো। নিজেকেই বা কেন ছাড়ি? কিছু মনে করবেন না—মজা করছি নিজেকেও জড়িয়ে। গল্পকারের কথা বেদবাক্য বলে ধরবেন না।)

জোর করে টেনেটুনে তারা গৌরীকে ছাতে নিয়ে গেল। মেয়ে অনেক জুটেছে। উমাও আছে। দাঁড়িয়ে বাজি দেখছে। সমস্ত বাইরের উঠানটা ছাত থেকে দেখা যায়।

একটি এর মধ্যে বলে ওঠে, ওই যে সব বসে আছে—বর কোনটা বল দিকি ভাই?

গৌরী বলে, আমি কি জানি।

উঁহু, ভাজা-মাছ উলটে খেতে জানেন না। বলতে পারিস তো—

গৌরী বলে, কি দিবি আগে বল।

সবাই তো সব জিনিষ দিয়ে দিল। আচ্ছা, তাসজোড়াটা দিয়ে দেব আমার। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে খেলিস।

গৌরী আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

মেয়েটা হেসে খুন: চোখ খারাপ হয়েছে, চোখে চশমা ধর গৌরী। এইটুকু তফাৎ থেকে চিনতে পারলিনে?

উমাকে না দেখিয়ে পারে না। বলে, উমা-দিদি, শোন। ওই যে মানুষটা আসছে—গৌরী বলছে বর নাকি। বর চোখে না-ই দেখুক, আক্কেলপছন্দ থাকবে না! বর হলে একা-একা বুঝি ভিতর-বাড়ি চলে আসে!

আমি যাচ্ছিলাম অন্দরের দিকে বরের বড়ভাই অনিলের কাছ থেকে জরুরি বার্তা নিয়ে।

উমা দেখে বলে, ওকে চিনতে পারলিনে গৌরী?

নিশ্বাস ফেলে আবার বলে, কলকাতায় পড়ে কিনা—পাড়াগাঁয়ে বিয়ে করতে মন যায় না এখন। নয় তো কি আর গৌরীর জন্য বর খোঁজাখুঁজির কথা! বাবারা বড্ড পছন্দ ছেলেটাকে।

নিচে তোলপাড় পড়ে গেছে: গৌরী ছিল যে এখানে? বসে থাকতে বলা হল—অ্যাঁ, দেখ দিকি কাণ্ড! এক-গা গয়না পরে যায় কোথায় মেয়ে?

ছাত থেকে গৌরী তাড়াতাড়ি নেমে আসে।

বড়মামীর গৌরবরণ মুখে যেন আগুনের হল্কা। বললেন, গয়না খোল্। এক একখানা করে খুলে এই থলিতে দিয়ে দে। বরকর্তা দেখবে, বরযাত্রীদের দেখাবে। সেই কথা ওরা বলে পাঠিয়েছে।

অনন্ত তিক্তকণ্ঠে বলে, দেখবে ফাঁকিজুকি দিয়েছি কিনা আমরা। সোনার ওজন কম আছে কিনা, বেশি খাদ মেশানো কিনা। তাই যদি থাকে, কি করবি তোরা? বর তুলে নিয়ে যাবি আসর থেকে? দেখ না তাই চেষ্টা করে—ঘাড়ে ক'টা করে মাথা এনেছিস, দেখা যাক। বাবাকে বলেও ছিলাম, বুঝলে মামীমা, গয়না কনের গায়ে পরানো হয়ে গেছে, কিছুতে আর খোলা যাবে না। তা বাবার যা গতিক—মেয়ের বিয়ে দিতে বসে বাবা যেন খুন-ডাকাতি-রাহাজানি করে বসে আছেন। বললেন, বলছে—দাও না দেখিয়ে। কারসাজি যখন নেই,

ভয় কিসের? ওদের ভয় করেই যেন ঠিকঠাক গয়না দেওয়া হচ্ছে। গৌরী যেন বাড়ির মেয়ে নয়, আমাদের বোন নয়।

গলা একটু যেন ধরে আসে গৌয়ারগোবিন্দ বড়ভাইয়ের। বলে, তু'হাতে তুটো কাচের চুড়ি পরে নে গৌরী, কী আর করবি। ভোগান্তি সেই কনে-দেখার দিন থেকে চলছে। যা বলছে করে যা – যতক্ষণ না আমার মাথা খারাপ হচ্ছে, মুচড়ে মুণ্ড ছিঁড়ে না নিচ্ছি যতক্ষণ।

থলিতে গয়না ভরে নিয়ে অনন্ত চলে গেল। উমা বলে, গয়না পরখ করে দেখতে চাচ্ছে, এত মানুষ থাকতে খবরটা কিনা মুখে করে আনল ও-ই! হায় কপাল, গয়নাপত্তোর তোর বাড়িতেই তো যেত— আংটি বোতাম বরসজ্জার খাট-চৌকি-পিতলকাঁসা সমস্ত তোর। গাঁয়ের মেয়েটা দিব্যি বেশ পাশের গাঁয়ে গিয়ে উঠত—জিনিষপত্তোর এ-বাড়ি থেকে কাঁধে কাঁধে ওদের বাড়ি চলে যেত। কত চেষ্টাচরিত্র হল—তা লেখাপড়া করছেন যে উনি, লেখাপড়ার মধ্যে কী করে বিয়ে হয়! বউ যেন বই-কলম কেড়ে পুড়িয়ে দিত উনুনে। হতভাগা!

গৌরী বিয়ের কনে—সবাই সব বলবে, তার আজকে মুখ বন্ধ। তবু কিন্তু থাকতে পারে না। উমাকে দেখিয়ে দেয়: চুপ কর দিদি। ওই দেখ না, সেই মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। শুনতে পাবে।

তাকিয়ে দেখে উমার গলার সুর মুহূর্তে খাদে নেমে এল। একেবারে ফিশফিশানি। মুখের দেমাক তবু ছাড়েনি। বলে, শুনল তো বয়ে গেল। আমার রোজগেরে ভগ্নিপতি—ঢের ঢের ভাল পাত্তর ওর চেয়ে। এক একটা হাটের দিন সিকি-তুয়ানি-টাকায় হাতবাক্স ভরে যায়। পাশ-টাশ করে ও-ছেলে কবে লাটবেলাট হবে— গাছে কাঁঠাল, হাতে তেল মেখে হা-পিত্যেশ বসে থাকো এখন। পাশ না করে ফেলই যদি করে বসে! তাই করবে দেখিস।

॥ চোদ্দ ॥

বিয়ের পরদিন বাসিবিয়ে—বাঁশিব বিয়ে। গেল কোথায় রে শানাই—চিঁড়ে-মুড়কি খাচ্ছে? যদ্দুর খেয়েছিস, থাক এখন ওই অবধি। বাজনাবাদ্যি না হলে বিয়েবাড়ির ঘুম ভাঙে না। লোকে ভাববে, বর-কনে বিদায় হয়ে গেছে। বাজা, বাজা—

দুপুরবেলা বাসিবিয়ের ভোজ। বরযাত্রীরা কাল খেয়েছেন বরপক্ষের নিমন্ত্রণে। বরকর্তা আদর-যত্ন করে নিয়ে এলেন—তাঁর কুটুম্বর বাড়ি একসাঁজ, ভাত নয়—লুচির ফলার করলেন। আজকের আলাদা ব্যাপার। কন্যাকর্তা নিমন্ত্রণ করবেন জনে জনের কাছে গিয়ে। নয়তো পাতের কাছে কাউকে এনে বসানো যাবে না।

হাতজোড় করে হিমচাঁদ-কাকা নিমন্ত্রণ করে ঘুরছেন: আমার নিবেদন, দয়া করে আপনারা আমার বাড়ি আজ মধ্যাহ্নে মাধ্যাহ্নিক-ক্রিয়া নিষ্পন্ন করবেন। যৎসামান্য শাকান্নের আয়োজন হয়েছে।

মাথায় টাক দীর্ঘকায় মানুষটি বিষম জোরে হুঁকো টানছেন। কে কখন কল্কের দাবিদার হয়ে আসে—আগেই কল্কের তামাক পুড়িয়ে ছাই করবেন, এই সঙ্কল্প। হাত তুলে হিমচাঁদ-কাকাকে দাঁড়াতে বলেন তিনি। আরও কতকগুলো মোক্ষম টান দিয়ে হুঁকো থেকে মুখ তুলে জড়িত-কণ্ঠে বলেন, কি জাত আপনারা?

হিমচাঁদ-কাকা অবাক হয়ে আছেন দেখে বললেন, হালদার উপাধি কিনা মশায়ের। বামুন-কায়েত থেকে আরম্ভ করে অনেকেই তো হালদার।

হিমচাঁদ-কাকা বলেন, আপনারা ছেলের বিয়ে দিলেন কাল আমার মেয়ের সঙ্গে—

বিয়েথাওয়া সত্ত্বেও কত রকমের খুঁত বেরিয়ে পড়ে। সেকালের

বাঘা-বাঘা ঘটকমশায়রা নেই, পাঁতি খুলে যাঁরা সঙ্গে সঙ্গে জাত বের করে দিতেন। কোন গোত্র মশায়ের, কার সন্তান? আমার নাম হল শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ। নাম শুনেছেন?

কস্মিনকালে শোনেন নি। তবু কন্যার পিতা বলে চুপ করে থাকতে হয়। বিপিন ঘোষ বললেন, বাঘুটের ঘোষ আমরা—মুখ্যকুলীন। কুলীন-সম্মান পাঁচটা টাকা লাগবে। ভোজের আগে নগদ আবশ্যক।

হিমচাঁদ-কাকা সকাতরে বলেন, মেয়ে পাত্রস্থ করা কত বড় সঙ্কট বুঝতে পারছেন। ঈশ্বর-দত্ত সম্মান আপনাদের ঘোষজামশায়। ছা-পোষা কন্যাদায়গ্রস্ত মানুষ বলে মাপ করে দিন। সম্মান তাতে বাড়বে বই কমবে না।

কথাবার্তার মধ্যে দু-চার জন জুটে গিয়েছে হিমচাঁদ-কাকার পিছনে। প্রফুল্ল রাগ করে বলে, অত কান্নাকাটির কি হল শুনি? কুলীন-বিদায় উঠে গেছে আজকাল। খুব তো কুলের আঁটি ধরে আছেন মশায়। কুলীনের নবলক্ষণ—মুখে মুখে বলুন দিকি সেইগুলো। তা হলেও বুঝি।

অর্বাচীন অপোগণ্ডের দিক থেকে অবহেলায় মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বিপিন ঘোষ হুঁকোয় মুখ দিলেন।

হিমচাঁদ-কাকা বলেন, কুলীন এসেছেন সাতাশটি। অনিল বাবাজী ফর্দ দিলেন। বুঝে দেখুন ঘোষজামশায়, অত কুলীনের সম্মান-খরচায় তো আর একটা মেয়ের বিয়ের ভোজ হতে পারে।

বিপিন ঘোষ ঘাড় নেড়ে বলেন, কিছু না, কিছু না। কুলীন তো সবাই কপচে বেড়ায়। মুখ্যকুলীন সারা বঙ্গদেশ কুড়িয়ে যে ক'জন আছে, আঙুলে গণা যায়। মধ্যাংশ কিছু আছে। আর যত দেখেন, সবাই তেজো-দোজো। একটা পিঁপড়ে মুখে করে যতটুকু চিনি নিতে পারে, তেমনি কণিকা প্রমাণ তাদের কুল। আমার সঙ্গে অন্যের তুলনা—ঘোড়া-ভেড়ার এক দর হতে পারে? শুনুন না মশায়। আর ওই

সাতাশের মধ্যে কত জনে কুল ভেঙে বংশজ হয়ে আছেন, তারও হিসাব নিয়ে দেখুনগে।

সহসা অনন্তর আবির্ভাব। সে নিরুদ্বেগ একেবারে। বলে, ভোজ হবে তুপুরবেলা, এসব তো সেই সময়ের কথা। এতই হচ্ছে, আর কুলীনেরা ন্যায্য সম্মান পাবেন না কেন? কোন চিন্তা নেই 'মশায়। খাওয়ার আগে সম্মান চান তাই পাবেন, পরে চান তো পরে। ওদিকে মুশকিল হয়েছে—বর-কনের বিছানা তুলছে না মেয়েরা, শয্যা-উত্থানের টাকা চাচ্ছে। ইস্কুল-লাইব্রেরি, হরিবাড়ি আর দরিদ্র-আশ্রম থেকেও বসে আছে টাকার জন্য। অনিলবাবু সময় বুঝে কোন দিকে সরে পড়েছেন।

বিপিন ঘোষের দিকে চেয়ে বলে, আপনি তো বরপক্ষের মুরুব্বি। আপনি ব্যবস্থা করে দিন না।

বিপিন ঘোষ শুনতে পেলেন না। তামাক খাচ্ছেন, নাকে-মুখে ধোঁয়া ছেড়ে অদৃশ্যপ্রায় হয়ে গেছেন।

বাসিবিয়েয় পুরুত লাগে না। স্ত্রী-আচার সমস্ত হয়ে কলাতলায় স্নান করবে বর-কনে। আংটি দিয়ে বর সিঁত্বর পরাবে কনের সিঁথিতে। বরণ করবে যত বউ-মেয়েরা। ঘরে নিয়ে বসিয়ে যৌতুক খেলাবে। আমোদের ব্যাপার আগাগোড়া—হাসিঠাট্টা রংতামাশা। স্নানের সময় বর আর কনের পিঠে পুতুল গড়তে হয়। পিঠালির পুতুল—কনের পিঠে বর গড়ছে, বরের পিঠে কনে। গড়ছে কি তারা আর—অন্য মেয়েরা করে দিচ্ছে, ওরা হাত ঠেকিয়ে যাচ্ছে এই মাত্র। কনের পিঠে ছেলে-পুতুল, বরের পিঠে মেয়ে-পুতুল। অর্থাৎ বর চাচ্ছে ছেলে হোক বউয়ের, বউ চাচ্ছে মেয়ে।

ঘরে নিয়ে যাবার আগে বরণ। বাজনদারের যত রকম বিদ্যে জানা আছে, দেখাবে এই সময়। কাজকর্মে আটকা পড়ে মেয়ে-বউ এখনো যা তু-একটি ঝাড়িঘরে আছে তারা বলবে, ঐ রেঃ, বরণের বাজনা বেজে উঠল। চল, চল—

পান-বরণ—দু-হাতে দুটো পান প্রদীপে সেঁকে তপ্ত করে নিয়েছে। সম্পর্কে বরের বড়শালী হয়, উমা করছে তাই বরণটা। দু-হাত কাঁপিয়ে নিচু থেকে পান তুলতে তুলতে শেষটা বরের মুখে দিয়ে দেবে। হাঁ করছে বর—উমা করল কি, পান না দিয়ে বুড়োআঙুলের ঠোনা মারল গালের দু-পাশে।

কলা-বরণ—দু হাতে দুই কাঁঠালিকলা। এবারে তো আরও সাংঘাতিক। কলা দিয়েই ঠোনা মারবে না মুখের ভিতর কলা ঢুকিয়ে দেবে, কে জানে? বর দুঃসাহসিক কাজ করল। খপ করে কলা সুদ্ধ হাত ধরে ফেলল উমার। দোকানদার মানুষ, বড় বড় বস্তা সরাচ্ছে ঘোরাচ্ছে অহরহ—উমার নরম হাত দুটো অবহেলায় উল্টে ধরে তার নিজের মুখেই ঠোনা মারছে কলা দিয়েঃ কেমন দিদি, হল তো? আচ্ছা জব্দ!

মেয়েরা হেসে এ-ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে।

দূর্বা-বরণ: বড় শক্ত বরণ, যার তার কাজ নয়। অনন্তর বউ করছে এবারে। ধান আর দূর্বা দু-হাতে, শুধুমাত্র হাত দুটো নয়—সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে এই বরণ করে। কড়া রোদ। ঢোল-কাঁশি মেতে গিয়ে বাজছে বরণের তালে তালে। বউয়ের ফর্শা মুখ টকটকে রাঙা হয়ে গেছে। চোখের ভাব কেমনতরো। অচেতন হয়ে পড়বে নাকি? না, সামলে নিয়েছে। এমন উৎকৃষ্ট বরণ—তার মধ্যেও কিন্তু বজ্জাতি। দোকানদার বরকে ঘাঁটাতে আর সাহস হয় না, মস্করা একটু গৌরীকে নিয়ে। দূর্বার গোড়ায় কাদা—হাত কাঁপাতে কাঁপাতে কপালে দূর্বা ছুঁইয়ে যাচ্ছে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে, কাদার পোঁচ লেগে যাচ্ছে কপালের উপর। ও মা, কাঁদছে যে গৌরী—দু-চোখ জলে ভরা। ও আমার ননীবালা রে! বউ মনে মনে বলে, দূর্বার ছোঁয়া সইতে পার না—যাচ্ছ তো শ্বশুরবাড়ি, তেমন তেমন বউ-কাঁটকি শাশুড়ির পাল্লায় পড় তো বুঝবে ঠেলা!

বাড়ির ঠিক নিচে বিল। বর্ষার বিল, জলে টইটম্বুর। কাটাখালির

ঘাট থেকে নৌকো বাড়ির নিচে এনে ফেলেছে। বরকনে অবশ্য পাল্কি হাঁকিয়ে যথানিয়ম কাটাখালি অবধি যাবে। বরযাত্রীদের এখান থেকেই নৌকোয় চাপবার ব্যবস্থা। আর নয় তো পায়ে হাঁটা।

অনন্ত হন্তদন্ত হয়ে এসে বলে, সারা হল বরযাত্রীমশায়দের ? নৌকো এখুনি না ছাড়লে উপায় নেই। ধানবন ঘুরে যাবে, সন্ধ্যে হলে পথ খুঁজে পাবে না। গোনও সরে যাবে ওদিকে।

সামিয়ানার নিচে বরযাত্রী অনেকেই বসে গেছেন ইতিমধ্যে। বলাবলি হচ্ছে : শুনলে তো, হাত চালিয়ে সেরে নাও। বেগোন হলে রাত দুপুর অবধি কাটাখালি আটক থাকতে হবে। শীতের রাত—লেপ তোষক দিয়ে কালকের মতন কেউ খাতির করবে না।

কেবল বিপিন ঘোষ এবং আর কয়েকটি কুলীন-সন্তান বেজার মুখে ঘোরাঘুরি করছেন।

অনন্ত বলে, আপনারা বসলেন না ?

তোমারই যে দেখা-সাক্ষাৎ নেই! তখন চাপা দিয়ে দিলে, কথাবার্তার কিছু তো আস্কারা হল না।

অনন্ত বিরক্তকণ্ঠে বলে, পানসি ছেড়ে দেয় ওদিকে। সম্মানটা খাওয়ার পরে নিলেও তো হত। ও বিশ্বাস হয় না বুঝি—আগাম নিতে চান ?

সীতেশ্বর কোথায় ছিলেন, লাফাতে লাফাতে এসে পড়লেন। বলেন, ঘাবড়াও কেন অনন্ত! সম্মান আগামই দেওয়া হচ্ছে। কতক পর্যায় বলুন ঘোষজামশায়। প্রফুল্ল, তুমি ভাই মোটা দেখে একখানা জিওলের কচা ভেঙে আন তো—

তখন অনন্ত আর সীতেশ্বরে তুমুল ঝগড়া : গোঁয়াতুর্মির জায়গা নয় এটা। আমাদের বাড়ি, সেটা খেয়াল রাখবেন সীতেশ্বর-দা।

সীতেশ্বর বলেন, কিন্তু সম্মান হাতে-হাতে না পেলে যে বসতে চাচ্ছেন না। পানসি ওদিকে ছেড়ে দেয়।

অনন্ত আরও উত্তেজিত হয়ে বলছে, রাহা-বাড়ি যে কাণ্ড করলেন, এখানে চলবে না। স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিচ্ছি। কুটুম্ব আমাদের, হুঁশ থাকে যেন।

ভোজ খেতে খেতে একজনে বলে, হুঁ, শুনেছি বটে কী এক গণ্ডগোলের কথা। রাহা-বাড়ি কি হয়েছিল বলুন তো?

প্রফুল্ল বলে, কুলীনরা সম্মানের জন্য বেঁকে বসলেন। ডেকে তখন জিজ্ঞাসা করে, কতর পর্যায় আপনি? বলছে পঁচিশ। গণে গণে পঁচিশ ঘা অমনি পিঠে। বলল ছাব্বিশ—। গণে গণে ছাব্বিশ ঘা।

দাঁতে-দাঁত ঘষে অনন্ত বলে, করেছিলেন এই সীতেশ্বর-দা দলবল জুটিয়ে এনে। গাঁয়ের বদনাম। আজ আবার তেমনি-কিছু করতে গিয়েছেন কি খুনোখুনি বেধে যাবে।

উঠানে জায়গা করা আছে সকলের জন্য। বিপিন ঘোষ বাদে অপরাপর কুলীন-সন্তানরা টপাটপ বসে পড়লেন।

সীতেশ্বর হেসে বলেন, হল কি মশায়দের? সম্মান না দিয়েই বসে গেলেন?

তেজো-দোজো কুলীন আমরা। পিঁপড়ের মুখে যা ধরে, সেইটুকু মাত্র কুল। সম্মানও সেই অনুপাতে হবে তো! ঘোষজামশায় মুখ্যকুলীন —কুলপতি। ওঁকে যথাযোগ্য সম্মান দিন, তাতেই সকলের হয়ে যাবে।

একটা মাত্র জায়গা তখন বাকি—বিপিন দ্বিরুক্তি না করে বসে পড়লেন। অনন্ত হি-হি করে হাসতে লাগল: খবর নিয়েছি ঘোষজামশায়, সম্পর্কে আপনি অনিলবাবুর ভগ্নীপতি হন। ঠাট্টার সুবাদ, তাই ঠাট্টাতামাশা করা গেল একটু। কিছু মনে করবেন না।

এসব তো হল, কিন্তু গৌরী গেল কোথায়? এই ছিল, এই নেই। পুরুতঠাকুর যাত্রামঙ্গল পড়াবার জন্য এসেছেন। বরের সাজগোজ হয়ে গেছে। মেয়ের সাজে বেশিক্ষণ লাগে, তারই কোন পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। এই তাড়ার সময়টা হাঁদা মেয়ে কোথায় গিয়ে যে রইল!

গৌরী, ওরে গৌরীরাণী, গেলি কোন দিকে তুই?

সকলে খুঁজে খুঁজে হয়রান।

নতুন বিয়ের কনে খিড়কির বাগানে তখন। নারকেল-সুপারির মস্তবড় বাগিচা, মাঝখানে পুকুর। সেই পুকুরপাড়ে এসে আমার সঙ্গে লাগিয়েছে।

দোষ ষোলআনা তার। হ্যাঁ, তারই। এতকাল পরে—আজ যখন সব-কিছু বিলয় হয়ে গেছে, আপনাকে গোপন করে লাভ কি আছে বলুন। সত্যিই আমি কিছু জানিনে—আচমকা এসে গৌরী পিছন থেকে কাদা ছুঁড়ে মারল গায়ে। নিতান্ত গায়ে-পড়ে ঝগড়া। ভালমন্দ আমি কিছু বলিনি, নিজেই সে গজরাচ্ছে: বেশ করেছি—

উমা-দিদি এবং আরও কে কে যেন এসে পড়ল। তাঁদের কাছে মিথ্যে নালিশ আমার নামে: বউদি বলল, মুখ-হাত পা ধুয়ে এসো, ভাল করে সাজাব। সাবান-গামছা নিয়ে তাই পুকুরঘাটে নেমেছি। এই মানুষ তখন নারকেলগাছের আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে।

মিথ্যে কথা, ডাহা মিথ্যে। কী সর্বনাশ, দিনকে রাত করতে পারে যে বিচ্ছু-মেয়ে! বিলে কাল ছিপ নিয়ে বসব, টোপের জন্য লালপিঁপড়ের (আমরা বলি নালশো) বাসা খুঁজে বেড়াচ্ছি। আচ্ছা বেশ, পুকুরঘাটে এসেছিল তো সাবান-গামছা কোথায়? দেখাতে বলুন গৌরীকে। সমস্ত ওর বানানো।

চলে যাবার ঠিক পূর্বক্ষণে এখন বকাবকির সময় নয়। বোনের হাত ধরে টেনে উমা বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। যাবে কি সহজে! ঝগড়া করছে মুখ ফিরিয়ে: কাদা ছুঁড়েছি, বেশ করেছি। ইট ছুঁড়তাম হাতের কাছে পেলে। কেন আমার দিকে তাকাবে? ভোজে বসে সবাই খাচ্ছেদাচ্ছে, কেন তখন বনে-বাগানে ঘুরে বেড়ায়? নালশোর বাসা খোঁজার সময় হল না আর!

পালকিতে উঠল বর-কনে। ঢোল-কাঁসি বাজে, শানাই বাজে। ঢুলি হঠাৎ ঢোল থামিয়ে শানায়ের সুর গানের কথায় বলে যাচ্ছে:

কাঁদিসনে রাই বিনোদিনী
বনে কাঁদে তোর নীলমণি রে,
তুই তবে আর কাঁদিস কেনে রাই—

শানাই বাজে, শুনতে পান? শানাই না আরো-কিছু! জঙ্গলের মধ্যে বানিয়ে বানিয়ে কেমন আপনাকে বিয়ে দেখিয়ে দিলাম। নিজেকে তার সঙ্গে জড়িয়ে। গাঁঅঞ্চলের বিয়ে-ছবিটা কেমন উতরাল? হঠাৎ যদি এইখানটা গৌরী এসে উদয় হয় একদঙ্গল সখী সঙ্গে নিয়ে, আলাদা করে চিনে নিতে পারবেন?

॥ পনেরো ॥

কী বিশাল আমগাছ! পথের ঠিক মাঝখানটায়। উঁচু শিকড়-বাকড়ে পায়ে ঠোক্কর লাগল। দোষ শুধু গাছের নয়, আমারও। কানে শানাইয়ের সুর। সর্বনেশে জায়গা ওই যে হিমচাঁদ-কাকার বাড়ি হয়ে এলাম। মনে নেশা ধরিয়ে দিল। নেশার ঘোরে পা ফেলে ফেলে চলছি।

বলি আপনাকে চুপিচুপি। নিশিরাত্রে কলম হাতে আমার চার-তলার ঘরে আলোর সামনে বসেছি—সহসা শানাই কানে আসে যেন। আর ঢোল-কাঁসি। অনেক—অনেক দূরে ভিন্নরাজ্যের গাঁ-গ্রাম থেকে। অনেক-অনেক অতীতে আমার কিশোর বয়সের স্বপ্ন-মাখানো সুর। আর আমার কাজকর্ম হয় না, ছটফট করি। অদৃশ্য শানাইদার আর ঢুলিদের উদ্দেশে মাথা কুটি তখন। কনে শ্বশুর-বাড়ি যায় ডিঙি উঠে, সেই সময়ের এক গান আছে:

থামাও রে ঢোল ঢুলি-ভাই,
কাঁসির ঝনঝনি,
শানাই অমন বাজাইও না রে—
আমার মায়ের কান্না শুনি।

যাবার ক্ষণে সেদিন গৌরী তুমুল ঝগড়া করল। সকালবেলার কথাবার্তা ছিল কিন্তু অন্য রকম। ভোজের কলাপাতা পুকুরঘাট থেকে ধুয়ে নিয়ে আসছি, পাকা জাম একটা গায়ে এসে পড়ল। থমকে দাঁড়িয়েছি তো টুক-টুক করে আর তিন-চারটে। অতএব গুণনিধি গৌরীরাণী না হয়ে যায় না।

উদ্বেগে জামগাছের উপরে তাকাই। বাড়িতে কুটুম্ব গিজগিজ করছে, বাসিবিয়ের জন্য এক্ষুনি তো খোঁজ পড়বে—স্বভাব বশে বিয়ের কনে গাছে চড়েই বসল বা!

পুনশ্চ ক'টা এসে পড়ে। তবু রক্ষা, জাম ছুঁড়ছে গাছ থেকে নয়—গাছতলায় পালকি রয়েছে তারই ভিতর থেকে। অপরাহ্নে বরকনে পালকিতে যাবে—কনে আগেভাগে পালকিতে ঢুকে পড়েছে, কোঁচড় ভরে জাম এনে নিরিবিলি বসে বসে খাচ্ছে। এবারে দেখি, হাতছানি দিয়ে ডাকে আমায়। আঙুল নেড়ে ডাকছে, নতুন আংটি আঙুলে ঝিকঝিক করে।

ঝুঁকে পড়ে বলি, পাগলামির আর সময় পেলে না। বেরোও, কানাচের দিক দিয়ে টিপিটিপি ঘরে চলে যাও। সদরে তোমার শ্বশুরবাড়ির লোকজন—ওদিক দিয়ে নয়।

গৌরী বলে, বোসো তুমি এই জায়গায়—এই পালকির পাশে। ছুটো কথা বলব।

বসলে লোকের নজরে পড়ে যাবে। কি বলবে বলো, দাঁড়িয়েই শুনতে পাব।

মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে গৌরী বলে উঠল, আমার বর দেখতে কেমন? শুনেছি যেমন কালো, তেমনি ষণ্ডা। সত্যি?

দেখনি তুমি?

উঁহু, শুভদৃষ্টির সময় চোখ বুঁজেছিলাম। বাসরঘরে, সবাই বেরিয়ে গেলে, একবার ইচ্ছে হল দেখি তাকিয়ে। তা ভয় হল বড্ড। কী জানি কি দেখব! যদি দেখি একটা মোষ পড়ে রয়েছে পাশে!

বিয়েথাওয়া হয়ে গেল, এখন এই সব বলে বুঝি! হাসিস্ফূর্তি করে চলে যাও।

যমপুরী যেতে হাসি আসে নাকি?

জোর দিয়ে আবার বলে, যমপুবী তো ওর চেয়ে ভাল জায়গা। যা শুনলাম—নোনারাজ্যি, তেপান্তরের বিল। ধানবনের মাঝে টিলার উপর এক একটা পাড়া।

তোমারই সুবিধে গৌরী। ছুটে বেড়াবে, জলে ঝাঁপাবে—

ছুটোছুটি কি চিরকাল লোকেব ইচ্ছে করে? ভাল লাগে? গৌরী ফোঁস করে এক নিশ্বাস ফেলল। সে নিশ্বাস আজকেও যেন শুনলাম হিমচাঁদ-কাকার বাড়ির জঙ্গলে।

বলে, তোমার কলকাতা শহরের কথা বলছিনে—আমাদের সদর থেকেও একটা সম্বন্ধ এসেছিল। জায়গা ছোট হোক, সে ও শহর জায়গা। ছেলে উকিলের মুহুরি। কিন্তু বাবা কানেই নিলেন না। এদের পাঁচ-পাঁচটা গোলা আর বিশটা গাইগরু দেখে মজে আছেন। আচ্ছা বলো দেখি, কত ধান আর কত দুধ মানুষের খেতে লাগে। গাড়ি গাড়ি ধান বিক্রি করে এরা নাকি টাকার কাঁড়ি ঘরে তোলে, বালতি-ভরা দুধ পাড়ায় বিলোয়। তা আমি একদিন ওদেরই গরুর দড়ি গলায় ঝুলিয়ে মরে থাকব। কলকাতায় বসে তুমি কানে শুনবে।

দুটো চারটে বছব বরের ঘর করতে লাগো গৌরী, তারপর কানে শোনা কেন চোখেই দেখে আসব একবার গিয়ে। হুস করে চলে যাব তোমার শ্বশুরবাড়ি।

সেই ধাপধাড়া জায়গায় যাবে তুমি? হয়েছে!

বড়লোকের ঘরণী হয়ে গেলে—তুমিই না হয় এসো একবার কলকাতায়। বরকে নিয়ে এসো। কলকাতা ভাল করে দেখিয়ে শুনিয়ে দেবো।

গৌরী বলল, ধানীমানী গৃহস্থ—ওরা যাবে কলকাতা! এ জন্মে

নয়, আর-জন্মে—নতুন জন্ম নিয়ে যদি আমার কলকাতা দেখা হয়।

তারপরে গৌরী দু-পাঁচবার বাপের বাড়ি এসেছে। শহরে থাকি, আমার সঙ্গে দেখা হয়নি, গাঁয়ে এসে শুনেছি তার কথা। দোজবরে বর খুব আদরযত্ন করে, তিন-চারটে ছেলেমেয়ে হয়েছে। নোনা অঞ্চলে থাকা সত্ত্বেও মোটা হওয়ার দরুন রং চিক্কণ হয়েছে আরও। এইসব শুনেছিলাম। আর জামতলায় পালকির ভিতরে বসে কনে-বিদায়ের দিন গৌরী কত দুঃখই না করেছিল!

শিয়ালদা স্টেশনে সেই গৌরীকেই যেন দেখে এলাম। ছেঁড়াশাড়িতে আষ্টেপিষ্টে দেহ মুড়ে কাটারি পেতে আনাজ কুটছিল—বউটার গৌরী হওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

হায়রে হায়, স্টেশনের প্রান্তে গৌরীরাণীর আবরু-হীন নতুন গৃহস্থালী! রান্না চাপিয়েছিল। রান্না নয়, চাল ফুটানো। তিনখানা টুকরো ইট, তার উপরে মেটে-হাঁড়ি। ভাঙা-টুকরি ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে এনে উনুনে দিচ্ছে। রেলপুলিশ সেই মুহূর্তে হাঁ হাঁ করে এসে পড়ে: এখানে আগুন করার আইন নেই। যা করতে হয় ওই বাইরের দিকে গিয়ে, রাস্তার পাশে।

তা সেখানেই বা অসুবিধা কি! পিচ-দেওয়া রাস্তার ওধারটা ট্যাক্সি-মোটরের জায়গা। প্যাসেঞ্জার নিয়ে ওরা যখন যাবে, হেঁসেলের দিকটা বাঁচিয়ে যাবে একটু।

মুশকিল, বাইরে গরুর উৎপাত। বেগুন আর নটেশাক কুটছে, ইয়া ইয়া দুই ষাঁড় ছুটে এলো। শাকের আঁটি মুখে নিয়ে চিবোচ্ছে, বউটা বেগুন তাড়াতাড়ি কাপড়ের নিচে নিয়ে নিল। এত সব আপনি দেখেন নি, আমি কিন্তু ঠাহর করে করে দেখেছি। মুখের উপরের আঁচল তবু এতটুকু বেসামাল হতে দেয় না। চেনা কারো সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়, চিনে ফেলে পাছে। (আমি পাছে দেখে ফেলি?)

ডাবের খোলা চতুর্দিকে। গরু চাটছে, জিভ ঢোকবার চেষ্টা করছে ভিতরে। ক'টা বাচ্চাছেলে খোলা নিয়ে ছুড় ছুড় করে পালায়—গরু ফোঁস করে ওঠে। সকলের ছোটটি কাটা-মুখের ভিতরে আঙুল ঢুকিয়ে একটু একটু শাঁস বের করে। বড় জন কেড়ে নেয় তার হাত থেকে—তার বুদ্ধি বেশি, শানের উপর আছড়ে ভেঙে শাঁস খায়। শাঁস তেমন কই? ষাঁড়টা ছুটে আসে, বাচ্চাগুলো ছিটকে পড়ে এদিক-সেদিক। উনুনের একদিকের ইট সরে গিয়ে হাঁড়ি উলটে পড়ল। বউটা গুম-গুম করে পেটায় অস্থিসার ক্ষুধালোলুপ সামনের বড়-ছেলেটাকে। তবু ঘোমটা সরে না। ছেলে পিটিয়ে নিজেই আবার ঘোমটার নিচে থেকে ডুকরে কেঁদে ওঠে। মুখ না দেখি, গলা শুনতে পাই: মর্, মর্। চিতায় দিয়ে আসি তোদের, আমার কাঁধ খালাস হোক। তোদের লেগেই তো পড়ে আছি, নইলে আমার কি!

ছাঁৎ করে আমার মনে উঠল, বউটা হতে পারে হিমচাঁদ-কাকার মেয়ে গৌরী। গৌরীই আর-জন্ম নিয়ে শহরে এসে পড়েছে। বাসিবিয়ের দিন আমায় সে এমনি কথাই বলেছিল।

কী যেন দুঃস্বপ্ন একটা! কাটিয়ে উঠতে পারিনি এখনো। গাছের শিকড়ে ঠোক্কর খেলাম। চলুন, এগিয়ে চলুন—

।। ষোল ।।

বিশাল এই আমগাছ। রাস্তার ঠিক মাঝখানে গাছ রেখে দিয়েছে। এই ফকির-রাস্তা তৈরি হবার আগেও ছিল—মারা পড়ে নি। কেউ কুড়াল মারতে চাইল না গাছে। কারা নাকি স্বপ্ন দেখায়: খবরদার, খবরদার! মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে, নির্বংশ হবি।

রাস্তা দু-ভাগ হয়ে গাছের দু-পাশ দিয়ে গিয়ে আবার এক হয়ে মিশেছে।

নটবর চৌকিদার গুণীন মানুষ। সাধারণ দশটা বস্তু আপনারা দেখেন। তার বাইরে আরও সব রয়েছেন—আপনারা কানে শুনেছেন, ভয়ও করেন, কিন্তু চোখে কিছু দেখতে পান না। তাঁদের চালচলন নাড়িনক্ষত্র নটবর সমস্ত জানে। বিস্তর গল্প শুনেছি, অধিকাংশই তার স্বচক্ষে দেখা। শত্রুতা খুব নটবরের সঙ্গে, কায়দায় পেলে ঘাড় ভাঙতে ওঁরা কসুর করবেন না। কিন্তু নটবরও পাত্র সহজ নয়, অষ্টবন্ধন করে তবে সে পথে পা দেয়।

একবার '১ইখানে—এই ধান-কাটা মাঠের কোন এক জায়গায়। ফকির-রাস্তা হওয়ার অনেক আগে। মাঠের উপর চাকার পই পড়ত—কোথাও খটখটে শুকনো, কোথাও জলকাদা। পই ধরে গরুর-গাড়ি চলাচল করত। চীনাটোলার বাজারে নটবর কোষ্টা বিক্রি করতে গিয়েছিল। ফিরে আসছে তখন রাত দুপুর। অল্প অল্প জ্যোৎস্না পড়ে মাঠের জল চিকচিক করছে। দেখে, প্রকাণ্ড এক মিঠেকুমড়ো পড়ে রয়েছে। পাইকারে এই সময়টা কুমড়ো-লাউ মুলো-বেগুন ইত্যাদি তরকারি কিনে নাবাল অঞ্চলে চালান দেয়। তেমনি কোন গাড়ি থেকে কুমড়ো পড়ে গিয়ে থাকবে, কেউ খেয়াল করেনি। নটবর খালি গাড়ির উপর কুমড়োটা তুলে নিয়ে রাখল। ওজনে বেশ ভারী—কিন্তু মনটা ছাঁত করে উঠল, গরম কেন কুমড়ো ? জলের মধ্যে পড়ে ছিল – কিন্তু কামারের হাপরের উপর থাকলে তবেই তো এমন হবার কথা।

গাড়ি যাচ্ছে ক্যাঁচকোঁচ করে।—যাচ্ছে। নটবর এক একবার পিছন ফিরে তাকায়। খানিক পরে দেখে, কুমড়ো নয়—ছাগলছানা। তাকাচ্ছে তার দিকে চোখ পিটপিট করে। তারপরে মনে হল, দু-পাটি দাঁত মেলে হাসছে সেই ছাগলছানা। তেপান্তরের মাঠ—মানুষ বলতে একা এই নটবর। আজকের দিনেও ঠিক সেই অবস্থা—এদিক-ওদিক দু-চার মাইলের মধ্যে গ্রাম পাবেন না।

গরু অবোলা জাতি, তবু তারা বুঝতে পারে। মাঠ ভেঙে দৌড়চ্ছে। নটবর সামাল দিয়ে উঠতে পারে না। অবশেষে, যাই হোক, ডাঙার

উপর এসে পড়ল—এই আমগাছতলায়। যেই না এসেছে—কোথায় ছাগলছানা! বাহুড় হঠাৎ আওয়াজ তুলে পাখা ঝাপটে আমের ডালে গিয়ে উঠল। তারপরে কী ঝুটোপুটি, একটা ছুটো নয়, ঝাঁকে ঝাঁকে বাহুড় উড়ছে। এদিকে আমগাছ, আর ওদিকে ওই যে দেখছেন—শ্মশানের বাঁশঝাড়। শ্মশান আর আমগাছের ব্যবধান একফালি জমি—জায়গাটুকু যেন আঁধার হয়ে গেল বাহুড়ের চলাচলে। গড়ভাঙার হাটখোলায় পৌঁছে তবে সোয়াস্তি নটবরের। ভগবান নাথের দোকানে ঢুকে বলে, কলকেটা তাড়াতাড়ি ধরাও, বলছি সমস্ত।

এই এমামনগর থেকে গড়ভাঙার হাট—জায়গাটুকু বড় খারাপ। ছেলেবয়সে রাম-রাম করতে করতে দম ধরে ছুটতাম—রাম-নাম মুখে থাকতে ওঁরা কিছু করতে পারেন না। পা ফেলে ফেলে গণেছিলাম একবার—৮৩ পায়ের পথ। ছ'শ চুয়াল্লিশ না কত। মাঠের মধ্যে হাওয়া ওঠে, খেজুরপাতা নড়ে ঝিলমিল করে। অন্তরীক্ষচারীরাও গ্রাম-বালকের সঙ্গে ছুটছেন বুঝি গাছের মাথায় মাথায় পা ফেলে। হাটখোলায় পৌঁছে গিয়ে তবে সোয়াস্তি।

বাঁধা-দোকান চার পাঁচটা। এবং চালা-ঘর ছুই লাইন। হাটের সময় ব্যাপারিরা চালার মধ্যে দোকান দেয়। অন্য সময় খালি—বৃষ্টিবাদলায় মাঠের গরুছাগল এসে আশ্রয় নেয়। আর উঠানের মতন বিস্তীর্ণ জায়গা চতুর্দিকে। ঘাসবন একটি নেই, মানুষের পায়ে পায়ে ঘাস উঠতে পারে না। হাটের পরদিন ঋষিপাড়ার মেয়েমদ্দ এসে ঝাঁটপাট দিয়ে যায়। কাজটা মুফতের—তবু তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি, কে কতটা জায়গা ঝাঁট দেবে। ঝাঁটার আগায় কালেভদ্রে পয়সাটা আনিটা বেরিয়ে পড়ে, সেই লোভে ঘোরে সবাই।

•শীতকালে জমজমাট হাট। হাটখোলার চৌহদ্দি ছাড়িয়েও হাট উই আমবাগান অবধি ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষেতের ফসল খামারে উঠেছে—মানুষের হাতে-গাঁটে পয়সা, মনে স্ফূর্তি। হাটুরে মানুষ আসে বিস্তর

দূর থেকে। মেছোহাটায় বেজায় ভিড়, ঢুকতে গিয়ে গায়ের ছাল এক পর্দা উঠে আসবে। ঢুকেই বা কি—গুড় আর কোষ্টা-বেচা কাঁচা পয়সার সঙ্গে পারবেন দরাদরি করে?

চিতল ছুখানা কত? বারো আনা—বললে একটা কথা বটে! তার মানে বিক্রির মতি নেই, বাড়ি নিয়ে খাবে। শোন, আমি বলি এক কথা—হাতে রেখে বলছি না। চার আনা। দাগা কখানা হবে, দেখ হিসাব করে। চার গণ্ডা—না হয় পাঁচ গণ্ডাই হল, দাগাখান তবে তো পয়সা-পয়সা প˙ গেল। মাছ খাওয়া নয়, পয়সা চিবিয়ে খাওয়া। যাকগে যাকগে, আরো ছুটো পয়সা ধরে দিচ্ছি, সাড়ে চার আনা। থালুইতে তুলে দাও পাড়ুয়ের-পো। এর বেশি আর কেউ দিচ্ছে না।

পাড়ুই-পুত্র রাজি নয়। আপনিও নাছোড়বান্দা—ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মাঝে মাঝে তাগিদ: দিয়ে দাও। দেখছ তো, পয়সা খোলামকুচি নয়। সাড়ে-চার আনার উপরে কেউ উঠবে না।

খদ্দের কেউ যে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে না, এমন নয়। আপনি সঙ্গে সঙ্গে জানান দিচ্ছেন: আমি দর করছি দাদা। সে লোক সরে পড়ে। একজনে দর করছে, সেখানে অন্য কেউ এগোবে না। হাটের এই দস্তুর।

কিন্তু মাঘ-ফাল্গুনে মেছোহাটার নীতি-নিয়ম ওলটপালট হয়ে যায়। রাত্রি যত বাড়ে অন্যদিকের হাট পাতলা, আর মেছোহাটার ভিড় ক্রমশ নিরেট হচ্ছে। এটা-ওটা বিক্রি করে পয়সাকড়ি গাঁটে পুরে এসেছে—কোমরে ফুটছে পয়সা, মেজাজ গরম, খরচ করে না ফেলা অবধি মানুষগুলোর সোয়াস্তি নেই।

কত ওই ফলুই?

আপনি একটা মানুষ যে আঠারো পয়সা দর দিয়ে ঘণ্টাখানেকের উপর ঝুলে রয়েছেন, চোখে আঙুল ঢুকিয়ে দেখালেও ওরা আমলে আনবে না। ওই যে বললাম—ধান-গুড়-কোষ্টার পয়সায় ধরা ওদের কাছে সরাখানার মতন, মানুষজন কেঁচো-পিঁপড়ে। এসা দিন নেহি

রহেগা—বর্ষার পানি পড়তে দিন না, তখন গলায় ভিন্ন রকমের স্বর বেরোবে।

পাটোয়ারি উপিনকেষ্ট বলে, হিসাবপত্তর বোঝে না, আখের ভেবে চলে না—কষ্ট তো পাবেই ওরা।

এখন কানে নিচ্ছে না, কিন্তু বর্ষাকালে এদের ভিতরের মুরুব্বিরা একবাক্যে সায় দেবে: হক কথা বলেছিলে বাবু। আমরা গরু-গাধার শামিল, মনিষ্যি নই।

উপিন অদ্বিতীয় হিসাবি পুরুষ, সেই বাবদ মুক্তকণ্ঠে তারিফ করে তার গোলা থেকে ধান বাড়ি নিয়ে যাবে। শ্রাবণ মাসে দশ খুঁচি নিচ্ছে, পৌষে নতুন ধান উঠলে পনেরো খুঁচি গোলায় তুলে দিয়ে ধানের শোধ। সে ধান মজুত থাকবে আবার তাদেরই বর্ষার দুর্দিনের জন্য।

খুঁচি মেপে ধান শোধ দেবার সময় খাতকেরা হাসতে হাসতে বলবে, আমরা তবু কখনো চিতল খাচ্ছি কখনো উপোস দিচ্ছি। হিসাবি উপিনবাবুর কুচো-চিংড়ি খেয়েই বারোমাস গেল।

উপিনবাবুর কথা থাক। এমন অনেক পাবেন। রবি মঙ্গল আর বিষ্যুৎ—এই বিশেষ তিনটে দিন হাটবার, গড়ভাঙার হাট বসে। দুপুরের 'পর থেকে কথাবার্তা: হাটে যাবে কখন? জনমজুর খাটাচ্ছেন আপনি, মজুরি নেবে হাটের দিন—হাটের ঠিক আগে, অথবা হাটখোলায় গিয়ে। তিন টাকার পোস্টাপিস আমাদের গাঁয়ে—পোস্টমাস্টার-পিওন একাধারে একটি মানুষ, মাস-মাইনে তিন টাকা। ঠিক দুপুরে ঢপাঢপ ডাকের সিল পড়বে, চিঠিপত্র সকলের আসে না—যে ক'জনের আসে, তাদের বাড়ি থেকে মানুষ ছোটে পোস্টাপিসে। হাতে হাতে চিঠি বিলি। এর পরেও ভিনগাঁয়ের যা রইল, সেই ক'খানা হাটের সময় নিয়ে যাবেন পোস্টমাস্টার।

হাটে পাওনার তাগিদ, এ-গাঁয়ের ও-গাঁয়ের মানুষের দরকারি-বেদরকারি কথাবার্তা—জমিজিরেত কেনাবেচা, বিয়েথাওয়ার সম্বন্ধ। চৌকিদারি-ট্যাক্স আদায় করতে আদায়কারী-পঞ্চায়েত টেমি জ্বেলে জলচৌকি পেতে বসে, চৌকিদার ঘুরে ঘুরে মানুষ ডাকে। গরু-ছাগল বাঁধো এবার থেকে, নয়তো খোঁয়াড়ে যাবে কিন্তু—হাটের মধ্যে কাড়া পিটিয়ে জানান দেয়। আমরা সব স্বদেশি-মীটিং করতাম হাটে হাটে কাড়া পিটিয়ে—

একবাব কি কাণ্ড হল বলি।

সেই বড় নন-কোঅপারেশনের সময়। কলেজে ইস্তফা দিয়ে গাঁয়ে এসে বসেছি। খদ্দর আর স্বদেশি কাপড় ফিরি করি, আর সভা করে বেড়াই এ-গাঁয়ে সে-গাঁয়ে। এক সভা এই গড়ভাঙা হাটখোলায়। কাড়া দিতে হবে—কিন্তু কাড়াদার খুঁজে খুঁজে পাইনে। শাকরেদ কিছু জুটেছে, তারা সঙ্গে সঙ্গে ঘুবছে, একটি তাব মধ্যে উৎসাহ ভরে কানেস্তারা চেয়ে আনল এক দোকানথেকে। নিজেই সে পিটিয়ে দিচ্ছে, যা বলবাব বলে যাও তার সঙ্গে চক্কোর দিয়ে—যে, অমুক দিন সন্ধ্যার সময় সভা, হাজির হয়ো সকলে। এদিকটা বলা হল তো চলে যাও আর খানিক এগিয়ে। কানেস্তারা পেটাও। কী হয়েছে, ব্যাপাব কী? অমুক দিন অমুক সময়ে সভা—ইত্যাদি।

পরের দিন সকালবেলা শুনি বিষম কাণ্ড—তিন গ্রামে ঘোঁট হচ্ছে। যেছোঁড়া কানেস্তারা বাজাল,সে আর কেউ নয়,খুদ রিয়াজুদ্দিন মৌলবির ছেলে। মুচিদের যে কাজ তাই কবানো হল খানদানি বাড়ির ছেলে দিয়ে। নিজে আগ বাড়িয়ে করেছে, কেউ তাকে বলেনি—কিন্তু সে সব কে শোনে? চাপাচাপি করতে ছেলেটাও ষোলআনা দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়েছে। কোনো একটা হাঙ্গামা না জমে ওঠে এই থেকে! ডাকাতে সর্বস্ব নিয়ে গেলেও থানার বাবুদের নিদ্রা ভাঙে না, তাঁরা দেখি সাইকেলে আড়াই ক্রোশ পথ ভেঙে সাঁ সাঁ করে এসে পড়লেন।

হাটখোলার আমতলায় খান দুই তিন চেয়ার পেতে যথাসময়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু লোকজন জমল না। যাঁদের বক্তৃতা দেবার কথা, দারোগা এসে পড়ায় তাঁদের একটি প্রাণীরও টিকি দেখা গেল না সভাস্থলে।

মজা-পুকুরের ভিতর দিয়ে একটা সুঁড়িপথ বাঁ-দিকে গড়ভাঙা গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে গেল। বসি একটু এই বটতলায়। একেবারে আমার নিজ অঞ্চল। রাত হচ্ছে, আরও খানিকটা রাত হোক, চুপিচুপি গিয়ে পড়ব। আমাব পিতৃপুরুষের ভিটা—জন্ম থেকে সমস্ত কিশোর বয়সটা যেখানে ধূলোমাটি লতাপাতা মাঠঘাটের মধ্যে এলোমেলো ছড়িয়েছি। রাত্রিবেলা সকল মানুষ শুয়ে পড়লে আমরা চোরের মতন ঢুকে যাব। কেউ না টের পায়। যারা ছোট ছিল, তারা সব বড় হয়ে গেছে। বাইরের মানুষ কত এসে জুটেছে—কত জনে তারা বাংলাই বোঝে না। ঠিক আমার গ্রামখানিতে বেশি না হলেও আশেপাশে সর্বত্র। নতুন রাজ্যে অচেনাদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি। ভর সন্ধ্যেবেলা আর এগোলে এখন রক্ষে আছে! কারা যায়? ঘাড় নিচু করে হন-হন করে চলেছ—কোন জায়গার মানুষ হে তোমরা?

পায়ে পায়ে আত্মপরিচয় দিতে হবে। আমার আজন্মের এই দেশভুঁইয়ের উপর। বেঁচে থেকে এর ড় লাঞ্ছনা আর কি আছে!

বসুন তবে, বসে বসে খানিক রাত করি,—সকলে ঘুমিয়ে যাক। ঘুমোবেন না গ্রামের মধ্যে প্রাচীন দুটি মানুষ—আমার দুই প্রণম্য। শশী পণ্ডিত—পাঠশালায় প্রথম যাঁর কাছে অ-আ শিখেছি। আর বনকরের দারোগা বিরিঞ্চি দত্তর স্ত্রী সৌদামিনীঠাকরুন—দত্ত-জেঠাইমা। আর একজন আছেন—বুড়ো হয়ে পড়ে দিন-রাত্রি সর্বক্ষণই ঘুমোচ্ছেন তিনি, ডেকে ডেকে জাগাতে হয়। বেশ আছেন

এই আদিত্য-দাদা মানুষটি। শান্তিতে আছেন, দেশ দু-খণ্ড হয়ে এত যে কাণ্ড হয়ে গেল, বুঝি সে কথাটাও কানে শোনেন নি।

জনহীন থমথমে রাত্রে আমার পুরানো গাঁয়ে দু-জনে একা-একা খানিক ঘুরে বেড়াব। মানুষে টের পেয়ে গেলে হবে না। ভাঙা-দালানের রোয়াকের কোণটায় বসাব আপনাকে নিয়ে। ঘাসবন ও বুনোকচুর জঙ্গল হয়েছে হয়তো, সেগুলো ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলব। সাপের খোলসও থাকতে পারে। ভয় পাবেন না—সঙ্গে মোমবাতি আছে, বাতি ধরিয়ে নেব একটা। আলোর ধারে সাপ আসে না। আমার বড় প্রিয় জায়গা সেই। পশ্চিমের চাঁদের জ্যোৎস্না তেরছা হয়ে পড়ত কাঁঠাল-ডালের ফাঁকে ফাঁকে। জ্যোৎস্নায় আর পাতায় মিলে পাটি বুনে দিয়েছে। শিয়াল ডাকে বিলের ধারে বাঁশতলায়। হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে যেত এক-একদিন, ঘুম আর আসে না। বাড়ি সুদ্ধ—হয়তো বা জগৎ সুদ্ধই ঘুমিয়ে আছে এখন। মা ঘুমোচ্ছেন। জানলার ওপারে জিতের-বাড়ির দীর্ঘব্যাপ্ত জঙ্গলের শিয়রে চাঁদ স্থির হয়ে তাকিয়ে রয়েছে। দুজনে আমরা জেগে আছি—আকাশে অতিবৃদ্ধ চাঁদ আর শয্যায় আমি, সেকালের এক শিশু।

খটখট খটখট ঘোড়া ছুটিয়ে যায় কারা? ঘনছায়া বাদামগাছের তলে হুল্লোড় চলে কিছুক্ষণ। সওয়ারের দলটা সেখান থেকে বেরিয়ে হেড়াঞ্চি-কালকাসুন্দের ঝোপ ভেঙে চালতেতলা ও মাদারতলা পার হয়ে বিলে গিয়ে নামে। শুকনো বিলের মধ্যে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে বিলপারে আসাননগরের বটতলা অবধি। তারপরেও যাবে—সে কোথায় কতদূরে শিশু কল্পনা তার হদিস পেত না। কত ঘোড়া, গোনাগণতি নেই—আমাদের দালানের পাশ দিয়ে সারারাত ধরে ছোটে খট-খট-খট। কত রাজা, কত সৈন্যসামন্ত। যতক্ষণ না আবার ঘুম এসে যায়, অবিরত অশ্বখুরের আওয়াজ শুনি।

ওই যে গড়ভাঙা—ভাঙা গড়ের নিশানা আছে গাঁয়ের ভিতরে।

অনেক কালের কথা। সেকালের গ্রামবৃদ্ধদের কাছে গল্প শুনেছিলাম। মহামানী গড়ের রাজা তাঁর অতিপ্রিয় তরুণ সেনানীকে ডেকে বললেন, ইন্দ্রনাথ, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বহর যাবে হরিহর-নদের উপর দিয়ে। তহ্শিলদারকে জানিয়ে এসো, মহারাজের উপযুক্ত ভেট যেন পাঠানো হয়। তুমি নিজে চলে যাও, এমন দায়িত্বের ব্যাপারে তোমায় ছাড়া অন্য কারো উপর ভরসা হয় না।

আমাদেব পুরানো দালানের পাশ দিয়ে ইন্দ্রনাথ চলে গিয়েছিল এমনি বুঝি ঘোড়া ছুটিয়ে।

রাজা তারপর কন্যাকে ডেকে বললেন, শুনলে কিছু?

ঘোড়ায় চড়ে তীরবেগে কে বেরিয়ে গেল?

ইন্দ্রনাথ। বামন হয়ে যে চাঁদের পানে হাত বাড়ায়। যে তোমার পাণি-প্রার্থনা করেছে।

কোথায় গেল এই রাত্রে?

যমালয়ে। তহ্শিলদার ভেট পাঠিয়ে দেবে ঠিক। কিন্তু চিঠি যে নিয়ে গেল, সে আর কোনদিন ফিরে আসবে না।

পাংশুমুখে রাজকন্যা পথের দিকে তাকাল। আমাদের গ্রাম পেরিয়ে বিল ফুঁড়ে যে পথ আসাননগরের দিকে চলে গেছে।

খটখট, খটখট·······কে তুমি?

নদী পার হবার সময় লিখন জলে পড়ে গেছে। ভেবে আর দিশা করতে পারে না। ইন্দ্রনাথ আবার গড়ে ফিরে এসেছে।

রাজা তখন পূজা-মন্দিরে। রাজকন্যা সেনানীকে হাতছানি দিয়ে ডাকল: অপেক্ষা করো। নতুন লিখন এনে দিচ্ছি বাবার কাছ থেকে।

লিখন নিয়ে এসে বলে, তহ্শিলদার নয়, সরাসরি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কাছে চলে যাবে। লিখন সেইখানে পৌঁছে দেবে, বাবা তাই বলে দিলেন।

ইন্দ্রনাথ লিখন পৌঁছে দিল। গড়ের গুপ্ত পথ জানিয়ে দিয়ে রাজ-

কন্যা প্রতাপাদিত্যকে আমন্ত্রণ করছে। ইন্দ্রনাথকে জীবনে না পেল তো এই গড়ও আর থাকবে না। হল তাই। খটখট খটখট—আমাদের পুরানো দালানের পাশ দিয়ে প্রতাপাদিত্যের দল এসে গড় গুঁড়ো-গুঁড়ো করে দিয়ে গেল। গড়ভাঙা তাই নাম।

রাত্রিবেলা গড়ের মানুষদের আজও বোধহয় আসর জমে। খিল-দেওয়া ঘরে ঘরে মানুষ অকাতরে ঘুমোয়। গোয়ালের গরু, শাখার পাখি, বনের শিয়ালের অবধি চোখ ভারী। অঞ্চলটা জুড়ে তাদের সেই সময় হাসিকৌতুক ছুটোছুটি। জঙ্গল রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। ঘুচে যায় একাল-সেকাল এ-মানুষ ও-মানুষের ব্যবধান।

॥ সতেরো ॥

রাস্তার এই তল্লাট একেবারে অন্ধকার হয়ে আছে। বিষম অন্ধকার। বিশাল বটগাছ আকাশ ঢেকে রেখেছে। দাঁড়িয়ে পড়ুন একটুখানি। আমাদের হরিতলা। গাঁয়ের সীমানায় পা দিলাম এইবারে। শুধুমাত্র বটগাছ নয়, বট-অশ্বত্থের জোড়—অন্ধকারে সেটা মালুম হচ্ছে না। অশ্বত্থ আর বট একসঙ্গে পুঁতে শাস্ত্রমতে প্রতিষ্ঠা করলে মহাপুণ্য। তাই কেউ করেছিল কোনো এক কালে। মাঝখানে আকাশ-ছোঁওয়া মূল-মহীরুহ, দুই পাশে প্রকাণ্ড দুই ডাল মাটির সমান্তরাল অনেক দূর অবধি চলে গিয়েছে। মোটা মোটা ঝুরি নেমে নির্ভর হয়েছে এই দুই ডালের। রাতে কতটা ঠাহর পাচ্ছেন জানিনে—দিনমান হলে চমক লাগত, বৃক্ষদেবতা যেন দুই দিকে দুই দীর্ঘ দৃঢ় বাহু বিস্তার করে গ্রাম রক্ষণ করছেন। কত কাল ধরে কত বর্ষা-রৌদ্র, ঝড়-ঝঞ্ঝা মাথায় নিয়ে আছেন ইনি দাঁড়িয়ে। (এই সেদিন কানে এলো, হরিগাছের প্রাচীন ডাল দু'খানার একটা ভেঙে পড়েছে। হবে তাই—ক্লান্ত বাহু ঠাকুর সরিয়ে নিলেন এত

কাল পরে। মানুষ রইল না, বাস্তু আগলে কাদের আর রক্ষা করবেন ?)

গাঁয়ের মানুষ আপদে-বিপদে এইখানে এই হরিতলায় আছড়ে এসে পড়ে। ঝরা বটপাতায় একটুকু মাটি তুলে নিয়ে যায় এখান থেকে। ফলপ্রাপ্তির আশায় আঁচল পেতে বসে থাকে কদাচিৎ কোনো মেয়ে। বাতাসে পাকা বটফল টুক করে পড়ল হয়তো আঁচলে—ব্যস, নির্ঘাৎ তার কামনা পূরবে। সম্পদের সময়েও আসে মানুষ। গাঁয়ে যত বিয়েথাওয়া হয়েছে, নতুন বর-বউ এইখানে সকলের আগে পালকি থেকে নামবে। প্রবীণ বৃক্ষদেবতা ঘনপত্র প্রশাখা দুলিয়ে সকৌতুকে তাদের আশীর্বাদ করেন। বড় জাগ্রত হরিঠাকুর—বিপুল তাঁর করুণা। যারা সাক্ষি দিতে পারত, কাউকে প্রায় খুঁজে পাবেন না। কেউ মরেছে, কেউ বা পালিয়ে গেছে। থাকলে এমন সমস্ত কাহিনী শুনতেন, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত। পথের যত ক্লান্তি, মনের যত ব্যথা-ভাবনা, প্রণামের সময় সমস্ত আমরা হরিঠাকুরের পদমূলে নামিয়ে রেখে গ্রামে ঢুকি।

ইনি ছাড়া আরও দুটি আছেন—হাজরা ও শীতলা। বিলের মধ্যে উঁচু এক ফালি খেজুরবন। তারই সীমানার উপর সাঁড়াগাছ একটি—হাজরা অর্থাৎ শিবঠাকুরের অধিষ্ঠান-বৃক্ষ। আশশ্যাওড়া ও শেয়াকুলের জঙ্গল হয়ে থাকে, ঠাকুরের কাছাকাছি এগোনো নিতান্ত দুঃসাধ্য। যায়ও না কেউ। বর্ষায় আমাদের বিল জলে ভরে গিয়ে সমুদ্র হয়ে ওঠে—সমুদ্রের মধ্যে ওই হাজরাতলা এক দ্বীপ। ডাঙা জায়গা পেয়ে বিলের যত সাপ ওইখানে তখন কিলবিল করে বেড়ায়, শামুক-ভাঙা কেউটেরা শামুক ভেঙে ভেঙে খায়। শীতকালে জল শুকিয়ে হাজরাতলার দিকে আবার মানুষের গতিগম্য হয়—দেখা যায়, এখানে-ওখানে শামুকের খোল জড়ো হয়ে আছে। খেজুররসের মরশুম তখন—গাছীরা খেজুরগাছের মাথায় একটুকু কেটে ভাঁড় ঝুলিয়ে দেয়। সকাল বিকাল গাছের মাথায় উঠে সেই সব ভাঁড়ের রস

আহরণ করে। পাঁচ দিন অন্তর নতুন আবার 'কাট' দিতে হয়। মানুষের পায়ে পায়ে হাজরাতলার জঙ্গলে সুঁড়িপথ পড়ে যায় সেই সময়টা। ব্যস, এই মাত্র। গাঁয়ের বাইরে মানুষের সংসারযাত্রার অনেক দূরে হাজরাঠাকুরের দিন ও রাত্রি নিঃসঙ্গ কাটে।

ভুলেও কেউ তাঁকে মনে করে না- যদি ঠাকুর হঠাৎ কখনো কঠিন হয়ে মনে করিয়ে না দেন। এক একবার আমাদের গাঁয়ে কিংবা বিলপারের কোন তল্লাটে মড়ক লাগে। কলেরা, বসন্ত। হাজরাতলায় সমারোহ তখন কাঁটাবন পরিপাটি সাফসাফাই হয়ে যায়। আজ এ-গাঁয়ের এক দল, কাল ও-গাঁয়ের এক দল ঢাকঢোল নিয়ে পূজা দিতে আসে। পাঁঠা পড়ে—হাড়িকাঠের গোড়া থেকে রক্তের স্রোত বিলে গড়িয়ে পড়ে। প্রসন্ন হও ঠাকুর, মহামারী সংবরণ করো।

তারপরে রোগ-পীড়া একদিন শান্ত হয়ে যায়। জঙ্গল ধীরে ধীরে এঁটে আসে আবার দেবস্থানে। বিস্মৃত ঠাকুরের তখন একাকী সাঁড়া-গাছের চূড়ায় বসে বিলের বিশুদ্ধ বায়ু-সেবন ছাড়া কাজ থাকে না। এমন কি পাথরঘাটার রাস্তায় যেতে যেতে লোকে দূর থেকে দু-হাত কপালে ঠেকিয়ে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রণামও করে না একটিবার। একেবারে ভুলে যায়।

আর আছেন শীতলা-ঠাকরুন। তিনি এক পাকুড়গাছ। তাঁর গতিক আলাদা—নাথপাড়ার ঘরগৃহস্থালীর মধ্যে মিলেমিশে রয়েছেন তিনি। মেঘা নাথের উঠানের উপরে। ছেলেপুলে খেলাধুলো করে ঠাকরুনের পায়ের গোড়ায়। দামালগুলো কাঠবিড়ালির মতো ফনফন করে উঠে যায় উপরে, পাতার আড়ালে ঘাপটি মেরে থেকে লুকোচুরি খেলে, ঝুরিতে নারকেলের গামড়া বেঁধে দোল খায়। অতি-বাচ্চারা আশেপাশে নোংরা ক্রিয়াকর্মও যে না করে, এমন নয়। সকালবেলা মেঘার মা বিল্ব-বুড়ি ফ্যানসা-ভাত রেঁধে ঠাকরুনতলায় সারবন্দি কলাপাতা পেতে ঢেলে দেয়। কত এঁটো-কাঁটা, আবর্জনা। ঠাকরুনের দৃকপাত নেই—বারোমাসের ঘরব্যাভারি

শীতলাঠাকরুন। বিশেষ করে নাথপাড়াটারই অভিভাবক যেন। কাজেকর্মে ভাবনাচিন্তায় অহরহ ঠাকরুনকে তারা ডেকে ডেকে কথা বলে, ঠাকরুনতলায় মজলিস বসায়। আর, যেমন ঐ হাজরাঠাকুরের বেলা—পাড়ার বাইরের মানুষের খোঁজ পড়বে মহামারী হাঁ করে তেড়ে আসে যখন। কলেরায় জন্য তেমন নয়, ওটা ঠিক হুদ্দার মধ্যে পড়ে না। বসন্ত হল ষোলআনা ঠাকরুনের এক্তিয়ারে। এই দেখুন, ভুল বললাম। বসন্ত নয়, ও কথা শহুরে বাবু আপনারা বলেন—মায়ের অনুগ্রহ। দোহাই মা, নাক-কান মলছি মা-জননী, তোমার অনুগ্রহ যেন না অর্শায় আমার সংসারে, আমাদের ছেলেপুলের উপর।

আর ওই কলেরা-কলেরা করিই বা কেন! ওলা-বিবি কোন অলক্ষ্য দেবস্থান থেকে উঠে আসেন জনালয়ের ভিতর। তাই ওলাওঠা। ওলা-বিবি হাজির হয়েছেন গাঁয়ে—ওরে সামাল, সকলে খুব সামাল। গাঁয়ের সীমানায় দয়াল মোড়লদের বাড়ি। বিলের মাটি তুলে ভিটে গাঁথা। বাড়ির পশ্চিমদিকটা গাঁয়ের লাগোয়া, অপর তিন দিকে বিল। পূবদিকটা তো একেবারে ধু-ধু করছে। ঠিক দুপুরবেলা ঠাহর করে দেখতে পাবেন, অনেক দূরে ছোট এক বটগাছ—এবং হাঁসমুরগির জন্য যেমন ঘর বানানো হয়, বটগাছ ঘিরে তেমনি সব ছোট্ট ছোট্ট ঘর। নজরের জোর থাকলে তবেই শুধু দেখবেন। ঘরবাড়ি কিন্তু সত্যি সত্যি ছোট নয়, কাছে গেলে মালুম হবে। গ্রামটা আসাননগর—যার নাম আগেও শুনেছেন। বিস্তর কালের বটগাছ ওটা—নানান গল্প শুনবেন ওই গাছ জড়িয়ে। এই রেঃ, গল্প বলে বসলাম—মুরুব্বিরা চটে যাবেন। কোথাকার লোক বটে হে তুমি, প্রত্যক্ষ-দেখা জিনিস—তাকে গল্প বলো? সাহস থাকে, রাতবিরেতে তুমিও গিয়ে দেখে আসতে পারো।

তিনপহর রাত্রে একদা উঠতে হল দয়াল মোড়লের বউকে। বিলের উপর বাড়ি বলে ওরা ভয়তরাসে নয়—হামেশাই উঠে থাকে এমন। পৌষমাস, ধান কেটে উঠানে গাদা দিয়ে রেখেছে—মলন-

ঝাড়ন সমস্ত বাকি। ঘোলাটে জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভরে গেছে। বউ দেখল, আসাননগরের বটতলার দিক থেকে একটা মেয়ে বিলের আ'ল বেয়ে হনহন করে গাঁয়ে উঠল। উঠানের বেড়ার পাশ দিয়ে যাচ্ছে—হুড়কোর ধারে এসে, উঠানে এলো না—চোখ তুলে একনজর কেবল চেয়ে দেখল ভিতরের দিকে। দয়ালের বউ সেই সময় মেয়েটাকে স্পষ্ট দেখল। দেখে তার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। কালোকুঁদ চেহারা, বড় বড় চোখ, কপালে মস্ত এক ফোঁটা—সাঁ করে মেয়েটা গ্রামের ভিতর ঢুকে গেল। চলার বেগে এলোচুলের বোঝা ফেঁপে ফুলে উঠেছে। আরে সর্বনাশ, ধড়াস-ধড়াস করে দয়ালের বউয়ের বুকের মধ্যে। উঠানে না নেমে এক-ছুটে ফের ঘরে ঢুকে খিল আঁটে। দয়ালের পা ধরে ঝাঁকি দেয়ঃ শুনছ—কে সর্বনাশী এলো আমাদের গাঁয়ে! হ্যাঁ গো, আমি ভুল দেখিনি। আমাদের বাড়ির দিকে একবার নজর হেনে চলে গেল।

সর্বনাশীটা কে, সকালবেলা কাউকে আর জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন হল না। বউয়ের ভাসুর যজ্ঞেশ্বরের ভেদবমি ভোররাত্রি থেকে। কাল বিকালে কেশবপুরের হাটে ক'ভাঁড় গুড় নিয়ে গিয়েছিল। ভাল দাম পাওয়ায় মনের স্ফুর্তিতে বড়-বড় সাগর-কাঁকড়া কিনে ফিরেছে রাত দুপুরে। সেই কাঁকড়া, এবং উঠানের মাচানে লাউ ফলে আছে—লাউ-কাঁকড়া পাকশাক হয়ে খাওয়াদাওয়া সেরে সুস্থ মানুষ ঘুমিয়েছিল। কিন্তু ওই মেয়েটা দেখা দেবার পরক্ষণেই বাইরে যেতে হল যজ্ঞেশ্বরকে। সকাল হল, রোগির হাতে-পায়ে খিল ধরে আসে। অটল ডাক্তার এসে কালকের গুড়-বিক্রির দরুন যে টাকা অবশিষ্ট ছিল সমস্ত বাজিয়ে পকেটে ভরে ইনজেকশান দিয়ে গেলেন, যজ্ঞেশ্বরও চোখ বুজল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। বাড়িতে এদিকে আরও তিনটিকে ধরেছে। এবং পাড়ার মধ্যেও বহুজনের পেট কামড়াচ্ছে। দিনটা মঙ্গলবার। শনি-মঙ্গলবারের মড়া একলা যায় না, দোসর খুঁজে নেয়, ইতি শাস্ত্রবাক্য। আর যজ্ঞেশ্বর যে-রকম

পাথুরে জোয়ান, সে যে একটি মাত্র দোসর নিয়েই ক্ষান্ত হবে এমন মনে হয় না।

সমারোহ পড়ে গেল। আমাদের অটল ডাক্তারের পোয়া-বারো। সকাল থেকে রাত-দুপুর অবধি স্যালাইন ইনজেকশান চালিয়ে যাচ্ছেন। বোতলের অষুধ কোথায় আর মিলবে—পাঁচ-সাত সের করকচ-নুন কিনে কলসির জলে ভিজিয়ে রেখেছেন। সেই পাইকারি অষুধ চলছে। বেলকাটির মাতব্বররা একদল গুণীন আমদানি করেছেন কোন তল্লাট থেকে। গলায় এককাঁড়ি পুঁতির মালা—পরনে কালো আলখাল্লা। নিশিরাত্রে তাঁরা এগাঁয়ে-ওগাঁয়ে চক্কোর দিয়ে ফেরেন, বিকট চিৎকার করে ওঠেন ক্ষণে ক্ষণে। ছেলেপুলে ঘুমের ভিতর ডুকরে কেঁদে ওঠে। মানুষজনের কিন্তু বড় ভরসা। হাঁ, টহল দিয়ে ফিরছেন পাহারার দল, ভয় নেই। কিছু না হোক, ওঁদের ঐ তাড়া খেয়েই ওলা-বিবি পালাবার দিশা পাবেন না।

আর আমরা গ্রামের মানুষ সন্ধ্যারাত্রে আর এক কাজ সেরে এসেছি। নগর-কীর্তন। গ্রাম বেড় দিয়ে নিই প্রথমটা, তারপরে ভিতরে সেঁধুই। চীনাটোলার কারিগর-বাড়ি জোর তাগিদ দিয়ে ছেঁড়া-খোল নতুন করে ছেয়ে আনা হয়েছে। প্রমথ-দা মূল-গায়েন। সাধারণ অবস্থায় তিনি পোস্টমাস্টার, একটা ছিটমহালের তহশিলদার এবং সময়বিশেষে ডাক্তার। যখন মহামারী লাগে, সেই ক-টা দিন গায়কও। গলার ভিতরে, চিরকাল দেখে আসছি, সেই এক সুর। এবং গানও একটি মাত্র :

বল্ মাধাই, মধুর স্বরে
হরিনাম বিনে কি ধন আছে সংসারে।
ও নাম নারদ ঋষি দিবানিশি
বীণাযন্ত্রে গান করে।

গান গেয়ে গেয়ে পাক দিয়ে বেড়াই। ক্ষণে ক্ষণে ভাবাবেগ উদ্দাম হয়ে ওঠে। এ-ওর হাত ধরে ধেই-ধেই নাচি, গানের একটা কলি

বারবার মুখে মুখে ঘোরে—'হরিনাম বিনে কি ধন আছে সংসারে, হরিনাম বিনে···· ·।' নগর-কীর্তন শেষ করে বসা হল কারো উঠানে। গৃহস্থ আগেভাগে নিমন্ত্রণ করে রেখেছে। আরও কিছু গাওনার পর হরির-লুঠ—হরি-হরি বলো। বাতাসা ছড়িয়ে দেয়, কাড়াকাড়ি করে ধরো। মাথায় দাও একটুখানি ভেঙে, মুখে দাও। আর যা রইল বাড়ি নিয়ে যাও পরিজনদেব জন্য। ওদিকে কলার চিলতেয় প্রসাদ দিচ্ছে সকলের হাতে হাতে। ভিজানো ছোলা, মুগের অঙ্কুর, আখের কুচি, নাবকেলের নাড়ু। এবং ভোগের বাতাসা তো আছেই। সেদিনের মতন চুকল এইখানে, হরি-হরি বলো!

আমরা ঘরে চললাম। হয়তো বা ঠিক সেই মুহূর্তে- নিঃশব্দ নিশীথিনীর বুক চিরে বিলেব দিক থেকে চিৎকারঃ বলো হরি, হরিবোল! গা শিরশির করে উঠবে আপনার। ওলা-দেবী বিল-পারেও। বিলপারে মাহিষ্যদের পাড়ার কেউ সরেছেন, শব নিয়ে জ্ঞাতিবন্ধুরা বিল পাড়ি দিয়ে রামভদ্রপুরের শ্মশানে আসছে।

এমনি চলে প্রতি রাত্রে। চাঁদা উঠছে, গাঁওঠিপূজো। ভারি জাঁকজমকের পূজো—ঢাকঢোল বাজবে, পাঁঠা পড়বে গ্রামের তিন দেবস্থানেই। সেকালের শিশু আমরা ভাবতাম, ওলা ও শীতলার অনুগ্রহ প্রতি বছরই আসে না কেন, তবে তো মজা করে পূজো দেখা যায়, মিষ্টিমিঠাই ও মহাপ্রসাদে খাওয়াটা গুরুতর রকমের হয় সেই দিনটা। শুধুমাত্র শিশুরা নই, প্রবীণদের ভিতরেও একজন ছিলেন—ইতিপূর্বে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে হিমচাদ-কাকার বাড়ি গৌরীর বিয়ের সময়ে। সাতেশ্বর-দা। নিরম্বু উপবাসী থেকে অন্য সবাই ভোর থেকে হরিতলায় হাজির হয়ে পূজোর ব্যাপারে ছুটোছুটি করছে, সীতেশ্বর অনেক বেলায় উঠে চা খেয়ে পান চিবোতে চিবোতে চাষী-পাড়ায় পেঁয়াজের যোগাড়ে বেরুলেন। পেঁয়াজ কুচিয়ে মশলা বেঁটে তৈরি হয়ে থাকতে বলেছেন বউকে। দুপুরের আহারের পর দিবানিদ্রা দিচ্ছিলেন, বলির বাজনা শুনে তড়াক করে উঠে ছুটলেন হরিতলায়।

নন্দ, তুমি এদিকটা এসো। ছাল ছাড়িয়ে কেটে-কুটে মহাপ্রসাদ সকাল সকাল বাঁটোয়ারা করে দিই। দেরি হলে মাল খারাপ হয়ে যাবে। মহামারীর দিনে বাসিপচা খাওয়া ঠিক হবে না।

প্রবীণেরা তাকিয়ে পড়েন সীতেশ্বরের দিকে। বলে কি নাস্তিকটা, প্রসাদবস্তু আবার বাসিপচা হয় নাকি?

সীতেশ্বর লজ্জা না পেয়ে দৃঢ়কণ্ঠে আবার বলেন, বাসি জিনিস কেউ খাবে না এ-সময়টা। পূজোর প্রসাদ হলেও নয়।

বিলপারের মানুষরা আর-এক ধরনের পূজা করে গেল হাজরা-তলায়। তাই নিয়ে দাঙ্গা হবার জোগাড়। অতিশয় গোপন পূজা —কাকপক্ষীতে জানবে না ক্রিয়া সমাধা হবার আগে। টের পেলে কিছুতে হতে দেবে না। এমনিতেই সন্দেহ করে রাত্রিবেলা হাজরা-তলায় পাহারা বসানো হয়েছে। তারই মধ্যে কোনো এক বেসামাল মুহূর্তে কাজ সেরে তারা চলে গেল।

সেই রহস্যময় গোপন-পূজার মানুষরা পুরুত পাঁঠা ও আর দশটা উপকরণ নিয়ে ঝোপজঙ্গলে কোথায় গা-ঢাকা দিয়ে ছিল। পাঁঠার মুখ-বাঁধা—ডেকে উঠে মানুষকে জানান না দিতে পারে। নজর তাদের হাজরাতলার দিকে—চর গিয়ে ক্ষণে-ক্ষণে খবরাখবর নিয়ে আসছে, পাহারার অবস্থা কি এখন। তার পরে ফাঁক বুঝে পুরুতঠাকুর টুক করে পূজায় বসলেন। লাঠি-শড়কি নিয়ে মরদরা এদিক-ওদিক ঘুরছে, পূজা পণ্ড করতে এলে এ-সময়টা তারাও রেহাই করবে না। কী রকম মন্ত্রতন্ত্র, কী সমস্ত প্রক্রিয়া, কিছু আমার জানা নেই। শেষ অনুষ্ঠানটা হল, পাঁঠার গলার খানিকটা কেটে কোন-এক গাঁয়ের পথে নিয়ে ছেড়ে দেয়। উৎকট আওয়াজ ছাড়তে ছাড়তে পাঁঠা ছোটে। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ে পথের উপরে, ছুটতে ছুটতে এক জায়গায় মুখ থুবড়ে পড়ে বলির পাঁঠা। ওলা-বিবি বিদায় হয়ে যান পাঁঠার রক্ত-চিহ্ন ধরে, পাঁঠা যেখানটা মরেছে সেই জায়গায় চেপে বসে

সেই তল্লাটে অনুগ্রহ বিতরণ শুরু করেন। পূজাওয়ালারা পাঁঠা ছেড়ে দিয়েই চোঁচা-দৌড় দিয়েছে বিল ভেঙে। কাজ তবু চাপা থাকে না। এর পরে বিলপারের মানুষ অনেক দিন আমাদের গাঁয়ে ওঠে না পিটুনি খাবার ভয়ে।

॥ আঠারো ॥

আমার গাঁয়ের নামটা খেয়াল আছে তো? ডোঙাঘাটা।

কোন ইতিহাস নেই। এমন কিছু শোভা-সৌন্দর্যও নেই যে আহা-ওহো করবেন ছুটো-চারটে দিন গাঁয়ে বসে। লোকবিরল—সামান্য পঁচিশ-ত্রিশ ঘর বসতি। গরিব আর মধ্যবিত্ত। বড়লোকও কেউ কেউ হয়েছেন—গ্রাম ছেড়ে চলে গেছেন তাঁরা অনেক কাল আগে। কাছাকাছি জাঁকালো বড় গ্রাম—তাদের সঙ্গে টক্কর দিতে গিয়ে ডোঙাঘাটার মানুষ সেই সব বড়-চাকরে ও বড়লোকের নাম ধরে ধরে জাঁক করে। গ্রামের ছেলেরা তাঁদের চোখে দেখেনি, দেখবার সম্ভাবনাও নেই কোনদিন। কয়েকটি মাত্র নাম জানা—পাল্লাপাল্লির মুখে নামতা পড়বার মতো গড়গড় করে সেই নামগুলো বলে যায়।

সুন্দরবন অনেকটা দূর—এক জেলার পার। কিন্তু এক সময় নাকি বাদাবন এই অবধি ছিল। সেটা বিশ্বাস করি। পুকুর কাটলে বড় বড় সুঁদুরিগাছের গোড়া বেরোয়। শীতকালে ফি-বছর পশ্চিমি মাটি-কাটারা আসে—তাদের রান্নার কাঠকুটো মাটির নিচে থেকেই হয়ে যায়। অতি ছোট্ট গ্রাম, তার আবার বারোআনাই বিল। বিলের নানান চেহারা। প্রথম-বর্ষায় জল থই থই করছে—তারই মাস খানেকের মধ্যে দেখবেন মেঘের মতো কালো ধানবনে দিগন্ত অবধি ঢেকে গেছে, একটুকু জল নজরে আসে না। কালো ধানবন সোনার বরণ হয়ে যায় ধীরে ধীরে। এবং আরো ক-মাস পরে ধান-

কাটা হয়ে গিয়ে শূন্য বিল খা-খা করে। শুকনো ধানের গোড়ায় আগুন ধরিয়ে দেয়, মাটির সঙ্গে ছাই মিশে আগামী ফসল জোরদার হবে। রাত্রিবেলা ফাঁকা বিলে হু-হু করে হাওয়া বয়। আমাদের বাইরের উঠানের নিচেই বিল—বিলে তাকিয়ে সেই কয়েক মাস আগুন দেখবেন রাত্রিবেলা। তেজি ঘোড়া ছুটতে ছুটতে তড়াক করে আকাশে ওঠে আর ভূঁয়ে পড়ে, আগুনের গতি ঠিক তেমনি। দেখবেন, লাল-ঘোড়া দাবড়ে অগণ্য অশরীরী সারা বিল ছুটোছুটি করছে।

বিলের একেবারে নাবালে বারোমাস জল জমে থাকে, চোত্তের বড় খরার সময়ও খটখটে হয় না। আগুন সেদিকেও—একবার জ্বলছে, একবার নিভছে। আলচোরা—সাধু কথায় আলেয়া বলেন আপনারা। দেখেছেন কাছেপিঠে গিয়ে? কি করে দেখবেন, কাছে গেলে তো ফিরতে দেবে না। দেখিনি আমিও। কিন্তু রমণী দাসী গূঢ় রহস্য বলেছিল ' ক শীতের সন্ধ্যায় উঠানে আগুন পোহাতে পোহাতে। তখন আমি ছেলেমানুষ। রমণী দাসীর চেয়ে কেউ আপনারা বেশি জানেন না। মেয়েমানুষ হলেও যাবতায় বিল-খাল মাঠ-ঘাট তার পায়ের তলায়; কিছু গুণজ্ঞানও জানে। খোলা হাঁড়ির তলার মতন কালো, অতিকায় হাঁড়ার মতন গোলাকার ওই সব আলচোরা। অপদেবতা এক রকমের। গড়িয়ে গড়িয়ে চলে। মুখ মেলে হাঁ করে, আর লক-লক করে জঠরের আগুন বেরিয়ে আসে। মুখ বন্ধ করলে আগুন আর নেই। রাত্রির বিলে কোন পথিক পথ হারিয়েছে—খানিকটা দূরে আলো দেখে মনে করে, লণ্ঠন নিয়ে মানুষ যাচ্ছে। ডাকতে ডাকতে ছোটে সেই দিকে। গিয়ে দেখে, এদিকটা নয় তো—ওইদিকে। ছোটে আবার সেদিকে। আতঙ্কে আর ছুটোছুটির ক্লান্তিতে মুখ থুবড়ে পড়ে জলকাদার মধ্যে। চতুর্দিক থেকে অন্ধকার-গোলকের মতন আলচোরারা গড়িয়ে গড়িয়ে ঘিরে আসে। চেপে পড়ে মন্দভাগ্য মানুষটার উপর। খুদ রমণী দাসীর বর্ণনা—আপনারা আলাদা একটা-কিছু বললে মানব?

পাঁচ-ছয় মাস আমাদের বিলে ডোঙার চলাচল। মানুষ দেখতে পাবেন না, লম্বা লাইন ধরে ধানের পাতা আন্দোলিত হতে হতে যাচ্ছে। ধ্বজির মাথা উঁচু হয়ে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। হঠাৎ বা কাঠের সঙ্গে ধ্বজির ঠকঠকানি উঠল। ধানবনের ভিতর দিয়ে সাঁ-সাঁ করে কত ডোঙা এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে। তালের ডোঙা—হাজার হাজার। তাল-খেজুর-নারকেল আমাদের এ তল্লাটে অজস্র। মাঝবিলে দাঁড়িয়ে দেখতে পাবেন, আকাশে মাথা তুলে তাল-নারকেল চতুর্দিকের গ্রামের সীমানা পাহারা দিচ্ছে। গোড়া-সমেত একটা তালগাছ উপড়ে সাত-আট হাত অবধি ভিতরের শাঁস তুলে ফেলে দিয়ে ডোঙা বানায়। ডোঙাই প্রধান বাহন আষাঢ় থেকে অঘ্রাণ-পৌষ অবধি। হাটবেসাতি ডোঙায় বয়ে আনে, ধান কাটতে আর মাছ ধরতে ডোঙা, কুটুম্ববাড়ি যাবে ডোঙায়। পৌষের পর ডোঙা পুকুরে কিংবা বিলের কোন কূয়ার জলে ডুবিয়ে রাখে। নয়তো ফেটে চৌচির হবে চোত-বোশেখের কড়া রোদে।

আমাদের ডোঙাঘাটায় ডাঙা আর জলরাজ্যের যোগাযোগ। বিলের মাঝে মাঝে দ্বীপের মতন জনালয় ছড়ানো। সেখান থেকে ডাঙারাজ্যে যেতে হলে প্রথম আসবেন ডোঙাঘাটায়। এখানে এসে গরুর-গাড়ি ভাড়া করুন, পায়েও হাঁটতে পারেন ফকির-রাস্তা ধরে। মোটর-বাস ধরুন। টিকিট কেটে উঠে পড়ুন রেলগাড়িতে। চলে যান কাঁহা-কাঁহা মুলুক—আর কি, দুনিয়ার মানুষ হয়ে পড়েছেন এবারে। গাঁয়ের যাঁরা এযাবৎ বাইরে গেছেন, বাইরে গিয়ে বড় হয়েছেন, এই পথে ঠিক এমনি কায়দায় বেরিয়েছিলেন তাঁরা।

অনভিজাত গ্রাম। গরব করে দুটো কথা বলব, এমন কিছু খুঁজে পাইনে। অট্টালিকা দীঘি দেবমন্দির কিছু নেই। মানুষ ক'টা আঙুলে গণে বলা যায়। পোষা গরুগুলোও, এমন কি, নাম-সমেত বলতে পারতাম সেকালে। জলাজায়গা পড়ে ছিল—এখনকার মতোই ডোঙা বেয়ে এসে নানা অঞ্চলের মানুষ নামত। ডোঙা রেখে

কাজকর্মে যেত। সেই ডোঙার ঘাট এবং আশেপাশের খানিকটা জায়গা নিয়ে গাঁয়ের পত্তন। সুন্দরবনের জঙ্গল কেটে বাঘ তাড়িয়ে যারা সোনা ফলায়, তাদেরই কয়েক ঘর বসতি করল এখানে। গাঁয়ের আদি বাসিন্দা। নোনাঅঞ্চলে মিঠা জলের পুকুর কাটল। গাছপালা আর্জাল। কিন্তু জল আচরণীয় নয়। এখনো আছে তারা আলাদা এক পাড়ার মধ্যে। ভদ্রলোকদের প্রজা হয়ে তাদের জমি চষে তাদের বাড়ি জন-কিষাণ দিয়ে দিন কাটাত। দেশ ভাগ হয়ে ভদ্র-পাড়ার প্রায় সব চলে গেছে, তাদেরও গেছে অনেকে। চাষী-ভদ্র রাতের অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে সীমান্তে এসে দাঁড়াল ওপারে পাড়ি দেওয়ার প্রত্যাশায়। এক নিঃশব্দ-বিপ্লব হয়ে গেছে—মোটামুটি এখন সব একাকার।

বিলের ধারে ধারে চাষী মানুষের ঘর। বর্ষায় বিলের সাপ ডাঙায় উঠে কিলবিল করে। সাপের কামড়ে কত মরে গোনাগণতি নেই। রাত্রিবেলা বিছানায় ঘুমিয়ে আছেন—আহা-উহু করে চেঁচিয়ে উঠলেন। সোরগোল উঠল পাড়ার মধ্যে, লোক জমে গেল। বিলের মধ্যে কেউ যদি থাকে, লণ্ঠনের আলোর ছুটোছুটি দেখে বুঝতে পারছে কাণ্ড ঘটেছে একখানা। গড়ভাঙা-পাথরঘাটা-বাঁটাবিলা থেকে ওঝা-গুণীন ছুটতে ছুটতে এলো। বিলপারের হন্যে-আসাননগর থেকেও ছুটেছে। এই এক নিয়ম—গুণজ্ঞান যদি আপনার কিছু জানা থাকে, কাটিঘায়ের খবর কানে গেলে ঝটিতি সেখানে ছুটতে হবে। এবং পয়সা নিতে পারবেন না—তবু দিনের কাজকর্ম ও রাতের বিশ্রাম ছেড়ে জলকাদা জঙ্গলজাঙাল ভেঙে গিয়ে পড়বেন। নয়তো মা-মনসার কোপে পড়ে যাবেন। এইজন্য গুণীন মানুষ বুড়ো-অশক্ত হয়ে পড়লে একটা ছাগল ধরে মন্ত্রগুলো কানে বলে দেয়। মন্ত্র নিবীর্য হয় এই প্রক্রিয়ায়, গুণীন রেহাই পেয়ে যায় ছুটোছুটির দায়িত্ব থেকে।

মা-মনসার সত্যি সত্যি যদি আক্রোশ থাকে, ওঝা-গুণীন যতই করুন বিষ সাহায্য হবে না। নীলবর্ণ হয়ে আসবে রোগি, নাড়ি পাওয়া

যাবে না। কাটিঘায়ের মড়া পোড়াতে নেই, স্রোতোহীন রামভদ্রপুরের শ্মশানে রেখে এল। যেমন-তেমন ভাবে ফেলে এলে শিয়াল-শকুনে ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে, তাই দামের নিচে কাদার মধ্যে বাঁশের কাপা দিয়ে আটকে রেখে এল শ্মশানবন্ধুরা। কাপা বোঝেন তো—আস্ত বাঁশের মাথার দিকটা চিরে চিমটার মতো বানানো। এমনি পাঁচ-সাতটা কাপা মৃতদেহের নানান জায়গায় ঢুকিয়ে কাদার মধ্যে চেপে বসাল। কিন্তু শিয়ালগুলো ভারি শয়তান। জলে নেমে গিয়ে, দেখতে পাবেন, কাপার বন্ধন থেকে মড়া তুলে নিয়ে এসেছে।

কাটিঘায়ে লোক মরেছে,—তাব আত্মীয়জনে প্রত্যাশা করে, দেবীর দয়া হলে মড়া পুনর্জীবন পাবে। লখিন্দর পেয়েছিল—বেহুলার ভাসানে আছে। সাপ যেমন ধর্ম বিচার কবে কামড়ায় না, ভাসানের দলেও তেমনি হিন্দু আছে মুসলমান আছে—কোন জাতেব উঠানে পালা হবার বাধা নেই। লখিন্দর বেঁচে উঠেছিল তো আমার মানুষই বা বাঁচবে না কেন? একালের প্রত্যক্ষ প্রমাণও আছে। পুঁটুবাবু (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বড়ভাই) ডাকসাঁইটে গুণীন—তিনিই প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছেন সুন্দরবনে সাপে-কামড়ানো অনেক মড়ার।

দেবস্থানে কিংবা কোন এক গাছতলায় হঠাৎ দেখবেন, নতুন সরার উপব খোসা-ছাড়ানো পাকাকলা একটি। দুধও ছিল। আপনারা বলবেন, বেজি বা অন্য কোনো জীবে খেয়ে গেছে। এ হল নাস্তিকের কথা। দেবী মনসার নামে দুধ-কলা, তিনিই চুপিসারে পান করে পরিতুষ্ট হয়ে চলে যান। যারা ভোগ দিয়েছে, তাদের বাড়ি থেকে দেবীর কোপে পড়বার আপাতত আর শঙ্কা রইল না।

॥ উনিশ ॥

কিন্তু যা হচ্ছিল, এই গ্রাম পত্তনের কথা। প্রথম আমলের বাসিন্দা অনেকে বিলের ধারে পাড়া বানিয়ে আছে—সেই গোড়ার আমলেও ঠিক ওই জায়গায় ছিল তারা। এক দুপুরে এক ব্রাহ্মণ ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লেন। বড় ক্লান্ত, এসে জল খেতে চাইলেন।

এদের মুখ শুকাল। জবাব দিতে পারে না। ব্রাহ্মণকে জল দিয়ে পাপের ভাগী হবে কেমন করে? আবার তৃষ্ণার্তের মুখের উপর না-ও তো বলা যায় না। বিপদে পড়ে গোঁসাইয়ের কাছে খবর পাঠাল। গোঁসাই হল নালু সর্দার, গ্রামের মাতব্বর। জমাজমি বিস্তর, মা বউ আর নিজে তিনজনকে নিয়ে সংসার—ভোগের মানুষ নেই। সেজন্য ধর্মকর্মে ঝুঁকেছে। গোঁসাই নাম দিয়ে গ্রামের সবাই তার খোশামুদি করে।

উপায় করো একটা গোঁসাই—

একটুখানি ভেবে নিয়ে নালু খুড়তুতভাই কেতু সর্দারের দিকে চেয়ে ইশারা করল। নারকেলগাছে উঠে কেতু ডাব পাড়ল এককাঁদি, ঘর থেকে দা এনে রাখল।

নালু বলে, ডাব খান ঠাকুরমশায়। নিজ হাতে কেটে নিন।

ব্রাহ্মণ নালু সর্দারের দিকে তাকিয়ে দেখলেন একবার। অবস্থা বুঝলেন। গোটা দুই-তিন ডাবের জল খেয়ে তৃষ্ণা দূর করলেন তিনি। তারপর চাদর বিছিয়ে গামছাখানা বিড়ের মতো পাকিয়ে মাথার নিচে দিয়ে বটতলার ঠাণ্ডায় শুয়ে পড়লেন।

লম্বা এক ঘুম। বেলা পড়ে এল, ঘুম ভেঙে আরক্ত চোখে তিনি উঠে বসলেন। নালু সর্দার ছোঁয়া বাঁচিয়ে গরুড় পক্ষীর মতো আড়ষ্ট-ভাবে বসে আছে। বোধকরি তখন থেকেই আছে একভাবে—নাইতে খেতে যায় নি।

এ কি, বসে রয়েছ কেন? বাড়ি যাও। আমিও রওনা হয়ে পড়ি এবারে।

ছিচরণে একটা নিবেদন আছে ঠাকুরমশায়।

ভক্তিযুক্ত ভাবে নালু সর্দার ভূমিকা করে। ব্রাহ্মণ গামছা দিয়ে পুঁটুলি বাঁধছেন, এবং উৎকর্ণ হয়ে আছেন। প্রস্তাব শুনে ক্ষিপ্ত হলেন: যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! ব্যাসডাঙার চক্রবর্তী আমরা— অনাচারী ম্লেচ্ছগ্রামে এসে ঘর তুলতে বলিস?

নালু কাতর হয়ে বলে, আচারবিচার কি করে শিখব ঠাকুরমশায়, আপনাদের চরণধুলো যদি না পড়ে?

এবং প্রস্তাবের উপসংহার-ভাগ শোনার পরে চক্রবর্তীমশায়ও এক কথায় আর নাকচ করে দিতে পারেন না। আর একদিন এসে কথাবার্তা বলবেন, বলে আশ্বাস দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

কথা রাখলেন তিনি। এবারে এলেন তীর্থবাসী দত্ত নামক এক পাটোয়ারি ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে। বৈষয়িক ব্যাপাব এককথায় ফয়শালা হয় না। ধান-জমি এবং ডাঙা-জমি যা দিতে চাচ্ছে, সেগুলো চোখে দেখারও প্রয়োজন। দান-বিক্রির উপযুক্ত স্বত্বে স্বত্ববান কিনা কাগজপত্র দেখে বিচার করে বুঝে নিতে হবে। এ সমস্ত একদিনের ব্যাপার নয়। দত্তমশায় রয়ে গেলেন গোঁসাইয়ের বাড়ি। গোয়াল-ঘরে রান্নাবান্না করেন, দাওয়ায় শোন। ব্যাসডাঙার চক্রবর্তী তখনো দোমনা—তীর্থবাসীকে রেখে ফিরে গেলেন তিনি। বিলের জমিতে তখন বিস্তর ফলন, বিলের মাছ অজস্র। এ গাঁয়ের মানুষের আর যাই হোক, ধান আর মাছের অভাব হবে না কোনদিন। কিছুদিন পরে শোনা গেল, বাড়ির লাগোয়া উৎকৃষ্ট ডাঙা-জমিগুলো এবং তিরিশ বিঘে ধানজমি নালু সর্দার দত্তমশায়কে লিখে-পড়ে দিয়েছে।

তখন একদিন চক্রবর্তী যেচে এসে পড়লেন: কায়েত একঘর এসে গেছে, এবারে আমার আসতে বাধা নেই। কিন্তু ভাল ডাঙা-জমি কোথায় আর?

গোঁসাই আমকাঁঠালের চারা পুঁতে ফলের বাগান করছিল, পরম পুলকে সেটা ব্রাহ্মণকে দিয়ে দিল।

তীর্থবাসীও ওদিকে বলছেন, বালির দত্ত—কায়েতের মধ্যে সবচেয়ে মানী ঘর আমরা। সমাজ-সামাজিকতা না থাকলে কদ্দিন এ-গাঁয়ে টিকতে পারব? আমার জামাই-ভাগনে ক'জন নিয়ে আসি এবার—ভিটের জমি আরও কিছু লাগবে। আর বিলের কিছু ধানজমি।

গাঁয়ে ভদ্রমানুষ এনে তুলে দায়িত্ব পড়ে গেছে, রাজি হতে হল গোঁসাইকে।

জামাই-ভাগনেদের আসা শুরু হয়ে গেল। এক দফা দু-দফায় শেষ নয়—আসছে তো আসছেই। কত ভাগনে কত জামাই রে বাপু! ভদ্রপাড়া জেঁকে উঠল গ্রামের অর্ধেক জুড়ে।

গোঁসাই বুড়ো হয়ে পড়ল। মা অনেক দিন গত হয়েছে—বুড়োবুড়ি দু-জন এখন তারা। আর একপাল কিষাণ-মাহিন্দার। বাড়ির পাশে তীর্থবাসী দত্তকে বসত করিয়ে গোঁসাই নিজেও এখন ভদ্রপাড়ার বেষ্টনে পড়ে গিয়েছে—চাষী মানুষের সেখানে হাত-পা মেলে সংসার করা দায় হয়ে উঠল। কারণে অকারণে দত্তমশায়রা বাড়ির উপর চড়াও হয়ে পড়েন। সদরের আদালতগুলো বিশেষ রকমের চেনা তাঁদের—কথায় কথায় মামলার ভয় দেখান।

গোঁসাইয়ের বিরক্তি ধরে যায়। ভয়ও মনে মনেঃ কবে কোন প্যাঁচে ফেলেন বাবুমশায়রা। বুড়োবয়সে শেষটা ফাটকে যেতে না হয়। বিলের মধ্যে তখনো নালুর অনেক ধানজমি। এবং চট অর্থাৎ উঁচু ডাঙা-জমি আছে একটা। চটের পাশে একটু খালের মতো জায়গা। খালের মাটি তুলে চটের জমি আরও উঁচু করে সেখানে খান দুই-তিন ঘর তুলে ফেলল নালু গোঁসাই। পরমায়ুর যে ক'টা দিন বাকি আছে, ভদ্রসঙ্গ এবং বাস্তুভিটা ছেড়ে মাঝবিলেই থাকবে। সুবিধাও আছে—ধানজমিগুলো একেবারে চোখের উপরে, বুড়োবয়সে ছুটোছুটি করে বেড়াতে হবে না।

রাস্তা ছেড়ে একটু নেমে আসুন এদিকে—বিলের কিনারে। ফাঁকা বিলের মাঝামাঝি একটা জায়গায় ঝুপসি জঙ্গল। না, অতদূর নজর যাবে না রাত্রিবেলা। নালুর-ভিটে নাম হয়ে আছে জঙ্গল-জায়গাটার। অল্প দূরে নালুর খাল। আপনি দেখছেন না—আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। চোখ দিয়ে নয়—আমার মনের নজরে।

যুগযুগান্ত পরে আমাদেরই শৈশবে নালু গোঁসাইয়ের পরিত্যক্ত ভিটায় প্রিয়নাথ নতুন করে ঘর তুলেছিল। একই সর্দারগোষ্ঠির মানুষ প্রিয়নাথ—নালুর খুড়তুতভাই কেতু সর্দারের প্রপৌত্র। সে ঘরবাড়ি প্রিয়নাথ শেষ পর্যন্ত রাখতে পারেনি। অভিশপ্ত ভিটা। ভদ্রপাড়ার অত্যাচারে বাস্তুবাড়ি ছেড়ে নালু গোঁসাই সেকালে মাঝবিলে আশ্রয় নিয়েছিল। সেই বংশেরই প্রিয়নাথ একমাত্র ছেলে বিসর্জন দিয়ে বার্ধক্যে অচল হয়ে পড়েও টিকে ছিল কোন রকমে—হায়রে হায়, তাকেও বেরোতে হল গাঁ-গ্রাম আর তাবৎ চেনা অঞ্চল ছেড়ে। সেই আপনারা যখন এক বাংলাদেশ কেটে দু-খানা করলেন।

কার মুখে যেন শুনেছিলাম, মরেছে সর্দারদের মানী মানুষটা। মরে গিয়ে প্রিয়নাথ মানে মানে বেঁচে গেছে। ঝুটো খবর। চাক্ষুষ দেখা একদিন প্রিয়নাথ সর্দারের সঙ্গে। শহরের আশেপাশে নতুন যে সব জবর-দখল কলোনি হয়েছে, তারই একটায় বসবাস। গোড়া থেকে বলি—

বেরিয়েছিলাম এক বন্ধুর খোঁজে। খুঁজে খুঁজে হয়রান। রাস্তার নাম নেই, বাড়ির নম্বর নেই। ক'টা বছর আগে জঙ্গল আর পোড়ো-মাঠ ছিল, দিনদুপুরে শিয়াল ডাকত এ সব অঞ্চলে। এখন চালে চালে বসতি।

পাড়ার মধ্যে ঢুকে জিজ্ঞাসা করি, কোন জায়গা এটা মশায়?

নেহরু-কলোনি।

কী সর্বনাশ! রাজধানী দিল্লি থেকে ঠেলতে ঠেলতে তাঁকে এই বস্তি-জায়গায় এনে ফেলেছেন?

যে মুরুব্বি মানুষটির সঙ্গে কথা হচ্ছিল, তিনি ধূর্ত হাসি হাসলেন: কত দিকে কত কলোনির পত্তন। এরা এই নাম দেয়, ওরা সেই নাম দেয়। আমরা বললাম, দাঁড়াও, নামে যখন পয়সা খরচা নেই, কঞ্জুষপনা কিসের? দিলাম জুড়ে পণ্ডিত নেহরুর নাম। এর উপরে কারা উঠতে পারে দেখি। কোন্ দারোগা বন্দুক বাগিয়ে নেহরুব কলোনি ভাঙতে আসে, তা-ও দেখব।

এইবারে আমার আসল প্রশ্ন: আচ্ছা, অজিত বেরা বলে এক ভদ্রলোক—

সঙ্গে সঙ্গে দেখি মাথা কাঁপাতে কাঁপাতে থুনথুনে বুড়ো কচুরিপানা-ভরতি ডোবার ঘাট থেকে উঠে আসছে। একনজরে চিনে ফেললাম।

তুমি এই জায়গায়?

আমার বন্ধু অজিত বেরা নয়, প্রিয়নাথ। বলি, প্রিয়নাথ, তুমিও এসে গেছ?

আপন মানুষ পেয়ে একগাল হেসে প্রিয়নাথ ধুঁকতে ধুঁকতে কাছে বসে পড়ল। বলে, আসব না? এসে বেঁচে গেছি ছোটবাবু। গোঁসাই কিন্তু পারল না, সে ওপারে পড়ে রইল। হি-হি-হি! গোঁসাইর উৎপাত নেই এখানে, দিব্যি আছি।

একেবারে গোড়া থেকে না বললে বুঝবেন না। নালুর-ভিটে আর নালুর-খালের গল্প। তখন আমার ভিন্ন এক জীবন।

দেশ-ছাড়ার ব্যাপারে সবাই হা-হুতাশ করছে, এই একটা মানুষ দেখলাম প্রিয়নাথ—তার মুখে উল্টো কথা। হেসেই খুন। শতাব্দী আগে নালু গোঁসাই মরেছে, তা সত্ত্বেও বড্ড উৎপাত জুড়েছিল নাকি সে। বর্ডার পার হয়ে এতদিনে প্রিয়নাথ নালুর হাত থেকে রক্ষা পেল।

॥ উনিশ ॥

ধান কেটে-নেওয়া আমাদের বিল দেখতে পাচ্ছেন মরুভূমির মতো। শুকনো বিল ভেঙে হাঁটতে হাঁটতে চলে যান সোজা পুবমুখো। খানিকটা বদ্ধ জল এক জায়গায়। নালুর-খাল বলতে সেই। তা-ও কি ছিল এমন? ঘরবাড়ি তোলার পর প্রিয়নাথ সর্দার ওখানে পুকুর কাটতে গিয়েছিল। কাজ শেষ হল না, সিকি আন্দাজ হয়ে পড়ে রয়েছে। সেই থেকে একেবারে জলশূন্য হয় না খাল কখনো।

এখন এই—আবার বর্ষার সময় একদিন ঘুম ভেঙে উঠে দেখবেন, আমাদের বিলের মরুভূমি সমুদ্র হয়ে গেছে। গাঁ-গ্রামের যাবতীয় জল বিলে গিয়ে জমেছে, সে জলের কূলকিনারা নেই। অগুন্তি ডোঙা। খরার দিনে এর একটি চোখে পড়েনি—পুকুর কি খানাখন্দে ডোবানো ছিল। জল দেখে বেরিয়ে পড়ে সারা বিল ছুটোছুটি লাগিয়েছে। এবারে—হাঁ, দেখুন তাকিয়ে, খাল কাকে বলে। দু-পাশে ধান রুয়ে সীমানা চিহ্নিত করে দিয়েছে—মাঝের ফাঁকাপথ ধরে খরবেগে জল বড়-গাঙে গিয়ে পড়ে। আর দশটা আজেবাজে খালের মতন নয় এখন নালুর-খাল, খালের উপর দস্তুরমতো ভাঁটার টান। জল নেমে যায় গাঙে, আর গাঙের মাছ উজানে বিলে উঠে আসে। দূর-দূরন্তরের ব্যাপারি-মহাজন আসে, কেনাবেচার মরশুম পড়ে যায় এই কয়েকটা মাস। ডোঙা তো আছেই, আবার কতজনে ডিঙি চড়েও হাটঘাট করে বেড়ায়। ঠিক যেন গাঙের পাড়ের বাসিন্দা আমরা। ডিঙি চড়ে মজা করে বাপের-বাড়ি শ্বশুরবাড়ি করে বেড়ায় এ-গাঁয়ের ও-গাঁয়ের বউঝিরা।

গাঁয়ের যত মাছুড়ে-মানুষ ঘরবাড়ি ভুলে পড়ে আছে মরগার

রাস্তার বাঁকা তালগাছ-তলায়। বাঁকা তালগাছটা বিলের সর্বঅঞ্চল থেকে নজরে পড়ে। বিলের পথিক দিক্‌ নির্ণয় করে তালগাছ দেখে, পথের হদিস পায়। সেই তালগাছের এদিকে-সেদিকে মানুষের হাট বসে গেছে। হাট বটে, কিন্তু একেবারে নিশ্চুপ। সাপে কাটলেও উঃ-আঃ—করবার জো নেই, মাছ-ধরা এমনি জিনিষ। শব্দ করলে চারের মাছ সরে যাবে। ছিপ নিয়ে সারি সারি সব বসে গেছে—টানে টানে পুঁটিমাছ। ট্যাংরা-কই-সিঙিও ওঠে। চিকন ধানচারা দেখতে দেখতে জলের উপর মাথা তুলে ঘনকালো ঝাড় বেঁধে দাঁড়াল। রাস্তার উল্টো দিকটায় ডোঙা নিয়ে মানুষজন দূর-বিলে বেরিয়ে পড়েছে। হাতে লম্বা ধ্বজি, ধ্বজি উঠছে পড়ছে। বেরিয়েছে মাছ-ধরার বন্দোবস্তে—ডোঙা নিয়ে আ'লের ধারে ধারে চারো-দোয়াড়ি পেতে বেড়ায়।

নালুর-খালের মুখে পাটা দিত বর্ষাকালে। আ আমার কপাল—কাদের কাছে কী বলছি! গিয়েছেন কখনো বিলে-খালে যে পাটা বললেই বুঝে যাবেন! বাঁশের পাতলা পাতলা বাখারি দড়ি দিয়ে বোনা—সেই বস্তু খাড়া করে পুঁতে দেয়। জল বেরিয়ে যাবে, মাছ আটকে থাকবে। জল কমলে জাল ফেলে ছেঁকে তুলবে সেই মাছ। ততদিন হাত কোলে করে বসে থাকবে কেন—পাটায় একটু-আধটু ফাঁক করে চারো-দোয়াড়ি পাতো। মাছ ভাবে পালাবার পথ। পালাতে গিয়ে চারোর মধ্যে ঢুকে পড়ে। ঢুকতে পারে দিব্যি খেলা করতে করতে, বেরোনোর পথ বন্ধ।

পাটা যেখানে দিয়েছে, তার পাশে টোং। কী মুশকিল, টোং আবার কোন বস্তু? আচ্ছা, সামনের বর্ষায় আসবেন আমাদের ডোঙাঘাটায়, কষ্টেসৃষ্টে যেমন করে পারি নিয়ে আসব—বিলে নিয়ে তখন টোং দেখিয়ে দেব। টোং কি একটা দুটো! নিঃসীম সবুজ বিল—টোংগুলো একটা এখানে একটা সেখানে ধানগাছের মাথার উপর চড়ে বসে আছে। ধরে নিন, ছোট একটুখানি মাচা—মাচার উপরে খড়ে-ছাওয়া

চাল। আলাদা দেয়াল নেই—চালই দেয়াল হয়ে দু-পাশ দিয়ে নেমে পড়েছে। ধবজি পুঁতে ডোঙা আটকাতে হবে টোঙের নিচে। বাবু-ভেয়েরা হলে সিঁড়ির ব্যবস্থা করতে হত, আমাদের সে হাঙ্গামা নেই। সুপারিগাছে ওঠার মতন খুঁটির বাঁশ বেয়ে আমরা টোঙে চড়ে বসি।

একটা বিয়ে উপলক্ষে সেবারে শ্রাবণমাসে বাড়ি এসেছি। শুভকর্ম চুকে গেল। শুনলাম, বিলে মাছের অবস্থা বড় ভাল এবার। মাধবকে বলি -(মাধবটা কে হল আবার? গ্রামের মানুষ, সর্দার-পাড়ায় ঘর। এক্ষুনি চেনাজানা করিয়ে দিচ্ছি—সবুর!)

মাধবকে বললাম, আজ রাত্রে তোমার টোঙে গিয়ে শোব। সন্ধ্যের আগেই গিয়ে পড়ব।

মতলব ধরে ফেলেছে মাধব। একগাল হেসে বলে, দালানে শোওয়ার বড় কষ্ট কিনা, তাই মাঝবিলে গিয়ে শুতে হবে।

নালুর-খালের ডাক হয় ফি বছর। এবারে মাধব ডেকে নিয়েছে। দুনিয়ার উপর মাধবের আপন কেউ নেই, তার জন্য দুঃখও কিছুমাত্র নেই, থাকলে বরঞ্চ ঝামেলা ছিল। মাছ ধরতে পারলে খুশি, ছিপ-সুতো জাল-দড়ি চারো-ঘুনসি কিছু না কিছু নিয়ে আছে সে সর্বক্ষণ। নালুর-খাল ডাকতে গেল আপন-এলাকায় সুখ করে মাছ ধরতে পারবে বলেই। ডাকতে ডাকতে ঝোঁকের মাথায় বড্ড উঠে গেল—মুনাফা পড়ে মরুক, সতর্ক না হলে ডাকের টাকাটাও উঠবে বলে ভরসা হয় না। টাকা মারা গেলে আগামী সন আবার ডাকতে পারবে না, ভয় একমাত্র এই। একটা মাছও এদিক-ওদিক না হয়—অহোরাত্র মাধব পাহারায় আছে।

বেলাবেলি এক থালা ভাত গিলে বিলে ডোঙা ভাসিয়ে দিলাম। মাধবের পাশে টোঙের উঁচুতে বসে শ্যেন-দৃষ্টিতে নিরিখ করছি, কে কোনখানে চারো পেতে যাচ্ছে।

বলবেন চুরি-বৃত্তি—মুখ বাঁকাচ্ছেন আপনি। আজ্ঞে না, চারো

থেকে চাট্টি মাছ ঝেড়ে নেওয়া কিম্বা খেজুরগাছের মাথার ভাঁড় থেকে দু-ঢোক রস পেড়ে খাওয়া—এতে চুরি হয় না আমাদের পাড়াগাঁয়ের নিয়মে। চারো ঝাড়ব না, তবে কি হরেকৃষ্ট নামজপ করতে রাত্রিবেলা বিলের টোঙে এসে উঠেছি?

টোঙে তামাকের ব্যবস্থাটা অতি উত্তম। হুঁকো-কলকে, আগুনের মালসা আর চিটেগুড়-মাখা কড়া দা-কাটা তামাক। তামাকই শুধু —আর কিছু নেই। বাখারির উপরেই টান-টান হয়ে গড়িয়ে নেওয়া যায়, অতএব বালিশ-বিছানাপত্র বাহুল্য। এবং অন্ধকার যত গাঢ় হোক, ফাঁকা বিলে ঝাপসা রকম নজর চলবেই। অতএব টেমি জেলে রোসনাই করবার কোন মানে হয় না।

ভাবতে গেলে আজও গায়ে কাঁটা দেয়। সুমুখ-আঁধার রাত্রি। এক ঝোঁক ঘুমিয়ে নিচ্ছিলাম গোড়ার দিকে। মাধব ঠায় বসে। এক সময়ে আমায় ঝাঁকানি দিয়ে চাপা গলায় বলে, ওঠ, উঠে বস। টোঙে কি ঘুমতে এসেছ? ঘুমবে তো বাড়ির দালান কোন দোষ করল?

অন্ধকার কেটে গিয়ে বিলের প্রান্তে খেজুরবনের শীর্ষে গোলাপি রঙের চাঁদ দেখা দিয়েছে। চারো ঝাড়বার সময় বোধহয় এইবার, মাধব সেই জন্যে ডাকছে। জিজ্ঞাসা করি, ডোঙায় তবে নেমে পড়ি —তুমি যাবে নাকি সঙ্গে?

মাধব হাত তুলে ফিসফিস করে বলে, চুপ!

তামাক খাবে বলে কলকেয় আগুন দিয়েছে। ঘুঁটের আগুনের উপর সাদা ছাই পড়ে নিভে আসছে, মাধব একটা টানও দেয় না। ঘুম থেকে উঠে দেখছি, হঠাৎ সে কেমন ভিন্ন মানুষ হয়ে গেছে।

বলে উঠল, নাকে গন্ধ পাও না?

সোঁদা-সোঁদা একটা গন্ধ বটে! এক ঝাপটা পূবের বাতাস এসে গন্ধ আরও প্রকট করে দিল।

মাধব বলে, ভাঙের গন্ধ। নালুর-ভিটে থেকে আসছে। এক একদিন আসে এইরকম।

খালের অল্প দূরে নালুর-ভিটে—চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। ভিটে নয়, একটু উঁচু জায়গা। বাড়াবাড়ি রকমের বর্ষা না হলে জায়গাটুকু ডোবে না। কাঠশোলার ঝোপ কাঁটা-সেজির ঝোপ, আর গোটা পাঁচ-সাত প্রাচীন খেজুরগাছ।

আর বোধহয় জঙ্গুলে ভাঙও আছে। নয়তো নিঃসীম নির্জন জলার মধ্যে রাতদুপুরে ভাঙের গন্ধ আসে কেমন করে?

মাধব বলে, কাঁচা-ভাঙে এ গন্ধ হয় না। ভাঙ কলকেয় সেজে খাচ্ছে কাঁটা-সেজির ঝোপের ভিতর বসে।

বিল-কিনারের মানুষ আমিও বটে। এমনি সব গল্প বিস্তর শোনা যায়। আজকে যখন এত কাছের ঘটনা, এ সুযোগ ছাড়া হবে না।

দেখে আসি চল মাধব। দুজনে যাই।

মাধব খিঁচিয়ে ওঠে: নড়াচড়া কোরো না, বাঁশ মচমচ না করে।

নাক-কান মলে পুনশ্চ বলে, ওঁদের জায়গায় বসে যা খুশি ওঁরা করুন গে। ভাঙ খান, গাঁজা খান—আমাদের কি, আমরা কেন দেখতে যাব? আমার নালুর-খালের এদিকে নজর না দিলেই হল।

কী করব, কাঠের পুতুলের মতো বসে আছি ভিটের দিকে অপলক তাকিয়ে। অনেকক্ষণ পরে মনে হল, দেখতে পাচ্ছি কিছু—কাঁটা-সেজির ঝোপের উপরে খানিকটা জ্যোৎস্না বুঝি জমাট বেঁধে নরমূর্তি ধারণ করল। দীর্ঘ পুরুষ, দুধের মতো সাদা দাড়ি। বিলের হাওয়ায় দাড়ি নড়ছে, এত দূর থেকেও ঠাহর পাচ্ছি। না, দেখার ভুল হতে পারে না—সত্যিই এক বুড়োমানুষ। শোলাবন তাঁর পথ আটকায় না, কাঁটাগাছ গায়ে বেঁধে না। নিশ্চিন্ত গাম্ভীর্যে আপন মনে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন নালুর-ভিটের এমুড়ো ওমুড়ো।

হাত-পা কোলে করে এরকম থাকা যায় না। টোঙের খুঁটি বেয়ে সড়াক করে ডোঙায় গিয়ে পড়লাম। চুলোয় যাকগে মাধব—আপাতত সে চেঁচামেচি করতে পারছে না। ওইখানে বসে বসে চোখ পাকাক, আর গর্জাক মনে মনে। বুড়োমানুষটিকে কাছাকাছি ভাল করে দেখতে চাই।

ধ্বজি মারি নে, ধানক্ষেতের মাঝ দিয়ে ধানের গোছা ধরে ধরে সন্তর্পণে এগোচ্ছি। জলের ছপছপানি না হয়, ডোঙার চলাচলে ধানের মাথা এতটুকু না নড়ে।

শোলাবনের ঠিক পিছনে এসে গেছি। কই, কিছুই না। জ্যোৎস্নার খানিকটা বরফের মতন জমে গিয়ে এক ধবধবে মানুষ হয়েছিল, সে মানুষ গলে আবার জ্যোৎস্না হয়ে গেছে। এতক্ষণে ধ্বজি ধরে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করি। কেউ নেই, কিন্তু ভাঙের গন্ধ বাতাসে। জায়গায় এসে পড়ে গন্ধ তীব্র হয়েছে। এইখানে অনতিপূর্বে ভাঙ টেনে গেছে, তাতে সন্দেহমাত্র নেই।

॥ কুড়ি ॥

কলকাতায় সেই যে জাপানি বোমা পড়ল, মনে আছে? শহুরে মানুষ বোমার ভয়ে হুড়মুড় করে গাঁয়ে ছুটল। আমিও এসেছি। বিল তখন আর সাগর নয়, মরুভূমি। আজকে যা দেখছেন, তা-ও নয়—আরো রুক্ষ, আরো কঠিন। বৈশাখের সারা দিনমান ধরে আকাশ থেকে আগুন ঝরে। মাটি ফেটে চৌচির। সরু সরু ডোঙার দাঁড়াগুলো অজগরের খোলসের মতো এঁকে বেঁকে পড়ে রয়েছে।

রাত্রিবেলা বিল-পার থেকে নিমন্ত্রণ খেয়ে অনেকে একসঙ্গে ফিরে আসছি। ডাঙার পথ ঘুরে ঘুরে গেছে, বিকালবেলা যাবার সময় সেই পথে ছায়ায় ছায়ায় গিয়েছিলাম। এখন, ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় অত ঘুরতে যাই কেন? বিল ভেঙে কোণাকুণি পাড়ি দিচ্ছি, অর্ধেক সময়ে পৌঁছে যাব।

মাঝামাঝি এসে অবাক। সেই যে নালুর-ভিটে—অনেক বছর আগে মাধবের সঙ্গে টোঙে রাত্রিবাস করার সময় দেখেছিলাম, দাড়িওয়ালা একজন ভাঙ খেয়ে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে—সেই

জায়গার ঝোপজঙ্গল গিয়ে বাংলাঘর চৌরিঘর চার-পাঁচখানা। দিব্যি এক গৃহস্থবাড়ি। বাস্তুজমির কার এত অকুলান পড়ল, গ্রাম ছেড়ে বিলের মধ্যে এসে ঘর বাঁধতে হয়েছে? নাম বলো দিকি মাথা-খারাপ সেই লোকটার।

প্রিয়নাথ সর্দার। (গ্রাম ছেড়ে বিলে এসেও রেহাই হল না। শেষ পর্যন্ত দেশভূঁই ছাড়তে হয়েছে। নেহরু-কলোনিতে নতুন বাস।)

মস্তবড় চাষী গৃহস্থ প্রিয়নাথ। বাড়িতে এলাহি ব্যাপার। মেয়েপুরুষ বাচ্চাবুড়োয় মানুষ কিলবিল করছে, গণে পারা যায় না। রান্নাঘরের উনুনের আগুন রাবণের চিতার মতন রাত্রিদিনের কোন সময় নেভে না।

খিটিমিটি বাধল প্রিয়নাথের বড়-ছেলে রাসবিহারীর বউ আনবার পর থেকেই। দৈত্যসম চেহারা—কিন্তু ওই একফোঁটা বউ রাসবিহারীকে গুণ করে ফেলেছে। বউয়ের কথা শুনে কোমর বেঁধে খুড়ি-জেঠিদের সঙ্গে লাগতে আসে। ঝগড়ার চোটে ঘরের চালে কাক বসতে পারে না। শেষটা একদিন রাসবিহারী 'দুত্তোর' বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে—সুবিধা মতো অন্য জায়গা না পেয়ে—বিলের মধ্যে নালুর-ভিটের উপর ঘর তুলতে লেগে গেল। বুড়ো হয়ে গিয়ে সংসারে প্রিয়নাথের কোন কথা থাকে না, ছেলে-বউর পিছন ধরে তাকেও চলে আসতে হল নতুন বাড়ি।

নিমন্ত্রণ-ফেরত আমাদের দলের সর্বাগ্রে প্রমথ-দা। তিনি দেখি ওই মুখো বাঁকছেন। নালুর-ভিটেয় প্রিয়নাথের নতুন বাড়ির দিকে।

ওখানে কেন প্রমথ-দা?

তামাক পিপাসা পেয়ে গেল। প্রিয়নাথের ক্ষেতে এ পাইতক্কের সেরা তামাক। তামাক পচিয়ে মাখেও খুব জুত করে। কাছে এসে গিয়েছি তো দুটো সুখটান দিয়ে যাই।

আমি তামাক খাইনে। এবং ছেলেছোকরার মধ্যে অনেকের অভ্যাস থাকলেও মুরুব্বিদের সামনে খাবে না। তা সত্ত্বেও কেউ আপত্তি করিনে। পরের বাড়ির খাদ্য মুখের সামনে পেয়ে ভুলে

গিয়েছিলাম উদরগুলো নিজেদের। ভরাট উদর নিয়ে বিল ভাঙতে ভাঙতে এখন সেটা নিদারুণ ভাবে মনে পড়ছে। অতএব গৃহস্থবাড়ি যখন রয়েছে, খানিকটা জিরিয়ে যাওয়া ভাল।

রাতের খাওয়া শেষ করে প্রিয়নাথ উঠানে খেজুরপাতার পাটি বিছিয়ে পা ছড়িয়ে বসেছে। এতবড় দলটা শব্দসাড়া করে নালুর-ভিটেয় উঠছি। প্রমথ-দা এক রশি আগে থাকতে হাঁক পাড়েন: কলকে ধরাও প্রিয়নাথ।

আসেন, আসেন। বসেন বাবুরা সব। রাত্তিরকালে আসা হচ্ছেন কোয়ানথে?

আরও দুটো পাটি এসে পড়ল। কেউ কেউ গড়িয়ে পড়েছে পাটির উপর। প্রমথ-দা বলেন, ভরভরন্ত গৃহস্থালী জ্ঞাতগুষ্ঠি সকলকে ছেড়ে ফাঁকার মধ্যে ঘর বেঁধেছ—কাজটা কী রকম হল যেন! একা না বোকা—হচ্ছে কবে তুমি সেই একলা হয়েছ।

রাসবিহারী এই সময় খাওয়া শেষ করে জলের ঘটি হাতে রান্নাঘর থেকে আঁচানোর জন্য বেরোল। প্রিয়নাথ কি-একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, ছেলেকে দেখে বাক্যস্ফূর্তি হয় না। আঙুল তুলে শুধু রাসবিহারীকে দেখিয়ে দিল।

যে-কথা মুখে এসে পড়েছে না বলে ফেলে প্রমথ-দা সোয়াস্তি পান না। পশ্চিমবাড়ির সেজবাবু তিনি—দুনিয়ার উপর কাকে পরোয়া করেন? বললেন, তুমি ধৃতরাষ্ট্র প্রিয়নাথ। ধৃতরাষ্ট্রের চোখ ছিল না, তুমি কিন্তু চক্ষু থেকেও অন্ধ। অপত্যস্নেহে হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়েছে। একদিন পস্তাবে, এই কথা বলে রাখলাম।

আঁচানো শেষ করে রাসবিহারী ঘরে ঢুকে গিয়েছিল। আবার দেখি কলকে ধরিয়ে টানতে টানতে আসছে। বলে, কি বলছ সেজকর্তা?

কণ্ঠস্বর বেয়াড়া রকমের। গৌয়ার বলে ছোঁড়াটার বদনাম। প্রমথ-দা ঢোক গিলে বলেন, বুকের বল না থাকলে মাঝবিলে এমন

জায়গায় ঘরবসত করা যায় না। তোমার সেটা আছে রাসবিহারী। দস্তরমতো আছে। এই সব কথা হচ্ছিল আর কি !

রাসবিহারী ক্যাট-ক্যাট করে বলে, মাঝবিলে বসত না হলে তামাক খেতে উঠতে কোথা তোমরা ?

কলকে নামিয়ে কড়ি-বাঁধা হুঁকোর উপর বসিয়ে প্রমথ-দার হাতে দিল : সেবা হোক সেজকর্তা।

প্রমথ-দা নির্বিকারভাবে হুঁকো টানতে লাগলেন। বেশ খানিকক্ষণ টেনে হুঁকো নামিয়ে উঠানের মেইকাঠে ঠেসান দিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন : যাওয়া যাক। কই গো, কী হল তোমাদের, ওঠো—

এই স্বভাব প্রমথ-দার। নিজের কাজটুকু হয়ে যাক, তুনিয়া তারপরে রসাতলে গেলেও আপত্তি নেই। তামাকের আরও তু-একজন প্রত্যাশী। একজন বলেন, দাঁড়াও হে! হুঁকো রেখে দিলে কেন, দাও ইদিকে।

রাসবিহারী বলে, টানবে কোন ছাই ? তামাক পুড়ে গিয়ে ঠিকরি অবধি আগুন হয়ে গেছে। তিল পরিমাণ থাকতে সেজকর্তা ছাড়বার মানুষ! বোসো মশায়রা, আবার সেজে এনে দিই।

প্রমথ-দা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন : সাজতে হবে না। ক'পা গিয়েই তো বাড়ি। খেতে হয় বাড়ি গিয়ে সেজে খাবে।

ভাল রে ভাল! গিরস্তবাড়ি পায়ের ধূলো পড়েছে। তামাকটুকু না খাইয়ে ছেড়ে দেব কেন ?

এগিয়ে এসে রাসবিহারী পথের মুখে দাঁড়াল। বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রমথ-দা বলেন, অ্যাঁ, গায়ের জোরে অতিথসেবা করবি নাকি রে ? কর্ তাই। আমার তো হয়ে গেছে—আমি বাবা এগোতে লাগি। ছোঁড়ারা তো তামাক খাবি নে—তোদের কাজ কি এখানে ? চলে আয়।

অর্থাৎ মুখে যতই আস্ফালন হোক, বিল পাড়ি দিয়ে একলা গ্রাম অবধি যাবার সাহস নেই। রাসবিহারীও তেমনি—একটি প্রাণীকেও

বাড়ির বার হতে দেবে না কিছু আতিথ্য না নিয়ে। তামাক না খায় তো খেজুররস খেয়ে যাবে। উঠানের খেজুরগাছে ইতিমধ্যে এক মাহিন্দার উঠে পড়েছে, রসের ভাঁড় নামিয়ে আনছে।

বড় যত্ন করল রাসবিহারী, বেরিয়ে পড়তে অনেকটা দেরি হল। প্রমথ-দা একাকী এতক্ষণ নালুর-খালের পাশে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্নার শোভা নিরীক্ষণ করছিলেন।

একটানা বছর দেড়েক সেবার গাঁয়ে ছিলাম। শান্ত গাঁ-গ্রাম—ডাকযোগে খবরের-কাগজেব মারফতে লড়াইয়ের বার্তা যৎকিঞ্চিৎ আমদানি হত। তাই নিয়ে গালগল্প চলত কিছু কিছু। এরই মধ্যে ঘরের পাশের এক চমকদার বৃত্তান্ত কানে এলো—প্রিয়নাথ সর্দার বিষম ধনী হয়ে গেছে হঠাৎ, নালুব-ভিটেয় গুপ্তধন পেয়েছে। কেউ বলে সত্যি, কেউ ব̣ [illegible] বাজে রটনা। বাসবিহারীকে প্রশ্ন করলে তেড়ে আসে, প্রিয়নাথের মুখেও কথা পাওয়া যায় না।

আমার কিন্তু খুদ প্রিয়নাথের মুখেই শোনা। ঘরবাড়ি বানাতে গিয়ে নালুর-ভিটেব [illegible]াজি ও শোলার জঙ্গল [illegible]াটল। শুধু কেটে দিলেই হবে না, ভাল করে গোড়া তুলে ফেলাব দরকার, নয়তো সামনের বর্ষায় আবার জঙ্গল ডেকে উঠবে। চাষী-মানুষ জমি ফেলে রাখবে না—কিছু রবি-খন্দ আর্জাবে বাড়ির আশপাশে। এ বছব না-ই হল তো আগামী বছর। রাসবিহারী নিজে দাঁড়কোদা· ধরে মাটি কোপাচ্ছিল। কোপাতে কোপাতে ঠকাস করে শক্ত জিনিষে কোদাল লাগে। কী না জানি বস্তুটা—চতুর্দিকের মাটি খুঁড়ে তুলে ফেলল। পিতলের ঘটি একটা, অনেককাল মাটির নিচে থেকে কালীবর্ণ হয়ে গেছে। ঘটি বোঝাই পুরানো আমলের রু.পার টাকা। এখনকার দিনে সে টাকা চলে না, কিন্তু খাঁটি রুপোর ভাল দাম আছে। কেশবপুরের রাজীব স্যাকরার সঙ্গে ব্যবস্থা হল, টাকা গলিয়ে চাঁদির দরে সে কিনে নিল সমস্ত। লাভই হল—গোনাগণতি

ন-শ সাতান্ন টাকা বিক্রি করে এখনকার টাকায় বারো-শ। ছু-চার জায়গায় ঘোরাঘুরি করলে অথবা সদর অবধি গেলে দর নিশ্চয় বেশি উঠত। কিন্তু ব্যাপারটা চাউর হতে দেওয়া যায় না। যাবতীয় পোড়ো-সম্পদের মালিক নাকি সরকার। টের পেলে সরকারে বাজেয়াপ্ত করে নিত।

রাসবিহারী মারা যাবার পর পুত্রশোকের মধ্যে প্রিয়নাথ আমায় সমস্ত খুলে বলল। চাষী-গৃহস্থ টাকা হাতে পেয়ে ফেলে রাখে না। নালুর-খালের আশপাশে ষোল বিঘে ধানজমি বন্দোবস্ত নিয়ে নিল। পৈতৃক জমিজমা শরিকদের মধ্যে বাঁটোয়ারা হয়ে গেছে, সে জমির ধান যদ্দূর আসে আসুক—এই নতুন জমি একেবারে ঘরের কাছে, একচিটে এখানে এদিক-ওদিক হবে না। বৈশাখে মনেব স্ফূর্তিতে চাষ দিল একটা। খাসা জমি, মাটিতে দিব্যি জো রয়েছে। যৎসামান্য বর্ষা পেলেই চারাপাতা এনে রুয়ে দেবে।

প্রথম চাষ দিয়ে এল, সেই রাত্রে কাণ্ড—

রাসবিহারীর মৃত্যু-সংবাদ শুনে আমি গিয়েছি তাদের মাঝবিলের বাড়িতে। উঠানে দাঁড়িয়ে প্রিয়নাথের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। প্রিয়নাথ হাত তুলে সব চেয়ে প্রাচীন দীর্ঘতম খেজুরগাছটা দেখাল: শোন ছোটবাবু, এই গাছের মতন অতখানি লম্বা, আগুনের মতো অঙ্গবর্ণ, শাদা কোষ্টার মতন ফুরফুরে দাড়ি। রাত্রিবেলা স্বপ্নে উদয় হয়ে নালু গোঁসাই বলল, আমার টাকা নিয়েছিস। ভালর তরে বলছি দিয়ে দে।

রক্তের সম্বন্ধ নালুর সঙ্গে। হেসে তাই প্রিয়নাথ ভাব জমাতে যায়: দিয়ে দেবো বুড়োদাদা, তোমার ধন মারব না। একটা ছুটো ফসল তুলতে দাও, সুদ সমেত পরিশোধ করব। আর না-ও যদি দিতে পারি—জানবে, পর-অপর নয়, আপন জনে খেয়েছে।

বুড়ো অগ্নিশর্মা: ধানাই-পানাই বুঝিনে। দিবি তো, এক্ষুনি

দে। পিতলের ঘটির মধ্যে যেমন ছিল তেমনি করে পুঁতে রেখে আয়। নয় তো রক্ষে নেই।

কিন্তু সে টাকার এক পয়সাও নেই তখন। জমি কিনে খরচ করে ফেলেছে। প্রিয়নাথ কিছু সময় চায়, গোঁসাই দেবে না। রাত্রিবেলা প্রিয়নাথ চোখ বুজেছে কি না বুজেছে, গোঁসাই তৎক্ষণাৎ চলে আসে। অতিষ্ঠ করে তুলেছে। ঘুমোতে ভয় করে প্রিয়নাথের— যতক্ষণ পারে, নানান কায়দায় চোখ মেলে থাকবার চেষ্টা করে।

ক্রমশ ঝগড়াঝাটি অকথা-কুকথা শুরু হয়ে গেল : চোব বজ্জাত! দিবি কিনা আমার টাকা, স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দে।

শেষটা প্রিয়নাথও মেজাজ হারাল : ধর্মে মতি গিয়েছিল শুনতে পাই, গোঁসাই হয়েছিলে নাকি বুড়োদাদা? এত টান টাকার উপর— ধর্ম না কচুপোড়া! মুড়োঝাঁটা মারি তোমার ধর্মের মুখে।

গোঁসাই ক্ষেপে গিয়ে একদিন মোক্ষম শাসানি দিল : তেরাত্তিরের মধ্যে টাকা শোধ না করিস তো পরিণাম দেখিয়ে দেব।

নিরুপায় প্রিয়নাথ ভয়ে ভয়ে আছে। টাকা নেই, দেয় কোথা থেকে? তারপর সত্যিই সেই পরিণাম এলো—

রাসবিহারী হাট করে ফিরেছে। রান্নাঘরের দাওয়ায় ভাত বেড়ে বউ ডাক দিল : এসো।

রাসবিহারী বলে, হাত-পা ধুয়ে আসি পুকুর-ঘাট থেকে।

নালুর-খালের সেই অর্ধেক-কাটা পুকুরে পা ধুতে যাচ্ছে, অমনি সাপে কাটল। বাপ রে, মা রে—করে ছুটে এসে রাসবিহারী উঠানে উপুড় হয়ে পড়ল। রাত্রের মধ্যেই তল্লাটের যত রোজা-গুণীন এসে পড়ে। কত রকম ঝাড়-ফুক, শিকড়-বাকড়। বিষ সাহায্য হল না। হবে কি করে? বিষ তো সাপের নয়, গোঁসাইঠাকুর কালসাপ হয়ে প্রতিশোধ নিয়ে গেছে। পরের দিন দুপুরের আগে রাসবিহারী চোখ বুঁজল।

ছেলে মরার পর থেকে প্রিয়নাথের মাথার গোলমাল। (আমায়

এই যে আজব গল্প বলল, তা-ও মাথার গোলমালের দরুন কিনা কে জানে।) আর সে বাড়ির বার হয় না। হাটেঘাটে যায় না, জমির এমন ফলন—আর জমি তো উঠানের উপর বললে হয়—তবু কোন দিন লহমার জন্যে জমির উপর গিয়ে দাঁড়ায় না। কেউ ডাকলে বলে, উঁহু, বুড়োদাদা কোন্ দিকে ওত পেতে আছে। ছেলের উপর শোধ নিয়েছে, বাগে পেলে আমাকেও নেবে।

আমি যেদিন গিয়েছিলাম—দেখি, উঠানের খেজুরতলায় বিধবা পুত্রবধূ জল তুলে এনে দিল। সেইখানে বসে বসে একটু কাক-স্নান। খালের পুকুরে যাবে না। শরীর-ধারণের যত কিছু করণীয়, সমস্ত বাড়ির চতুঃসীমার মধ্যে। বলে, ফাঁকায় গেলে আমার উপরেও ছোবল মারবে। গোঁসাই ছাড়ে নি এখনো, একটা খেয়ে রাগ যায় নি। এক এক রাত্রে এসে তাগিদ দেয়ঃ আমাব টাকা?

তবে প্রিয়নাথও এবার বলবাব কথা পেয়ে গেছেঃ ছেলে নিয়েছ বুড়োদাদা—আমার শক্তসমর্থ ছেলেটা। ছেলে ফেরত দাও, টাকা তোমার কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দিচ্ছি। চক্রবৃদ্ধি হাবে সুদ সহ শোধ করব। দাও এনে আমার বাসবিহাবীকে।

হেসে হেসে প্রিয়নাথ আমায় এই সব বলল। বলে, প্যাঁচে ফেলেছি গোঁসাইকে, কি বলেন ছোটবাবু? স্পষ্ট কথা আমাব—লুকোছাপা কিছু নেই। ফেলো কড়ি, মাখো তেল। ছেলে নিয়ে আসবে, তবেই টাকা গণে দেব। গোঁসাই তা কক্ষনো পাববে না, আমাকেও টাকা দিতে হবে না। তবু বেহায়া কী বকম। এত কথা-কথান্তরের পরেও আসে এক এক বাত্রে। এসে আমারই কাছে একগাদা গালমন্দ শুনে যায়। কায়দায় পেয়েছি, ছাড়ব কেন ছোট-বাবু? সে যত বলেছে, আমি তার ডবল তে-ডবল শুনিয়ে দিই।

প্রায় এক যুগ পরে নেহরু-কলোনিতে সেই প্রিয়নাথের সঙ্গে দেখা। মানুষটা সাহস করে ভিটের সীমানার বাইরে যেত না—দেশদেশান্তর পার

হয়ে তাকে ভিন্ন রাজ্যে ঠাঁই নিতে হয়েছে। কিন্তু অসুখী নয়—গল্প করে, আর হাসিতে ফেটে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে।

বলে, বর্ডারের উপর পোশাক-পরা মিঞা সাহেবরা ঘাঁটি আটকে রয়েছেন। একটা মাছি অবধি গলতে দেন না। শুধুমাত্র মানুষ বাদ। মানুষের অনেক বুদ্ধি, অনেক বন্দোবস্ত। মানুষ নয় বলেই তো নালু গোঁসাইয়ের পাশপোর্ট হল না। মানুষের বুদ্ধি কোথা পাবে—ব্লাকে পার হবার কায়দা-কানুন করতে পারে নি। গোঁসাই ওপারে আটকা পড়েছে, দিব্যি আছি এখন ছোটবাবু। এসে আর জ্বালাতন করে না।

॥ একুশ ॥

ফসল-ভরা ক্ষেত ভাবছেন বুঝি? উহু, দীঘি। দাম এঁটে এই অবস্থা। দামের নিচে জলও থাকতে পারে, কিন্তু জল ইদানীং বর্ষাকাল ভিন্ন চোখে পড়ে না। দিনমান হলে আরও দেখতেন, গরু-বাছুর চরে বেড়াচ্ছে দামের উপব। খাঞ্জালি-দীঘি বলে—খাঁ জাহান আলি নামে কোন এক সন্তপীর লোকের জলকষ্ট নিবারণের জন্য দীঘি কাটিয়েছিলেন। অনেক শতাব্দী ধরে জলদান করে ক'রে ভাণ্ডার নিঃশেষিত এখন।

বোমার আতঙ্কে সেই যে পালিয়ে গ্রামে এসে রইলাম। দীঘির দুর্দশা তখন এতদূর নয়, পাড়ের জঙ্গল এত ঘন হয়ে ওঠেনি। হিঞ্চে-কলমির ভিতরে জল দেখা যেত খানিক খানিক। পাড়ের উপর ওই-খানটা খেজুরগুঁড়ি ফেলে ঘাট বানিয়েছিল, পাড়ার মেয়েরা বাসন মাজত সেখানে বসে। কলসি ভরে জলও নিয়ে যেত। খাবার জল নয়, বাইরের ধোওয়ামোছার কাজ হত দীঘির জলে।

শহরবাসী সদাব্যস্ত মানুষ—গাঁয়ে-ঘরে একনাগাড় পড়ে থেকে

হাঁপিয়ে উঠেছি। কী-করি কী-করি অবস্থা। মাধবের সঙ্গে তখন জুটে পড়ি। মাছ-ধরা বিদ্যেটা ভাল রকম রপ্ত করে নিই।

গুরু বিনে কোন বিদ্যে হয় না, তোমায় আমি গুরু বরণ করলাম মাধব।

চৈত্র-বৈশাখের খরার সময় সেটা। বিলে জল নেই। নিরুপায় মাধব অগত্যা এই মজা-দীঘিতে ভর করেছে। মাছ না মারলে তার পেটের ভাত হজম হয় না। বর্ষার জল না পড়া পর্যন্ত দীঘির পাড়ে ছিপ নিয়ে বসে গীতরক্ষা করে।

ছিপ ফেলে বসে আছে যতক্ষণ পারে, বাকি সময় তারই আনুষঙ্গিক আয়োজন। নালশো ও বোলতার ডিম-সংগ্রহ, চার বানানো, ঝাড়ে ঝাড়ে ঘুরে ছিপের বাঁশ কাটা—রকমারি হাঙ্গামার কাজ। মাছ-মারার দেবতা হলেন বুড়ো-হালদার—তাঁর নামে খুড়ি দিয়ে সুতো জলে ছুঁড়ে দেয়। সেই বৃদ্ধের, মনে হয়, অত্যন্ত পেয়ারের সাকরেদ মাধব। অলক্ষ্যে তিনি দীঘির অন্ধিসন্ধির মাছ তাড়িয়ে মাধবেব চারে নিয়ে আসেন, মাধবের ছিপের বড়শিতে গেঁথে দেন। আর মাধবের বশম্বদ সাকরেদ আমি প্রায় সর্বক্ষণ তার সঙ্গে সঙ্গে আছি। ছিপ নিয়ে মাধবের অনতিদূরে বসি। সময় কাটানোর বড় উপাদেয় জিনিষ। দিনমান কোন দিক দিয়ে উড়ে চলে যায়, বুঝতে পারিনে। কিন্তু দুদিনের উড়ো-মানুষ বলেই বোধহয় আমার উপর হালদার-দেবতা সদয় নন। মাছ হয় না।

বীণা মেয়েটা এই সময় আমাদের গ্রামে এল। আঙুল-কাটা বীণা বলে পরে যার নাম হয়েছিল। দক্ষিণ-পাড়ে ওই কতকগুলো ভিটে দেখছেন, মণ্ডলবাড়ি ওটা। মা মরে গিয়ে বীণা নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছিল—মণ্ডলবাড়ির উপেনের বউ সরলা তার বড়বোন, সে গিয়ে বীণাকে নিয়ে এল। ভারী সুন্দরী ছিল বীণা সেই বয়সটায়—পাড়ার মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। এবাড়ি-ওবাড়ির গিন্নিরা চিবুকে হাত দিয়ে

মুখ তুলে দেখে তারিফ করেন : বাঃ, বাঃ! বীণাকে বাড়ির বউ করে নেবার লোভ।

সরলা কাউকে চটাতে চায় না। বলে, হবে তাই, তাড়াতাড়ি কিসের? আপনার ঘরে যাবার ভাগ্যি করে এসে থাকে তো ঠিক তাই যাবে। মিষ্ট কথায় সকলকে তুষ্ট করে, কিন্তু বোনকে নিয়ে খুব উঁচু আশা সরলার। এমন বরের সঙ্গে বিয়ে দেবে, বাসা করে বীণাকে যে শহরে নিয়ে তুলবে। বোনের পায়ের তলায় কাঁচামাটি লাগবে না।

আর ঝোপঝাড়ের অন্তরালে ছিপ নিয়ে বসে আমি এক ভিন্ন মজা লক্ষ্য করি। ঘাটের পাশটিতে মাধবের ছিপ-ফেলার জায়গা—দুপুর গড়িয়ে এলেই সে ছিপ নিয়ে বসে পড়ে। বাড়ির কাজকর্মে বীণা হামেশাই ঘাটে আসে। খান-কয়েক থালা-বাটি হাতে করে এলো একবার—নারকেল-খোসা আর ছাইয়েব মাজনি দিয়ে বাসন ঘষছে অনেকক্ষণ ধরে। কখনো বা জল নিতে এলো। ঢেউ দিয়ে দিয়ে পানা সরিয়ে, কলসিতে জল ভরে কাঁকালে তুলে বাঁকা হয়ে চলে যায়।

বয়সের দোষেই বলতে হবে—বজ্জাতি করত মাধবটা। বীণা এসে বসলে সপাং-সপাং করে ছিপে টান দিত। কত মাছ উঠছে যেন। মাছ হয়তো সত্যিই উঠল একবার। না উঠলেও বড়শিটা হাতে ঢেকে এমন ভাব দেখায়, মাছ গেঁথেছে—বড়শি থেকে ছাড়িয়ে খালুইতে রাখছে। খালুই নাড়া দেয় অকারণে। এবারে না উঠুক, আগে তো উঠেছে কিছু, সেই মাছ খলবল করে। বীণা চলে যাচ্ছিল জলের কলসি নিয়ে, ফিরে দাঁড়ায় মাছ দেখবার জন্য। চোখ বুঝি জ্বলজ্বল করে। শুদ্ধাচারী বিধবা মানুষ নিরামিষ খান, জল থেকে মাছ তোলবার সময়টা তিনিও কাছে না এসে থাকতে পারবেন না—মাছ এমনি জিনিস।

বীণা পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে। মাধব চট করে খালুই নিয়ে ঘুরে বসে তার দিকে পিছন করে। গাছপালার আড়ালে আমি

আবছা হয়ে আছি, দেখতে পাচ্ছি কিন্তু পরিষ্কার। খালুইয়ের খানিকটা জলে ডুবিয়ে দিল মাধব মাছ জীয়ন্ত থাকবে বলে। অর্থাৎ বীণাকে বেকুব বানানো।

বিবাদের এই সূত্রপাত। পরের দিন বীণা যথারীতি জল নিতে এসেছে, কিন্তু জল ভরে না, জলে কেবলই ঢেউ দিচ্ছে। ঢেউ দেওয়া শেষই হয় না।

মাধব বলে, তাড়াতাড়ি কলসি ভরে উঠে পড়। চারের মাছ তাড়িয়ে দিচ্ছ তুমি।

বীণা অতএব কলসি জলে ডোবায়। বগ-বগ বগ-বগ—ভরছে তো ভরছেই। মাধব খিঁচিয়ে ওঠে: হল? কলসিতে যে সমুদ্দুর ঢুকিয়ে নিচ্ছ। আওয়াজে মাছ তল্লাট ছেড়ে পালাল।

কলসি ভরে গিয়ে নিঃশব্দ হয়েছে। বীণা বলে, এই যাঃ, টোকা শ্যাওলা ঢুকে গেছে জলের সঙ্গে।

হাত-পা ধোবার জন্য বাইরে-কলসির জল। একটা-দুটো শ্যাওলা ঢুকলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। তবু হুড়হুড় করে জল ঢেলে দিয়ে বীণা আবার কলসি ভরে।

মাধব বলে, জল ভরা আর ঢেলে ফেলা—এই করবে তো সন্ধ্যের পর এসো। ছিপ নিয়ে আমি উঠে গেলে তার পরে। চারের দফা শেষ করে দিয়েছ, এবারে বাড়ি চলে যাও।

রীতিমত হুমকি দিয়ে বলা। জল না নিয়ে বীণা ঘাট থেকে উপরে উঠে গেল। ঝঙ্কার দেয়: আক্কেল বুঝিনে বাপু। সারাদিন চার করে বসে থাকলে গৃহস্থর কাজকর্ম হয় কেমন করে?

মাধব বলে, চার করে আমি নতুন বসছি নে। কিন্তু আজব গৃহস্থ বটে এই নতুন দেখলাম।

ফরফর করে বীণা চলে গেল। তারপরে ক'দিন দেখা নেই। তাড়া খেয়ে চক্কোত্তিদের খিড়কি-পুকুরে যাচ্ছে বোধহয়। দিব্যি শান্তিতে আমাদের মাছ ধরা চলেছে।

হঠাৎ একদিন—ওরে বাবা! সৈন্যসামন্ত জুটিয়ে বীণা যেন লড়াইয়ে এসে নামল। এসেছে পাঁচজন—সে নিজে, আর এপাড়া-ওপাড়ার সমবয়সি চারটে মেয়ে। এসে আর তিলেকমাত্র দেরি নয়—ঝপ্‌পাস করে দীঘির সেই পচা পাঁক-জলের মধ্যে পড়ে হুল্লোড়। গা ধোওয়া হচ্ছে আসন্ন সন্ধ্যায়। যে জলে ঘেন্না করে মহিষও পড়তে চায় না। জলজ্যান্ত দুই বেটাছেলে আমরা ছিপ ধরে দাঁড়িয়ে, একজন তো একেবারে কাছে—তা মোটে আমলের মধ্যে আনে না ছুঁড়িগুলো। জল ঝাঁপাঝাঁপি করে, এ-ওর গায়ে পাঁক-জল ছিটোয়। পাঁক-জলের দু-এক আঁজলা কি মাধবের দিকেও পড়ছে না! যা কাণ্ড, মাছ তো মাসাবধি কাল ও-ঘাটের ত্রিসীমানায় আসবে না।

ঝগড়ায় সুবিধে হবে না, মাধব বুঝেছে। ভাব করেই দেখা যাক—ঘুস দিয়ে যদি নিরস্ত করা যায়। ভাল কথায় বুঝিয়ে মাধব বলে, মাছ তাড়িয়ে লাভটা কি তোমাদের? তার চেয়ে বলি শোন। একলা মানুষ আমি—একটা মুখে কত আর খাব? একে তাকে মাছ বিলিয়ে দিই—না হয় তোমাদেরই দিলাম। ঝঞ্চাট কোরো না, এখন থেকে সেই নিয়ম।

যেন মন্ত্রের কাজ হল। সাথীদের নিয়ে বীণা তক্ষুনি উঠে পড়ে। বলে, আজ থেকেই কিন্তু—এখনই, নগদ নগদ। মাছুড়ে-মানুষের কথায় বিশ্বাস করিনে। মাছের উপর তোমাদের বড্ড মায়া

বেশ! কিসে নেবে, জায়গা নিয়ে এস।

আঁচলে করে নিয়ে যাব। বেছে নেব কিন্তু। একটা দুটো পুঁটি-চাঁদা দিয়ে বলবে হয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে না।

মাধব বলে, না, তুমিই নাও নিজের হাতে।

কথায় সঙ্গে হাসির মাখামাখি, এতখানি দূর থেকেও দিব্যি সেটা মালুম পাচ্ছি।

জলের মধ্যে খোঁটা পুঁতে খালুই বেঁধে রেখেছে। উঁচু করে তুলে ধরে খালুই থেকে বীণা মাছ নিচ্ছে।

মাধব বলে, সিঙিমাছও আছে। সামাল হয়ে তুলো, কাঁটা না মারে। আরে আরে, কেমন হাবা তুমি—খালুই অমন কাত করে কখনো!

কিন্তু হাবা নয় বীণা—শয়তান-বিচ্ছু। খালুই উপুড় করে জলে ঢেলে খালাস। অন্য মেয়েগুলো হি-হি করে হাসছে।

রাগে জ্বলতে জ্বলতে মাধব ছিপ-সুতো গুটিয়ে বাড়ি চলে গেল। তারপরে ক'দিন আর দেখতে পাইনে। আমি একলা আসি, যাই। এসেই বা কি করবে—বেহায়া ছুঁড়িগুলোর হাসির তোড়ে ঘাট তোলপাড়। মাছ তো মাছ—হাঙর-কুমির থাকলেও ওদের দাপে পালাত।

তা বলে হাত-পা কোলে করে বাড়ি বসে থাকাও মাধবের পক্ষে অসম্ভব। বিকাল হলে মাছুড়ে মানুষের মন কেমন করে, জলে ডাক দেয়। ডানহাত সুড়সুড় করে ছিপ ধরে দাঁড়াবার জন্য। সুযোগও হয়ে গেল—ভাগনীর অসুখের খবর পেয়ে আমি সেই সময়টা বোনের বাড়ি চলে গেলাম। মাধব এসে আমার ফুটে ছিপ ফেলে।

বড়শি জলতলে পড়বে, দামের ভিতরে সেই মতো একটু ছিদ্র করে নেওয়া হয়—মাছুড়ের ভাষায় তার নাম 'ফুট'। বাসনের উচ্ছিষ্টের লোভে ঘাটের কাছে মাছ ঘুরঘুর করে—আমার দূরবর্তী ফুটে সেই জিনিষ হবে না। তবে ঝোপঝাড়ের ভিতরে জায়গাটা নিরাপদ। ঘাটে পড়ে বীণারা যত পারে হুল্লোড় করুক, এতখানি দূরে গোলমাল পৌঁছবে না। পচা-খইলের সঙ্গে বোলতার ডিম মিশিয়ে উৎকৃষ্ট চার বানাল মাধব—মাছ বলে কি, মানুষের জিভেও জল সরবে এমনি লোভনীয় জিনিস। চারের জোরে ঘাটের মাছ সেই দূরের জায়গায় টেনে নেবে, এই মতলব। চার করে মাধব ঝিম হয়ে দাঁড়িয়ে নিরিখ করছে—যা করেন এখন বুড়ো-হালদার ঠাকুর।

রেহাই হল না তবু। শনিচরীর দৃষ্টি সেই অবধি পৌঁছে গেছে। দলবল নিয়ে বীণা জঙ্গলের শুঁড়ি-পথ বেয়ে হানা দিল: আমরা ঘাটে আসি, সেই সময় এখান থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখ তুমি।

অসহ্য! রাগ চেপে রাখতে পারল না মাধব। বলে, সদ্য শ্যাওড়াগাছ থেকে সব নেমে এসেছ, দেখবার কী আছে? দেখবার ভয়ে আমিই বরঞ্চ চোখ বুজে থাকি।

শ্যাওড়াগাছে পেত্নীর বসবাস, জনপ্রবাদ এই। বীণাদের পেত্নী বলা হল। ফিরে গেল মেয়েগুলো। কাদাজল ছিটাত আগে, এই থেকে চষাক্ষেতের ঢেলা কুড়িয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হল। ঢিল ছুঁড়ে নাকি নিজেদের মধ্যে খেলা করছে—কিন্তু সবগুলোই তো কুপকাপ করে ফুটের চতুর্দিকে এসে পড়ে।

এত অপমান চুপচাপ পরিপাক করা যায় না, বিশেষত মেয়েলোক যেখানে জিতে যাচ্ছে। দেখাচ্ছি মজা! শোধ তুলে নেব—ষোল-আনার উপর আঠারআনা শোধ।

বোনের বাড়ি থেকে ফিরে এসে মাধবের কাছে সমস্ত শুনলাম। শোধ নেবার যে গূঢ় মতলব করেছে, তা-ও শোনা গেল। রাগে সে গরগর করছে। মানা করলাম আমি, কানে নিল না। আবার সেই ঘাটের কাছে পূর্বস্থানে বসতে লেগেছে। মাছের গরজ নেই, গাঁথবে একদিন বীণাকেই। দেমাক করে আঁচল ফরফরিয়ে বেড়ায়—ছিপে গেঁথে ফেলবে বীণার আঁচলের কাপড়। গেঁথে হিড়হিড় করে টেনে আনবে। জলের মাছ বড়শি গেঁথে যেমন আনে। কাজের ছুতোয় ঘাটে এসে বসলেই চেষ্টা করবে। ভয় পেয়ে দীঘির পচাঘাট বাতিল করে অতঃপর বীণা যাতে চক্রবর্তিদের খিড়কি-পুকুরে যাতায়াত করে।

সরলার বর উপেন মণ্ডল রেজেস্ট্রি-অফিসের ক্লার্ক। সকাল সকাল খেয়ে আড়াই ক্রোশ দূরের গঞ্জে রওনা হয়ে যায়, বাড়ি ফেরে সন্ধ্যা গড়িয়ে যাবার পর। সেদিন কি-একটা ব্যাপারে আপিস অর্ধেক হয়ে বন্ধ হল। উপেন বেলাবেলি ফিরে এসেছে। চিঁড়ে ভিজিয়ে খেতে দেবে—দুপুরের এঁটো-বেলি আর একটা গেলাস তাড়াতাড়ি ধুয়ে আনার জন্য বীণা দীঘির ঘাটে গিয়েছে। সেই সময়ে সপাৎ করে

ছিপের এক টান। বড়শি লেগেছে এসে ঠিক—ইঞ্চি কয়েকের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট, আঁচলের কাপড় থেকে সরে ডানহাতের আঙুলে। আঙুলের গোড়ায় বড়শি বিঁধে গেছে।

চেঁচামেচি নয়। উঃ—করে অস্ফুট একটুখানি আওয়াজ। বড় বড় চোখ দুটি তুলে তাকায় বীণা মাধবের দিকে। তাইতে মাধব মরমে মরে গেল। সর্বাঙ্গে কাঁপ ধরেছে, কাঁপতে কাঁপতে ঘাটে চলে আসে। বড়শি-বেঁধা কড়েআঙুলটা বীণা চেপে ধরেছে। আমিও ছুটে গিয়েছি

বীণা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল: যাও, সরে যাও তোমরা। এক পা এগিয়েছ কি চেঁচিয়ে রক্ষে রাখব না।

মারমূর্তি দেখে দাঁড়িয়ে পড়ি। ক্ষত জায়গা বাঁ-হাতে চেপে ধরে যন্ত্রণা সামলাচ্ছে, রক্ত বন্ধ করছে। আর ছিপের সূতো গালের মধ্যে নিয়ে দাঁতে কাটছে। কেটে গেল সূতো। সূতো ছিঁড়ে-পালানো মাছের মতোই বীণা দৌড় দিল।

মাধবও সঙ্গে সঙ্গে পালায়, ছিপ পড়ে রইল দীঘির পাড়ে। বাড়ি গেল না। বনজঙ্গলে-ভরা গ্রাম আমাদের, চারিদিকে বাগবাগিচা। জঙ্গুলে পথে উপেনের বাড়ির কাছাকাছি এসে মাধব কান পেতে আছে, কখন রৈ-রৈ করে ওঠে উপেন। কিন্তু তেমন কোন গতিক নয়, নিঃশব্দ। তাহলে মাধব যা ভেবেছে, ততদূর নয় নিশ্চয়। বড়শি আঙুলের উপরটা ছুঁয়ে গেছে। মাধবকে দেখিয়ে দেখিয়ে, মাধব জব্দ হবে বলেই, হাত চেপে ধরে অমনভাবে বীণা পালিয়ে গেল।

পরের দিন শোনা গেল, বাসে করে বীণাকে সদরে নিয়ে গেছে। আপিস কামাই করে উপেন গেছে সঙ্গে। কালাওয়ালা বড়শি—হাসপাতালে আঙুল চিরে বড়শি বের করতে হবে।

মাধব কিছু কাল আর দীঘিমুখো হয় না। শেষে অনেকটা দূরে—পূবের পাড়ের জঙ্গলে পথ করে নতুন ফুট কেটে নিল। দক্ষিণ পাড়ে ঘাট বলে পাড়টাই ছেড়ে দিল একেবারে। ঘাটে বসে বউঝিরা

যেমন খুশি কাজকর্ম করুক, দীঘির যত মাছ ঝাঁক বেঁধে চক্কোর দিক সেখানে। মাধব নিজের কান নিজে মলে আমায় বলল, কোনদিন আর ওধারে নয় ছোটবাবু, বিস্তর শিক্ষা হয়েছে।

মাস দুই পরে বীণা ফিরল। হাসপাতালে ছিল, ভুগেছে অনেক। মাধব পালিয়ে বেড়ায়, সামনাসামনি হয় না। তবু সেই জিনিষ ঘটল একদিন। পাড়ের গভীর জঙ্গলের মধ্যে মাধব ছিপ হাতে বসে আছে—ঠাকুরদেবতার মতো যেন পাতাল ফুঁড়ে বীণার আবির্ভাব।

পাতার খড়খড়ানিতে মাধব পিছন ফিরে তাকিয়েছে। বীণা বলে, মুখের দিকে কি দেখছ? দেখ তাকিয়ে কীর্তি তোমার।

ডানহাত মেলে ধরে সামনের উপর। কড়েআঙুল বাঁকা হয়ে বেঁটে হয়ে বিকৃত হয়ে গেছে।

দেখ, তুমি কি করেছ।

দৈবাৎ লেগে গেছে। ঘাটের দিকটা সেই থেকে একেবারে ছেড়ে দিয়ে বসেছি।

অত কথা বীণা বলতে দেয় না। তাড়া দিয়ে উঠল: আমিও তাই বলেছিলাম বাড়িতে। কিন্তু আমার সামনে অতবড় মিথ্যেকথা বোলো না। ইচ্ছে করে তুমি বড়শি গেঁথেছিলে।

সেই রাত্রিবেলা মাধব এসে আনুপূর্বিক আমার কাছে বলে গেল। একজন কাউকে না বলে সোয়াস্তি পাচ্ছিল না। আজব মেয়েছেলে বটে! চিরকালের মতন কড়েআঙুলটা গেল—সেই আঙুল দেখায়, আর নাকি ফিকফিক করে হাসে।

বীণা বলল, কি জানি কী মতলব তোমার! হয়তো ভেবেছিলে মাছের মতন বড়শি গেঁথে খালুইতে ভরে বাড়ি নিয়ে তুলবে। আমি কিন্তু নামটাও করিনি, সমস্ত নিজের ঘাড়ে নিয়েছি। ছিপ রেখে তুমি কেঁচো তুলতে গিয়েছ কোথায়, সেই ছিপ নিয়ে আমি

ফুটে ফেলছিলাম—টান দিতে মাছ না গেঁথে বড়শি এসে নিজের হাতে বিঁধল। মিথ্যে বলে তোমায় বাঁচিয়ে দিলাম, মনে রেখো সেকথা।

গাঁয়ের মধ্যে আরও তুটো মেয়ের নাম বীণা। এ বীণাকে সবাই আঙুল-কাটা বলে পরিচয় দেয়। আঙুল-কাটা বীণা।

॥ বাইশ ॥

ক'বছর কাটল। উপেন মণ্ডল রূপসী শালীর জন্য হরেক সম্বন্ধ নিয়ে আসে, শেষ পর্যন্ত ভেস্তে যায়। দেশ-ভাগাভাগি তখনো স্বপ্নের অগোচর, হামেশাই বাড়ি যাতায়াত করি। মাধবকে খুব গালমন্দ করলাম: তোমারই জন্য মেয়েটার সর্বনাশ—আঙুল-কাটা নাম চালু হয়ে গেছে। একটা খুঁতো-পাঁঠা অবধি ঠাকুরদেবতারা নেন না, খুঁতো-মেয়ে মানষে কেন নিতে যাবে?

মাধব একটু ভেবে বলে, আমি নেব অন্য কেউ যদি না নিতে চায়। দোষ যখন আমারই, খুঁতো-মেয়ে আমি বিয়ে করব। বলে দেখ তুমি উপেন মণ্ডলকে।

প্রস্তাব তুলতে সঙ্কোচ লাগে আমার। ক'দিনই বা বাড়ি থাকি—তা ছাড়া ভিন্ন পাড়ায় ভিন্ন সমাজের আমি, এদের এইসব ঘোঁটের মধ্যে থাকতে চাইনে।

কিন্তু মাধব নাছোড়বান্দা। কথা একবার উঠেছে তো যখন তখন তাগাদা: শালী পার করার চিন্তায় মণ্ডলমশায়ের আহারনিদ্রা বন্ধ হবার যোগাড়—পরের উপকার করতে হয়, দেখই না তুমি একবার বলে।

একদিন বলল, রবিবারে আজ মণ্ডলমশায় বাড়ি আছে। আজকেই চলে যাও—এক্ষুনি। বলি, মায়াদয়া নেই তোমার? মেয়েটার কি অবস্থা, দেখ একবার ভেবে।

মণ্ডলবাড়ি থেকে ফিরতে অনেক বেলা হল। মাধব সতৃষ্ণ চোখে পথ তাকাচ্ছে।

খবর কি?

ইতস্তত করছিলাম, কিন্তু মাধবের তাড়ায় বলে ফেলতে হল। সরলা বীণা দুই বোনই ছিল বাড়িতে, বুঝিয়েসুঝিয়ে বললাম তাদের। বড়বোন এক কথায় রাজি: এক্ষুনি, এক্ষুনি! সাতপাক ঘুরিয়ে কোন রকমে বিদেয় করতে পারলে বাঁচি। বীণারও আপত্তি আছে বলে মনে হল না। ঠাট্টা করে বলে, কড়েআঙুলে কড়েআঙুল জুড়ে তবে তো বিয়ে হয়। সেই আঙুলই গেছে আমার, বিয়ে হবে কি করে?

(আমার মুখে শুনে মাধব চুকচুক করে: ডানহাতেরটাই গেছে গো—বলেছে ঠিক, কনের বেলা ডানহাতের কড়েআঙুল লাগে।)

জপাচ্ছি দুই বোনকে, এমন সময় উপেন এসে পড়ল। সমস্ত শুনে আমায় এই মারে তো মারে। বলে, চাল নেই চুলো নেই, আপন বলতে ত্রিসংসারে কেউ নেই, কোন্ সাহসে বিয়ের কথা তোলে! তোমারই বা কী রকম আক্কেল—এই ছেঁড়া-কথা বলবার জন্যে আমার বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করেছ।

আদ্যোপান্ত শুনে মাধব তো রেগে আগুন: মেয়েটার কষ্টে দয়া হল, তাই বলেছিলাম! সাক্ষি রইলে তুমি, আমার আর দায়দায়িত্ব রইল না। ও মেয়ে কোনদিন পরঘরি করতে হবে না, এই একটা কথা বলে রাখছি।

একটু থেমে তিক্তকণ্ঠে আবার বলে, চায়ও না। বোধহয় পরঘরি হতে দিতে।

কেন, এমন কথা বলছ কি জন্যে?

কানাঘুষো কত-রকম চলছে, কানে তুলো দিয়ে থাক নাকি ছোটবাবু? যাকগে, বাপ-মা খেয়ে আমাদের গাঁয়ে আশ্রয় নিয়ে আছে, তার সম্বন্ধে না বলাই ভাল।

কথাটা শোনার পর থেকে কান পেতে বেড়াই। বীণাকে সরলা

নিজে গিয়ে নিয়ে এসেছিল, বড় ভালবাসার বোন—ইদানীং অহোরাত্রি তার সঙ্গে ঝগড়া। কারণে-অকারণে যাচ্ছেতাই করে বলে, বীণা কেঁদে ভাসায়। নানারকম মুখরোচক রটনা। আমার কানে কেন যে এতদিন ঢোকে নি, আশ্চর্য!

উপেন তারপর আপিসে লম্বা ছুটি নিয়ে বউ আর শালী সঙ্গে করে গয়া-কাশী করতে বেরোল। গাঁয়ে ফিরল মাস তিনেক কাটিয়ে। বীণার সিঁথিতে সিঁদূর।

পড়শিরা প্রশ্ন করেছিল, শালীর বিয়ে কোথায় দিলে মণ্ডলমশায়?

উপেন বলে, চেষ্টাচরিত্তির অনেক হল, কেউ নিতে চায় না। বউ বলে, বোনকে ডেকে ঘরে ঠাঁই দিয়েছি, এখন আবার পথে বের করে দিই কেমন করে? তারই জেদে শেষ পর্যন্ত আমায় বর হতে হল। বাঁজা মেয়েমানুষের একটা আশা—ছেলেপুলে হলে দুজনেরই হবে সেটা। মা আর মাসিতে তফাত কতটুকু! তার উপরে সহোদরা বোন—বড্ড ভাব দু-জনে।

ভাব কি রকম, গ্রামের মানুষ আগেই কিছু কিছু টের পাচ্ছিল, বিয়ের পর তুমুল হয়ে দেখা দিল সেটা। আগে একতরফা চলত—সরলা গালি দিত, বীণা কাঁদত মুখ বুজে। সতীন হয়ে বীণারও এবার মুখ খুলেছে—সমান দুই লড়নেওয়ালি। প্রকাণ্ড উঠানের দুই পারে উত্তরপোতা আর দক্ষিণপোতার সামনাসামনি দুটো ঘর নিয়ে থাকে দুজনে, ঝগড়ার চোটে ঘরের চালে কাক পড়তে পারে না।

উপেনেরও ক্রমশ অসহ্য হয়ে ওঠে। দুই বোনের কাউকে ঠেকাতে পারে না। বয়স হয়েছে, এতদিনে মালুম হল সেটা। ভাল করে সকাল না হতেই গঞ্জ মুখো বেরিয়ে পড়ে। দেড় টাকা মাসিক ভাড়ায় একটা চালাঘর নিয়েছে, সেখানে রাঁধাবাড়া করে দুপুরের খাওয়া খায়। আপিসের পর তাস-পাশার আড্ডা জমিয়ে নেয় সেখানেই। রাত নিশুতি হলে আড্ডা ভেঙে টুকটুক করে বাড়ির দিকে চলে। রান্নাঘরে ঢুকে যা-হোক দুটি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ে।

দুই সতীনের ঝগড়াঝাটির সংসারে মাধব কিন্তু খাসা জমিয়ে নিয়েছে। শহরে বসে এর তার মুখে শুনি, মাঝে মাঝে গাঁয়ে এসে নিজ চোখে দেখতে পাই। ছিপে জালে চারো-ঘুনসিতে যা মাছ ওঠে, প্রায় সমস্ত দিয়ে দেয় যে মণ্ডলবাড়ি। হাটবাজার করে তাদের, এটা-ওটা ফাইফরমাস খাটে। সরলা আর বীণায় বাক্যালাপ বন্ধ—সংসারের কাজকর্ম অচল হয়ে ওঠে সময় সময়। মাধব উপস্থিত থাকলে সে-ই তখন এর কথা ওর কাছে গিয়ে বলে।

সরলাই একদিন ন্যাক বলেছিল, কেন আর হাত পুড়িয়ে রান্না করো মাধব, এখানেই চাট্টি চাট্টি খেয়ে নিলে পার। সে বেয়াক্কেলে মানুষটা খুনি আসামির মতো পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। গোলায় ধান থাকলেই মানুষ বাঁচে না, তুমি না থাকলে দুটো প্রাণী আমাদের উপোস করে মরতে হত।

খাওয়া বহাল হয়ে গেল মণ্ডলবাড়ি। ছোটবোন বীণাই বা কম হল কিসে—সে বলে, এত-বড় বাড়ির মধ্যে দুটো মাত্র মেয়েলোক পড়ে আছি। সে-মানুষ নিশিরাত্রে চোরের মতন এসে ভোর না হতেই চোর হয়ে চলে যায়। রাত্রিবেলা ভয় করে আমার, ভয়ে ঘুম হয় না। দক্ষিণের-ঘরের দাওয়ায় এসে শুয়ো তুমি মাধব।

অতএব মাধবের খাওয়া-শোওয়া দুই-ই এখন মণ্ডলবাড়ি।

মাধবের সঙ্গে, সেই দেখেছেন, বিলের টোঙে একত্র রাত কাটাচ্ছি। মণ্ডলবাড়ির দুই সতীনের মধ্যে পড়ে সেই মাধবই কতদূর পর হয়ে গিয়েছিল, বলি আপনাকে। তার আগে নকুল দাসকে চিনে নিন। আমাদের প্রজার মধ্যে পড়ে নকুল। বাপ-পিতামহের ভিটা ছেড়ে চলে এলাম, সেই ভিটামাটি নকুল অনেককাল যক্ষের মতো আগলে ছিল। সে-ও নেই এখন। বিস্তর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু টিকে থাকতে পারল না। ছিন্নমূল হয়ে হাজার হাজার নিরপরাধের সঙ্গে কোথায় ভেসে চলে গেছে!

চোত-কিস্তির খাজনাকড়ি মেটাতে বাড়ি এসেছি। খাল-বিল শুকনো, মাছের বড় অনটন। মাধব যথারীতি দীঘির পাড়ে। নকুল গিয়ে বলে, ছোটবাবু বাড়ি থাকে না, ক'দিনের জন্য এসেছে। মাছ দাও মাধব।

আমার নাম করে বলল, তবু মাধব হাত উল্টে নিস্পৃহ কণ্ঠে বলে, কোথায় মাছ?

জলের ভিতর আধ-ডুবন্ত খালুইটা দেখিয়ে নকুল বলে, তোল দেখি—

দেখে কি হবে? আছে দু-চারটে—আমাদের খেতে লাগবে না?

একদিন না হয় খেলেই নিরামিষ। এ মানুষ কি গাঁয়ে পড়ে নিত্যিদিন খেতে আসবে?

মাধব কানে নেয় না। ফাতনা নড়ে উঠল এই সময়। হাতের ইসারায় সে নকুলকে কথা বলতে মানা করে। নকুলের কাছে শোনা আমার এ সমস্ত, রাগে ফুলতে ফুলতে সে বিবরণ বলল। আমিই ঠাণ্ডা করি: মাছ না হল তো কি হয়েছে! আমি নিরামিষ খাব। নিরামিষ ভাল লাগে আমার।

কয়েকটা দিন পরে সন্ধ্যাবেলা মণ্ডলবাড়ি থেকে কান্নার রোল উঠল। কাঁধে ছিপ, হাতে খালুই, মাধব দীঘির পাড় থেকে ছুটেছে। গিয়ে দেখি, দু-বোন বুক ছেড়ে কাঁদছে। গাঁয়ের অনেকে এসে পড়েছে। কী ব্যাপার?

উপেন মারা গেছে, গঞ্জ থেকে এইমাত্র লোক এসে খবর দিল। সুস্থ মানুষ প্রতিদিনের মতো আজকেও গঞ্জে বেরিয়েছিল, আর সে ফিরবে না। দূরের পথ নয়—সরলা আর বীণা দুই সতীনই গঞ্জে চলল। মাধব আছে—আমি এবং আরও অনেকে সঙ্গ নিয়েছি।

বৃত্তান্ত সবিশেষ শোনা গেল। আপিসে সারাদিন যথারীতি কাজকর্ম করে উপেন বাসায় ফিরছিল। যেতে যেতে পথের উপরেই ঢলে পড়েছে। লোক-চলাচল বড় কম সেদিকটায়। সেই অবস্থায়

কতক্ষণ আছে, কে জানে। একজনে অবশেষে দেখতে পেয়ে হাঁকডাক করে লোক জড় করেছে। বুকের নিচে ধুকপুকানিটা একটু-আধটু আছে তখনো। একটা বেঞ্চি জোগাড় করে তার উপরে শুইয়ে ধরাধরি করে সকলে বাসাঘরে এনে তুলল। ডাক্তার এলো। পাড়াগাঁয়ে যেমন সব হাতুড়ে-ডাক্তার পশার জমিয়ে থাকে—আমাদের অটল ডাক্তারের দোসর। তখন শেষ হয়ে গেছে। ডাক্তার রোগেরও নাম একটা বলল কয়েকটা শক্ত শক্ত বিলাতি কথা জুড়ে। বুঝল না কেউ, অবাক হয়ে রইল।

শ্মশানে আমিও গিয়েছি। কাজকর্ম চুকিয়ে ফিরে আসতে সকাল হয়ে গেল। পায়ে হেঁটে গিয়েছিলাম সকলে, ফিরছিও হেঁটে। সরলা আর বীণা কাঁদতে কাঁদতে সকলের মাঝখানে গলাগলি হয়ে যাচ্ছে। উপেন মণ্ডল মরে গিয়ে আর এখন সতীন নয়—সহোদরা বোন আবার।

শ্মশান থেকে ফিরে কিছু কিছু করণীয় আছে। লোহা ছুঁতে হয়, তেতো খেতে হয়—প্রেতাত্মা যদি পিছু নিয়ে থাকে, বিপদ বুঝে পালিয়ে যায়। সবাই আমরা আবার মণ্ডলবাড়ি গিয়েছি।

সন্ধ্যাবেলা কাল তাড়াতাড়িতে মাধব ছিপ-খালুই উঠানে ফেলে গিয়েছিল। তেমনি পড়ে রয়েছে। ফিরে এসে সকল ক্রিয়াকর্মের আগে খালুইটা সে নেড়েচেড়ে দেখে। কইমাছ পেয়েছিল—আশ্চর্য, বিনা জলে এখনো জীয়ন্ত। কইমাছের কথায় বলে, মাছ কুটে কড়াইয়ের তেলের উপর ছাড়লেও লাফ দেয়। খালুই হাতে একছুটে সে বেরোল। ফিরে এলো খালি খালুই নিয়ে।

বীণা প্রশ্ন করে, মাছ কি হল?

জলের মাছ জলে উপুড় করে এলাম।

কেন?

কি হবে? তারপর গভীর আগ্রহে বীণার মুখের দিকে চেয়ে

মাধব বলে, বড়দিদির কথা বলিনে, কিন্তু তোমার মতন কম বয়সে যাদের কপাল পোড়ে, তারা মাছ খেয়ে থাকে।

বীণা বলল, আমি খাব না। খাওয়া যখন বিধাতা ঘুচিয়ে দিলেন, চুরি করে কেন খেতে যাব? মাছের খবর নিচ্ছিলাম তোমারই জন্যে।

নকুল দাসের মুখে শুনি, মাধবও মাছ ছেড়েছিল সেই থেকে। নকুল জিজ্ঞাসা করেছিল, ছাড়লে বীণার দেখাদেখি নাকি?

তাই বুঝি! প্রবল ঘাড় নেড়ে মাধব বলল, মাছ আমায় রেঁধে দেবে কে? তুই বোনের কেউ খাবে না—আমার কোন্ দায় পড়েছে, আমি কেন কষ্ট কবতে বলব ওদের? পরের রান্না খেয়ে খেয়ে অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে। নিজে রসুই করে নিতে আব এখন ইচ্ছে যায় না।

নিরামিষ খায় মাধব, তা বলে মাছ-মারা বন্ধ নেই। জাল এবং চারো-ঘুনসি ছেড়ে শুধুমাত্র ছিপ এখন। বড সাংঘাতিক নেশা, জীবন থাকতে এ নেশা কাটানো যায় না। ষোলআনা মণ্ডল-বাড়িরই লোক হয়ে গেছে—ওদের সংসার ও জমাজমি সমস্ত তাকে দেখাশুনো করতে হয়। কিন্তু সকালে হোক বিকালে হোক, একটি বার বসবেই সে ছিপ নিয়ে। এমন হয়েছে, দিনের মধ্যে কোন-ক্রমে ফুরসত হল না—তখন রাত দুপুরে দীঘির জঙ্গলের মধ্যে টোপ নাচিয়ে বেড়াচ্ছে। মাছেও যেন টের পেয়ে যায় মাধবের সুতো-বড়শি। কিংবা বড়শিতে বুঝি চুম্বক লাগানো—যেখানকার যত মাছ বড়শির মুখে চুম্বকের টানে হাজির হয়।

বসার জায়গার কাছে জলের মধ্যে হাপর রেখে দিয়েছে, বড়শি থেকে মাছ খুলে খুলে মাধব সেই হাপরে ফেলে। খেলা করে বেড়ায় হাপরের মধ্যে মাছ। যেদিন যেমন অবসর—দু-ঘণ্টা চার-ঘণ্টা ছ-ঘণ্টা ধরে চলল মাছ-ধরা। এক সময় তার পরে ছিপটা রেখে হাপরের মাছ একটা নিয়ে হাতে তুলে ধরে। এক পয়সা করে নোলক পাওয়া যায়, তাই গুচ্ছের কিনে রেখেছে। তাছাড়া আছে পিতলের তারের সরু

আংটি—কোনটায় লাল কোনটায় নীল কোনটায় সাদা পুঁতি পরানো। পরম আদরে মাছ তুলে ধরে মাধব নোলক পরিয়ে দেয় মুখে। চিহ্নিত হয়ে রইল। ধরা-মাছ নোলক পরিয়ে ছেড়ে দেয় জলের মধ্যে। যাবে কোথায়? ধেড়ে-ঘড়েলে না খায় তো ঠিক আবার উঠে আসতে হবে। হয়ও তাই—একই মাছ কতবার ছিপে উঠেছে। দ্বিতীয়বার নোলক নয়—লাল-পুঁতিওয়ালা তারের আংটি পরিয়ে দেবে। তার পরের বার হয়তো নীল-পুঁতি। এমনিই চলে। মাছ দেখে মাধব চিনতে পারে। আংটি পরাতে পরাতে বলে, ভোল ফিরে গেছে দেখছি তোর। শ্রাবণমাসে রোগা-ডিগডিগে ছিলি, এখন যে রাজপুত্তুর। যা চলে বেটা, আবার আসবি কিন্তু ছিপে, ভুলিস নে।

অদ্বিতীয় মাছুড়ে বলে মাধবের নাম। ছিপে মাছ ধরছে সে—রীতিমত এক দেখবার বস্তু। গাঁয়ে এসে নিজে ছিপ না-ও যদি ধরতাম, তার পাশে নিঃশব্দে গিয়ে বসি। আরো কয়েকটা ছেলে এসে দেখত। তাদের একজন বলে, ধরে ধরে ছেড়ে দেবে, মিছে তবে কষ্ট করা কেন? মাছ আমাদের দিয়ে দাও, নগদ দাম দেব।

মাধব স্তোক দেয়: আর খানিকটা বড় হোক—আচ্ছা, জষ্টিমাস আসুক, সেই সময়।

দুটি হাত একত্র করে ঠাকুরের সামনে অঞ্জলি দেবার ভঙ্গিতে জলের মাছ জলে দিয়ে দিত। পুচ্ছ নেড়ে চক্ষের পলকে মাছ অদৃশ্য। মাধব প্রাণভরে হাসছে তখন।

মাধবও মারা গেছে। গাঁয়ে বড়-একটা যাইনে। দেশ ভাগ হয়ে গিয়ে নানান ঝামেলা—যাওয়া কত কঠিন, সে তো দেখতেই পেলেন চোখে। বাড়ির বাগানের আম-কাঁঠাল, বাড়ির খেজুরগাছের গুড়-পাটালি নকুল দাস মাঝে মাঝে কলকাতায় নিয়ে আসত ছেলে-পুলের নাম করে। তারই মুখে মাধবের মরার খবর শুনলাম।

॥ তেইশ ॥

থমকে দাঁড়ালেন যে! মরা-ছাড়া শুনে শুনে মন কাঁদছে? আমাদের কিছু হয় না, মাছের মায়ের পুত্রশোক নেই। কত গিয়েছে—রাত্রিবেলা এই কানে শুনছেন, দিনমানে কাল ঘুরে ঘুরে স্বচক্ষে দেখবেন। যমে নিয়ে নিল কতক, আর যমের দোসর আপনারা মাটি-মানুষ ভাগ করে বাকিটা সারলেন। বুকেব নিচে প্রাণ হয়তো ধুক-ধুক করে, তাহলেও মড়া হয়ে গেছে একটা বিশাল অঞ্চলেব হাজারলক্ষ মানুষ।

যাকগে। মাধবের কথা শুনলাম নকুল দাসেব মুখে। অপঘাত মৃত্যু। আগের রাত্রে শোবাব সময় সরলাকে বলেছিল, সকাল সকাল চাট্টি ফ্যানসা-ভাত দিতে পাববে বড়দিদি? হাটবার কাল, গঞ্জের হাটে যাব। বড়শি আজকেও একটা কেটে নিয়ে গেল। দু-তিন জোড়া বড়শি না হলে কাজকর্ম অচল। আব, যাচ্ছি যখন গজ দশেক সুতোও আনব।

ছিপ-সুতো-বড়শি নিয়েমাধব খুঁতখুঁতে চিরকাল। ওই একটা মাত্র শখ জীবনে—ছিপ-সুতো-বড়শি চারো-ঘুনসি-জালের তোড়জোড়ে বিস্তর সময় কাটে। মির্জানগরের কামাররা ভাল বড়শি গড়ে, গঞ্জের হাটে এনে বিক্রি করে। সকাল সকাল খেয়ে হাটে গিয়ে মাধব সুতো-বড়শি পছন্দ করবে, সেই মতলব করেছে।

কিন্তু সকালবেলা উঠে দেখা গেল, নেই মাধব। যা মানুষ—সরলা-বীণা ধরে নিয়েছে, ভোর থাকতেই গঞ্জে বেরিয়ে পড়েছে। ফিরে এসে দুপুরে খাবে।

দুপুর গড়িয়ে গেল, মাধব আসে না। বীণা দু-একবার বলেছে, কিনবে তো সুতো আর বড়শি—এতক্ষণ ধরে কি করে?

সরলা বলে, কোনো পুকুরে নিয়ে কেউ বসিয়ে দিল কিনা, কে জানে। বসে বসে হয়তো মাছ ধরছে। কিন্তু ভাত কেউ দেবে না, পেটের জ্বালা ধরলে ছুটে আসবে ঠিক।

দুই বোনে খেয়েদেয়ে ঘুম দিল। বেলা পড়ে আসে, এখনো ফিরল না। এতক্ষণেও জ্বালা ধরে না পেটে—অবাক কাণ্ড!

সন্ধ্যার মুখে আমাদের নকুল গরু নিয়ে জল খাওয়াতে দীঘিতে এসেছে। খাঞ্জালি-দীঘি—পাড় ধরে এই যে আমরা এলাম। জঙ্গলের সুঁড়িপথ ধরে জলের কাছে গিয়ে সকলের আগে নকুলের নজর পড়ল, খালুই একটা। খালুইতে মাছ, পাশে নারকেল-মালায় টোপ। ছিপও পড়ে রয়েছে অনতিদূরে। পাড়ের কিনারা অবধি হোগলাবন, খানিকটা তার দলেমলে গিয়েছে—

এক-ছুটে জঙ্গলের বাইরে এসে নকুল চেঁচাচ্ছে: মানুষ মরে পড়ে আছে একটা—

কে মানুষ? কোথায়?

রৈ-রৈ করে গাঁয়ের মানুষ ভেঙে পড়ে। হোগলাবন থেকে টেনে ডাঙায় তুলল মানুষটাকে। মাধব।

মরে কাঠের মতন শক্ত হয়ে আছে। গঞ্জে না গিয়ে দীঘিতেও যেতে পারে, কথাটা কারও মনে ওঠেনি। গঞ্জ থেকে ফিরতে সন্ধ্যা হবে, আজকের মাছ-মারাটা সেক্ষেত্রে বন্ধ হয়ে যায়, সেই শঙ্কায় বোধকরি অত ভোরে ছিপ নিয়ে রীতরক্ষা করতে গিয়েছিল। কিন্তু মারা গেল কেমন করে, সঠিক বোঝা যায় না। শব্দসাড়া করেনি একটুও—চতুর্দিকে লোক-বসতি, শব্দ হলে কারো না কারো নিশ্চয় কানে ঢুকত।

নানান রকম জল্পনা। কেউ বলে, কত কালের দীঘি—কত লোক ডুবে মরেছে, তারা সব ভূতপেত্নী হয়ে ঘোরে। মাধব ভোররাত্রে গিয়ে পড়েছিল, অহোরাত্রির মধ্যে ওই সময়টা সকলের চেয়ে খারাপ, সারারাত চক্কোর দিয়ে ডেরায় ফেরেন ওঁরা. সামনে পেয়ে খেলার ছলে

টুঁটি টিপে ধরেছেন। এক টিপুনিতেই কাবার, আওয়াজ করে কখন?

আবার কেউ বলছে, কেউটেসাপের আস্তানা হোগলাবনের ভিতরে। এসেই মাধব গোটা কয়েক মাছ মারল, তার পরে আর সুবিধা হচ্ছে না দেখে বোধকরি হোগলাবনেব ওধারে যাচ্ছিল। সেই সময় ঠুকে দিলেন মা-মনসা। কালকেউটের বিষ এমন প্রখর যে ছোবল তুলতে না তুলতে মাথা ঝিমিয়ে আসে, তুম করে পড়ে যায় মাটিতে। মাধবের তাই হয়েছে।

মাধবকে তাড়াতাড়ি শ্মশানে বওনা কবে দেয়। থানাওয়ালারা টের পেলে অশেষ হাঙ্গামা। এমনি মওকার লোভেই থানা আলো করে আছেন তাঁরা। মড়া সদবে চালান দিয়ে কেটেকুটে তছনছ করবে। মৃত মাধবের ছিপ-সুতো-বড়শি আব কামিজ-কাপড়-জুতো বিক্রি করে দাবোগা সাহেবের পালকি-ভাড়াটাও উঠবে না। গাঁ সুদ্ধ মানুষের দায়ে ঠেকতে হবে তখন।

বীণার এক অবাক কাণ্ড শুনুন। নকুল স্বচক্ষে দেখেছে। মড়া তাড়াতাড়ি শ্মশানে নিয়ে চিতায় পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন কববাব জন্য সকলে মহাব্যস্ত। কী দবকাবে বীণাব খোঁজ পড়ল—তাকে পাওয়া যায় না।

সমস্ত কাজ ফেলে বীণা তখন দীঘিব পাড়ে। মাধবেব ছিপ-সুতো পড়ে আছে সেখানে, খলুইয়ে মাছ খড়খড় করছে। ছুটে গিয়ে বীণা খালুই উপুড় করে দিল দীঘিব জলে। নকুল দাস পায়েব কাদা ধুচ্ছে তখনো ঘাটের জলে। বীণা তাকিয়েও দেখে না। সকলের বড় দায় যেন এই মাছ ছেড়ে-দেওয়া। দিয়ে সে দায়মুক্ত হল।

কী জ্যোৎস্না!

বাঁশবন ছিল এই জায়গায়। আজকে একটা বাঁশগাছ নেই। জমির হাতবদল হয়েছে। জলের দামে বাঁশ বেচে, দিয়ে মালিকরা হিন্দুস্থান গিয়ে উঠেছেন।

হাটের ফিরতি বিনয় দত্তকে সড়কি মেরেছিল এখানে। বাঁশবন তখন এমন কসাড়, আততায়ী সড়কি উঁচিয়ে দু-হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও নজরে পড়বার কথা নয়। সেই কাণ্ড ঘটেছিল।

ব্যাসডাঙার চক্রবর্তী আর বালির দত্ত তীর্থবাসী এসে গ্রামে ভদ্রপাড়ার পত্তন করলেন, সেই দত্তবাড়ির একজন এই বিনয়। অজ পাড়াগাঁয়ে বিদ্যেসাধ্যি ক-জনেরই বা থাকে, কিন্তু বিনয় দত্ত সবজান্তা। বার পাঁচেক কলকাতা ঘুরে এসেছেন। এক ঠিকেদারের অধীনে একবার কাজও করেছিলেন মাস তিনেক। অনেককাল হয়ে গেছে, কিন্তু সেই তিনমাসের চাকরির কাহিনী আজও ফুরাল না।

এ-হেন বহুদর্শী লোকের কাজের অভাব হয় না। গাঁয়ে থেকেই চাকরি সদরের একজন উকিল বিলপারে কিছু ভূসম্পত্তি করেছেন, বিনয় তার আদায়-তহ্‌শিল করেন। সম্পত্তি অল্প, কিন্তু দাবরব প্রচণ্ড। দত্তমশায় কথাবার্তা বলতে বলতে জলকাদা ভেঙে বাড়ি ফিরছেন অনুগত প্রজাপাটক পরিবৃত হয়ে—আপনি সচকিত হবেন, বিলের মধ্যে বুঝি দাঙ্গা বেধে গেল। গলাটাই এই রকম, তার উপর গাঁটে দু-চার পয়সা থাকলে সেই গলা মারাত্মক হয়ে ওঠে। প্রজা এসে সেলাম দিল, বিনয় দত্ত বললেন, সুখে থাকো—। আশীর্বাদের এমনি হুঙ্কার, প্রজার পিলে চমকে ওঠে।

আমি হাটে দেখে এসেছি বিনয়কে। কিনতে কিনতে বিপুল এক বোঝা হয়েছে, আরও কিনছেন। আমাদের তহ্‌শিলদারি চাকরি নেই, অতএব সংক্ষেপে কেনাকাটা সেরে সকাল সকাল বাড়ি এসে গেছি। ছ্যাঁত করে মাছের ঝোল সম্বরা দিল রান্নাঘরে, ঠকাঠক পিঁড়ি পড়ল দাওয়ায়, কাঠের দেলকোর উপর টেমি জ্বেলে দিল—অর্থাৎ খেতে এসো এইবারে সকলে। গিয়ে বসেছিও, ভাতের থালা এনে এনে দিচ্ছে—তুমুল চিৎকার হরিতলার দিক থেকে। দাওয়া থেকে

লাফিয়ে পড়ে ছুটলাম। আগাছায়-ভরা শুঁড়িপথ, উড়োকালে সাপ বেরোয়, কিন্তু সে ভাবনা এখনকার নয়।

অটল ডাক্তারের বাড়ির সামনে গিয়ে দেখি তিনি চেঁচাচ্ছেন দোতলার জানলায় এসে: বন্দুক, বন্দুক—ডাকাত পড়েছে। দোতলার উঁচু থেকে বলায় আওয়াজটা অনেক দূরে যাচ্ছে। ডাক্তার রটনা করেন লাইসেন্স-করা বন্দুক আছে তাঁর। রাত্রিবেলা অবরেসবরে খানিকটা বন্দুকের আওয়াজও পাওয়া যায় ডাক্তারের বাড়ির ভিতর থেকে। আমি রহস্যটা জানি, একদিন দেখে ফেলেছিলাম ডাক্তারের রহস্যময় বন্দুক। ছুটো নারকেলের গামড়া। দোতলার ভিতরের বারান্দায় গোল থাম। ছু-হাতে সেই ছুই গামড়া নিয়ে একসঙ্গে ডাক্তারবাবু থামে বাড়ি দেন—বন্দুকের দেওড়ের মতন হয় খানিকটা। বিপদ বুঝে আজকেও তিনি সর্বত্র জানান দিয়ে বন্দুকের ফরমাস করছেন অলক্ষ্য কোনো হুকুমবরদারের কাছে।

চলে আস্থন ডাক্তার-দা—

হ্যাঁ, যাচ্ছি। গিয়ে বরঞ্চ একটা খবর পাঠিও, ক'জনে পড়েছে। সেই মতো ওষুধপত্র নিয়ে যাব। আর শোন—আত্ম রেখে ধর্ম, অধিক এগিয়ো না। নিজেকে বাঁচিয়ে তবে পরোপকার।

অনেকে ছুটেছে নানান দিক থেকে। আঁধার রাত, তায় বাঁশতলা। কেউ কেউ হেরিকেন হাতে নিয়ে এসেছে, তাই অবশেষে বিনয়ের খোঁজ হল। রাস্তার পাশে জঙ্গলে-ঢাকা পগাবের মধ্যে তিনি। চেতনা নেই, জন পাঁচ-সাত ধরাধরি করে রাস্তার উপর তুলে ফেলল। পেটের ডান দিকে সড়কির ফলা বিঁধে আছে। রক্ত যা পড়বার পড়েছে, এখন আর পড়ছে না। বোধকরি বোতলের ছিপির মতো সড়কির ফলা ক্ষত জায়গায় বিঁধে আছে বলেই।

বারো বছরের ছেলে ছুর্গাচরণ সঙ্গে ছিল। বাপে-বেটায় গল্প করতে করতে আসছিলেন। চোঁচা-দৌড় দিল ছুর্গাচরণ—হাউমাউ

করে পরামাণিকবাড়ি গিয়ে উঠল। তারাও চেঁচায়। শোরগোল পড়ে গেল। দুর্গাচরণ এখন আবার অকুস্থলে ফিরে এসেছে।

কি করে ঘটল, সবাই জিজ্ঞাসা করে। বাপে-বেটায় হরিতলা ছেড়ে এগিয়ে এসেছেন, পাড়া অল্প দূরে। মোটা গলদা-চিংড়ি কেনা হয়েছে। বিনয় ছেলেকে বলছেন, ঘুমিয়ে পড়লে হবে না বাবা। চোখ টান-টান করে জেগে থাকবে। এই রাত্রেই মাছ রান্না হবে, বাসি হয়ে গেলে চিংড়ির আর মজা থাকে না—

এই সব হচ্ছে, এমন সময় বাঁশঝাড়ের নিচে থেকে একটা মানুষ সাঁ করে বেরিয়ে এলো। আরও একজন ছিল বোধহয়। সে লোকটা রাস্তায় আসে নি, পগারের ওইদিকে ছিল।

বিনয় দত্ত হাঁক দিয়ে ওঠেন, কে ?

এক লহমা চকচকে সড়কির ফলকটা দেখেছে দুর্গাচরণ। ছুটে পালায় সে—ছুটতে ছুটতে কানে শুনল বাপের গোঙানি।

রাস্তার মাটিতে শুইয়ে দিতে বিনয় চোখ মেলে বললেন, জল—

ছুটোছুটি করে জল এনে খাওয়ানো হল। সড়কির ফলার গোড়ার অংশটা দু-হাতে মুঠো করে ধরে আছেন। টরটর করে নিজেই সব বলছেন এখন। খ্যাচ করে সড়কি বসাল, মোচড় দিয়ে তার পরে সড়কি টেনে বের করে নেবার চেষ্টা। তা হলে হয়েছিল আর কি, নাড়িভুড়ি সব বেরিয়ে আসত। মরে গিয়েও বিনয় দত্তের হুঁশ যায় না—সর্বশক্তিতে সড়কি তিনি এঁটে ধরলেন। সেই অবস্থা এখনো, অচেতন অবস্থায়ও মুঠো খোলেন নি। বলেন, মুঠো খুললেই তো গেলাম। লোহার ভারে সড়কি আরও বসে যাবে, ফুসফুসে গিয়ে ঢুকবে। তোমরা এই টানাহেঁচড়া করে পগার থেকে তুললে, মুঠোয় ধরা না থাকলে রক্ষে ছিল !

রাতদুপুরে এখন কিংকর্তব্য ? দত্ত-বউঠান রাস্তা অবধি এসে তো মড়াকান্না কাঁদতে বসেছেন। দুর্গাচরণ যত বলছে, বাবা এই রাত্রেই চিংড়ি-রান্নার কথা বলেছিলেন —তত আরও তাঁর ব্যথা উথলে ওঠে।

মাতব্বররা শলাপরামর্শ করছেন, যা-হোক কিছু করতে হবে শিগগির, পেট কেটে সড়কি বের না করলে ওইখান থেকে পচতে আরম্ভ করবে। সদরের হাসপাতাল ছাড়া এ কাজ হবে না—কিন্তু কোন কায়দায় সেই অবধি পাঠানো যায়?

আপাতত বাড়িতে নিয়ে তোলা তো উচিত। কেঁদে কেঁদে দত্ত-বউঠানও তাই বলেন। বিনয় হাঁ-হাঁ করে উঠলেন: যা-ই করো বাবাসকল, চ্যাংদোলা করে নিও না। তোলা-নামা করতেই আমি খতম হয়ে যাব।

অত্যন্ত খাঁটি কথা। কী রকম মাথা সাফ এই অবস্থার মধ্যেও। বাঁশের অপ্রতুল নেই। মুসলমান চাষীদের বাস চতুর্দিকে, তারাও সব ছুটে এসেছে। বলতে গেলে তাদেরই জনতা। কুড়াল এনে এক-কাঁড়ি শুকনো বাঁশ কেটে দক্ষ হাতে তাড়াতাড়ি তারা চালি বেঁধে ফেলল। বিনয় দত্তকে তোলা হল চালির উপরে। চালির চার কোণে লম্বা বাঁশ। মরদ-জোয়ানরা বাঁশে কাঁধ লাগিয়ে দত্তকে বাড়ি নিয়ে তুলল। ইতিমধ্যে মাথায় বুদ্ধিও এসে গেছে। কাছাকাছি এক গণ্ডগ্রাম। এই শুকনোর সময় সদর থেকে সেই গ্রাম অবধি বাস চলাচল করে—খুব সম্ভব বাস এসে আছে সেখানে, সকালবেলা সদরে ফিরে যাবে। বলে-কয়ে দেখলে হয় বাসের কর্তাদের।

বাসের খবর নিতে একজন সাইকেল নিয়ে ছুটল।

অনেকক্ষণ কাটল। নিশিরাত্রি থমথম করছে। মেয়েছেলেও বিস্তর এসে পড়েছে, অভয় দিচ্ছে দত্ত-বউঠানকে। কান পেতে আছি সকলে পথের দিকে—হ্যাঁ, মোটরের আওয়াজ সত্যিই। দু-চার জন এগিয়ে চলে যায়। অন্ধকার বাঁশতলা উদ্ভাসিত করে মোটরবাস এসে দাঁড়াল। কপাল ভাল বিনয় দত্তর—সকলে বলছে, নির্ঘাত তিনি বেঁচে যাবেন। যোগাযোগ দেখে তাই মনে হচ্ছে। বাস পাওয়া গেল—সে বাসের মালিক আবার ভাগ্যবশে বিনয় দত্তের আত্মীয়। আত্মীয়ের বিপদ শুনে তিনি বাস ছুটিয়ে চলে এসেছেন।

এসে কিন্তু মুষড়ে যাচ্ছেন। অনেকখানি কাঁচা-রাস্তা—এখানে গর্ত, ওখানে উঁচু ঢিবি। ইঞ্জিনের লোহালক্কড়ই খুলে পড়বার গতিক, —সড়কি বেঁধা জখমি মানুষ অত ধাক্কা সামলাবেন কি করে?

বিচার-বিবেচনা করে বাস ফিবে গেল। কেশবপুর ঘুরে নাগরগোপে ফকির-রাস্তার মাথায় পাকা-রাস্তার উপর বাস গিয়ে দাঁড়াবে। বিনয় দত্তকে বাঁশের চালিতে শুইয়ে দু-ক্রোশ পথ কাঁধে করে পৌঁছে দিয়ে আসব সকলে। মুসলমানপাড়ার ওরাও চলল। এত লোকের দরকাব নেই, তবু শুনবে না। আমবা কতক তারা কতক মিলে-মিশে কাঁধ দিয়েছি। মানুষ বদলাবদলি খানিক খানিক গিয়ে।

পাকিস্তান এখন—আপনি-আমি আইন মতে ভিন্ন রাষ্ট্রের মানুষ। নাকি আলাদা জাত। সড়কি মারাব বিপদের এই একটা রাত্রি শুধু নয়, অনেক দিন ও অনেক রাত্রি আমাদেব এক জায়গায় কেটেছে। জাত-বেজাতেব আনবা সহজ সমাধান কবে নিয়েছিলাম—এটা ব্রাহ্মণপাড়া ওটা মুসলমানপাডা এটা কায়েতপাডা ওটা কামারপাড়া। একের রাঁধা-ভাত অন্যে না খেতে পারি, তা বলে একসঙ্গে মেলামেশা আমোদস্ফূর্তিব বাধা নেই। সেই ভাতেব বাধাও দিনকে দিন সরে যাচ্ছিল। খাসা ছিলাম আমরা। মাথায় আমাব কিছুতে আসে না, যেমন করে রাতারাতি আলাদা দুটো জাত হয়ে গেলাম।

(ইতিহাসে দেখুন। ১৯০৬ অব্দেব কংগ্রেস-অধিবেশনে অনুন্নত শ্রেণীব জন্য আসন-সংরক্ষণেব দাবি তুললেন আশুতোষ চৌধুরি। মহম্মদ আলি জিন্নার কঠোর বিরুদ্ধতায় দাবি নস্যাৎ হয়ে গেল। কি কারণে সেই জিন্না-ই আবার একদিন দেশ-ভাগেব দাবি তুললেন—কোন দিন এর কি তদন্ত হবে না?)

এমামনগরের রাস্তার মাঝখানে যে আমগাছ দেখে এলেন, সেই অবধি গিয়ে এক কাণ্ড। বিনয়ের গলায় উৎকট আওয়াজ, চোখের ঢেলা দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসে যেন। ভয় পেয়ে আমরা কাঁধ থেকে চালি ভুঁয়ে নামাই। ভবলীলা সাঙ্গ বুঝি এইবারে বিনয় দত্তর। শ্মশান অদূরে,

বেশি ঝঞ্ঝাট পোহাতে হবে না। হেরিকেনের জোর বাড়িয়ে মুখের উপর ধরি। এক জনে নাড়ি ধরে আছে, বন্ধ হয়ে যায় কখন বুঝি ঝড়াক করে।

কিন্তু পাথুরে প্রাণ বিনয় দত্তর, শেষ হয়ে যাওয়া সহজ নয়। ধমকটা সামলে নিয়ে নিজেই বলে ওঠেন, নামালে কেন গো? ক্লান্ত হয়ে পড়েছ? ওঠো এইবার।

শেষ রাতে বাসে তুলে দিলাম। তুই বেঞ্চির ফাঁকে পুরু করে খড় দিয়ে তার উপর শতরঞ্চি পাতা—দিব্যি যেন এক গদি। বাস আস্তে আস্তে চালাচ্ছে। বাড়ি ফিরলাম তখন ফরশা হয়ে এসেছে, পাখপাখালি ডাকছে। পিঁড়ি পাতা রয়েছে তেমনি রান্নাঘরের দাওয়ায়।

পরের কথাও বলি। সদরের হাসপাতাল ভরসা করতে পারেনি, বিনয় দত্তকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিল। সেখানকাব বড় বড় ডাক্তাববা নাকি অবাক। এমন তাজ্জব কী কবে ঘটে! যেন খুব পাকা সার্জেন হিসাবপত্র করে কোন অস্থি কোন শিরা-উপশিরা জখম না হয়, এমনিভাবে সড়কি বসিয়ে দিয়েছে। আধ ইঞ্চি এদিক-ওদিক হলে রক্ষা ছিল না।

ড্যাং-ড্যাং করে বিনয় ফিরে এলেন। উচু গলা আরও ডাগুর হয়েছে। নতুন নতুন গল্প ছাড়ছেন কলকাতা হাসপাতালের। তবে উকিলমশায়ের চাকরিটা ছাড়লেন এবার। মহা কঞ্জুষ লোকটা—বারো টাকায় আট আটটা বছর খাটিয়ে এবারে এই সড়কির দুর্ঘটনার পরে আট আনা বেতনবৃদ্ধি দিয়েছে। অর্থাৎ মাইনে মোটমাট সাড়ে-বারোয় দাঁড়াল। মাইনে জিনিষটা অবশ্য কিছুই নয়—গোমস্তাগিরি কাজ বিনি-মাইনেয় করেও পুষিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু শড়কির আশঙ্কা থেকে যায়, এই হল বিপদ।

॥ চব্বিশ ॥

ভাঙাচোরা দালানকোঠা—দত্তবাড়ি এসে পড়লাম। যে বাড়ির এক মূর্তি বিনয় দত্ত। বিনয় দত্তরা নেই আর গ্রামে। দত্তদের ঘরে ঘরে লোক গিসগিস করত—সমস্ত চলে গিয়ে এখন একজন মাত্র, একটি প্রাণী সৌদামিনী ঠাকরুনে ঠেকেছে। বালির দত্ত তীর্থবাসী বসবাসের জন্য গাঁয়ের ঠিক মাঝখানে এই জায়গা পছন্দ করে নিয়েছিলেন নালু গোঁসাইয়ের কাছ থেকে। দত্তদের বাড়বৃদ্ধি বিস্তর হয়েছিল—ধনে জনে সকল দিকেই। আজকে জঙ্গল, পা ফেলতে ভয় করে।

তাকিয়ে তাকিয়ে কি দেখেন—চণ্ডীমণ্ডপের অবশেষ। এই চণ্ডীমণ্ডপে আমাদের পাঠশালা বসত—শশীপণ্ডিতের পাঠশালা। কী জাঁকজমক তখন দত্তবাড়ির! শরিকদের মধ্যে প্রধান বিরিঞ্চি দত্ত। বনকরে চাকরি করতেন, শীতকালে বাদা থেকে নৌকো বোঝাই হয়ে ধান মধু ও সুঁদুরিকাঠ আসত। এমনি কাণ্ড—বাড়ির বেড়া ঘেরা হত মূল্যবান সুঁদুরিকাঠে, দায়ে-দরকারে উনুনের জ্বালানিও হত। সরকারি সম্পত্তি দু-হাতে সরাচ্ছেন, লোকে বলাবলি করত। হাঁদারাম উপরওয়ালারা এমন দিনে-ডাকাতিও ধরতে পারে না!

সৌদামিনী ঠাকরুনের তখন বিষম প্রতাপ। বিরিঞ্চি দত্তর তিন সংসার, তার মধ্যে ইনি হলেন মেজ। গোড়ার বউ বাঁজা, সৌদামিনীও তাই। শেষটা সৌদামিনীই জোর করে বিরিঞ্চিকে তৃতীয় বিয়েয় বসালেন। এই বিয়ে সফল—এক ছেলে দুই মেয়ে পর পর। ছেলে সুরেন।

ফাঁকা বাড়ি আজ। সুরেন হিন্দুস্থানে সরেছে। সৌদামিনীর দুই সতীন এবং স্বামী অনেক দিন মারা গেছেন। বিধবা একাকী শ্বশুরবাড়ির ভিটা আগলে আছেন। সারা গ্রাম কুড়িয়ে বুড়ো-

হাবড়া আছেন এমনি কয়েকটি। আঙুলে গণা যায়। একজন শশীপণ্ডিত মশায়। আর একজন আদিত্যনারায়ণ। আদিত্য-দা আছেন অথচ তাঁর ঘোড়া নেই, এমন অঘটনও ঘটে গেল দুনিয়ার উপর।

অ-আ ক-খ'র পয়লা পাঠ আমার শশীপণ্ডিতের কাছে। শশিভূষণ পাল—পণ্ডিতমশায়ের পুরো নাম। চণ্ডীমণ্ডপের কঙ্কাল দেখতে পাচ্ছেন—পাঠশালা ওইখানে। পণ্ডিতের বয়স তখন খুব একটা-কিছু নয়, কিন্তু জীর্ণশীর্ণ হাড্ডি-সার চেহারা। মাথা খুঁজে একটি কালো চুল পাওয়া যাবে না—আদ্যিকালের বুড়োমানুষ যেন একটি। হস্তাক্ষরটি বড় ভাল, পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে পুঁথি-পত্র নকল করেন তুলোট কাগজে। দুই রকমের কাজে রোজগাব মোটামুটি ভালই—পাঁচ-ছ'টাকা মাসে। আপন বলতে কেউ নেই। মাবাপ-মরা এক ছোঁড়াকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন, দুটো প্রাণীর এই টাকায় রাজাব হালে চলে যায়। উপরিও আছে—

সকালবেলা একদিন সৌদামিনী ঠাকরুন সুরেনকে পাঠশালায় দিতে এলেন। ছেলের সঙ্গে প্রকাণ্ড সিধে পণ্ডিতের জন্য। বনকবের চাকরি ছেড়ে বিরিঞ্চি দত্ত এই সময়টা বাড়ি এসে উঠেছেন। শুনিয়ে বেড়ান: দূর দূর, গোলামি আর নয়। খুব সম্ভব তাড়িয়েই দিয়েছে তাঁকে, অমন সোনার গোলামি নয়তো কেউ নিজের ইচ্ছেয় ছাড়ে না। বাড়ি এসে ধুমধাড়াক্কা লাগিয়েছেন। পৈতৃক পুবানো দালান জীর্ণ হয়ে গেছে, কখন যে ভেঙে পড়বে কেউ জানে না। বিরিঞ্চি নিজ অংশে একখানা আটচালা এবং খান তিনেক পাঁচ-চালা ঘর ইতিপূর্বেই বেঁধে নিয়েছিলেন। চাকরি ছেড়ে এসে এইবার কয়েকটা হাল-ফ্যাশানের কুঠুরি তোলার মতলব হল। দালান ভেঙে পুরানো ভিতের উপর কুঠুরি উঠবে, সমারোহে তোড়জোড় চলেছে।

সৌদামিনী ঠাকরুন ধরে বসলেন: ছেলে মুখ্যু হয়ে যাচ্ছে, পাঠশালায় দিতে হবে এইবার।

কবে বুঝি শশীপণ্ডিতের খালি গায়ের উপর বিরিঞ্চির নজর পড়েছিল। তিনি বললেন, শশীপণ্ডিত আর ক'দিন! একবার এঁর কাছে একবার তাঁর কাছে—সে পড়ায় জুত হয় না। একটা-দুটো মাস সবুর করো, নতুন পণ্ডিত একটি জুটিয়ে আনি।

শশীপণ্ডিতের পরমায়ু নিয়ে অনেকেরই এমনি সংশয় ছিল, তারা নিজেরাই কবে ফৌত হয়ে গেছে। বিরিঞ্চি দত্তও গেছেন। শশীপণ্ডিত কিন্তু সশরীরে বর্তমান আজও।

স্বামীর কথা সৌদামিনী কানে নেন নি। শুভক্ষণ দেখে সুরেনের হাত ধরে পাঠশালায় এসে উঠলেন। মাহিন্দারের কাঁধে ধামা, রুইমাছ একটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে আসছে। ছেলে পাঠশালায় দিচ্ছেন, ষোলআনা সিধে সাজিয়ে সঙ্গে এনেছেন। সুরেনকে বললেন, গড় কর্।

প্রণাম করে মাথা তুলতে দেখা গেল পণ্ডিতের পদতলে চকচকে রুপোর টাকা। বিরিঞ্চি হেন মানুষের স্ত্রীর পক্ষেই সম্ভব এতখানি। বললেন, সরস্বতী-পুজোর দিন আমার সুরেনের হাতে-খড়ি দিয়েছি। এবারে পণ্ডিতমশায় আপনার দয়া।

নতুন ছাত্রকে শশীপণ্ডিত কোলের মধ্যে টেনে নিলেন। বললেন, ছেলের রাজলক্ষণ মা। ধনে-মানে বিদ্যে-বুদ্ধিতে দত্তবাড়ির মুখ উজ্জ্বল করবে। পরিণামে মিলিয়ে দেখে নেবেন।

মাথার উপরে সিকে ঝুলছে, পণ্ডিত সেদিকে হাত বাড়ালেন। সিকেয় চিত্রিত হাঁড়ির মধ্যে পাটালি বীরখণ্ডি, এবং হাজু ময়রার দোকানের চিনির-পুতুল। চিনির-পুতুলের নামে এ বয়সেও রসনা সিক্ত হয়—কত দেশবিদেশ ঘুরেছি, হাজুর মতন কারিগর দেখলাম না। হাঁড়িটা পণ্ডিতের নাগালের মধ্যে, ক্ষণে ক্ষণে হাত ঢোকাবার প্রয়োজন পড়ে। একটা শক্ত অঙ্ক কষেছি তো এক টুকরো পাটালি। শ্রুতলিখন নির্ভুল হয়েছে তো বীরখণ্ডি। হাতে হাতে নগদ পুরস্কার। আজকাল হয়েছে—বছর শেষ হবে, ভারী ভারী মানুষ এসে বক্তৃতা

করবেন, তারপরে পুরস্কার। শশীপণ্ডিতের পাঠশালে সে ব্যাপার নয়।

তালপাতায় আঁকজোক কেটে পণ্ডিত সুরেনের হাতে দিলেন : হাঁড়ি-কলসি লেখ্ এমনি সুরেন, আঙুলের ডগায় যা আসে লিখে যাবি। ক'দিন পরে ন্যাড়াসেজির আঠা দিয়ে তালপাতায় অ-আ লিখলেন—সাদা আঠার উপরে কাঠকয়লার গুঁড়ো ছড়িয়ে লেখা কালো-চকচকে হল। বললেন, দাগা বুলিয়ে যা এব উপর।

বই পড়ার ব্যাপার নেই—লেখা আব লেখা। তালপাতার লেখা রপ্ত হল তো কলাপাতা। আবার সেইদিন সৌদামিনী পাঠশালায় দর্শন দিলেন। ধামা-ভরা সিধে, এবং একখানা নতুন ধুতি পণ্ডিতের জন্য।

এক বিকালে আকাশ বড় মেঘলা, চণ্ডীমণ্ডপের ভিতরটা আঁধার হয়ে গেছে। আমরা সব কলরব লাগিয়েছি : সন্ধ্যে হয়েছে, ছুটি হোক এবারে।

ছুটির ব্যাপারে শশীপণ্ডিত বড় নাবাজ। বিবেচনাহীন ঈশ্বর সময়ের অর্ধেকখানি রাত করে দিয়েছেন, পাঠশালা সেই সময়টা বন্ধ না রেখে উপায় নেই। নইলে বোধহয় শশীপণ্ডিত অবিরাম ছেলেপুলে নিয়ে বসে থাকতেন।

সন্ধ্যা হওয়ার প্রসঙ্গে পণ্ডিত খিঁচিয়ে উঠলেন : এক পহর বেলায় সন্ধ্যে অমনি হলেই হল!

আমি এক-ছুটে গিয়ে হেড়াঞ্চির ডাল ছিঁড়ে নিয়ে আসি : পাতায় পাতায় জুড়ে গেছে, এই দেখুন—

বেলা ডোবার সঙ্গে সঙ্গে হেড়াঞ্চির দু-পাতা একত্র হয়, সেজন্য গাছের আর এক নাম কালকপাটি। কাল বুঝে দরজার কপাট পড়ে যায় আর কি! আমি কিন্তু থুতু দিয়ে পাতা এঁটে এনেছি। ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে বেলা এগিয়ে দেয়—তারই রকমফের।

এত বজ্জাতি ভালমানুষ পণ্ডিতের মাথায় যায় না। বিরস-মুখে ছুটির সম্বন্ধে কি-একটু বলেছেন কি না বলেছেন—লাফাতে লাফাতে সকলে আমরা চণ্ডীমণ্ডপের নিচে উঠানের উপর।

হঠাৎ পণ্ডিত চেঁচিয়ে উঠলেন : যাবি নে কেউ, শোন্—

এত করেও সন্ধ্যাটা বুঝি আনা গেল না।

বলছেন, শুনতে পাসনে, কালা নাকি তোরা সব?

তাই বটে! সোরগোল তুলে রকমারি বাজনা বিলপারের দিক থেকে গাঁয়ের উপর উঠল। বিয়ে করতে বর চলেছে। বিষম উৎসাহ আমাদের। লেখাপড়াটা বাদ দিয়ে যে কাজে বলবেন, তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ব।

বর হাটখোলা মুখো যেতে পারে পণ্ডিতমশায়। বেড় দিয়ে নিয়ে আসি?

আদেশের অপেক্ষা না রেখে সকলে হৈ-হৈ করে ছুটেছি। বিয়ে করতে চলেছে তো পাঠশালার রাস্তা ধরে যাবে। ঘুরপথ হোক যা-ই হোক, ছাড়াছাড়ি নেই।

জাঁকজমকের বিয়ে। পালকি লোকে একখানাই জোটাতে পারে না, এদের চার চারখানা। বরের পালকি পুরুতঠাকুরের পালকি বাকি দুখানা বাচ্চা ছেলেয় ঠাসা। বাজনারও বাহার খুব। প্যাণ্টলুন-পরা বাজনাদারে বিলাতি বাঁশি আর জগঝম্প বাজিয়ে বরের আগে আগে যাচ্ছে, পিছনে আর এক প্রস্থ দেশি বাজনদারের ঢোল-কাঁশি-শানাই।

রাস্তার ধারে এসে শশীপণ্ডিত আদেশ করেন : পালকি নামাও।

পণ্ডিত যেন সেনাপতি, ডাইনে-বাঁয়ে আমরা সৈন্যসামন্ত।

বিল ভেঙে এসে বেহারারা ক্লান্ত। এককথায় পালকি নামিয়ে কাঁধের গামছা দিয়ে বাতাস খাচ্ছে। বরকর্তা পিছিয়ে পড়েছিলেন, হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। সিকি বের করে এগিয়ে ধরে বললেন, আপনিই তো পণ্ডিতমশায়?

শশী ঘাড় নাড়েন : সিকিতে হবে না।

বরকর্তা বলেন, রেট তো তাই। পাঠশালায় সিকি, লাইব্রেরিতে সিকি। বারোয়ারি হলে তখন ডবল মান্য—আধুলি সেই ক্ষেত্রে।

বাজনা শুনে পাড়ার লোক জুটেছে। বর দেখছে—কোন্ গ্রামে কাদের বাড়ি বিয়ে,পাওনাথোওনা কি রকম—পরিচয় নিচ্ছে সবিস্তারে। জবাবটা তারাই দিয়ে দিল : দু-টাকা মনের চাল পাঁচ টাকায় উঠে গেছে মশায়, মান্ধাতার আমলের সেই সিকির মান্য ধরে থাকলে হবে কেন?

বিয়ের লগ্ন সন্ধ্যারাত্রে, তার উপর আকাশের অবস্থা ভাল নয়। বিয়েবাড়ি তাড়াতাড়ি বর হাজির করে দেওয়া দরকার। বরকর্তা তর্কাতর্কিতে না গিয়ে ছ-আনায় রফা করে নিলেন। মান্য শোধ করে বেহারাদের বলেন, পালকি তোল্। বাজনদারদের বলেন, বাজা রে বাজা—

শশীপণ্ডিতকে কে-একজন বলেছিল, রবিবারটা অন্তত বন্ধ দেওয়া উচিত। পণ্ডিত ধমক দিয়ে ওঠেন : রবিবার বলে নাওয়া-খাওয়া বন্ধ থাকে তোমাদের? সেইটে করো, তারপর ছুটির কথা।

ছুটি তা বলে কি একেবারে নেই! গাঁয়ের উপর পুজোআচ্চা বিয়ে-অন্নপ্রাশন কি অপর কোন আমোদ-উৎসব হোক, নিশ্চয় তখন ছুটি। যজ্ঞিবাড়ি পণ্ডিত নিজে চলে যাবেন, ছেলেরাও যাবে। গাঁয়ে দুর্গোৎসব হয় না, দুর্গাপূজোর অতএব ছুটি নেই। বাস্তুপূজোয় পুরো বেলা ছুটি। শশীপণ্ডিতের বিচার-বিবেচনা নেই, এমন কথা কেউ বলতে পারবে না।

শীতকালে সেবার খাঙালি-দীঘির পাড়ের জঙ্গলে ফেউ ডাকতে লাগল। শিয়ালে লেজ মুখে পুরে বিচিত্র আওয়াজ তোলে, তাকে বলে ফেউ। কোন হিংস্র বড় জানোয়ার এসেছে, তার সঙ্কেত—ফেউ ডেকে শিয়াল সতর্ক করে দেয়। শশী সঙ্গেসঙ্গে ছুটি দিয়ে দেন। অবোধ ছেলে-পুলে নিয়ে কাজ, কোনটা কোন্‌দিকে ছিটকে পড়ে ঠিক কি! তার চেয়ে যে মায়ের বাছা, তাঁর আঁচলের তলে গিয়ে উঠুক।

সত্যিই এসে গেছে, দু-একদিনের মধ্যে ভাল রকম টের পাওয়া গেল। ঠাণ্ডা সর্দারের গাইগরু হাম্বা রব দিয়ে মাঠ থেকে ছুটতে ছুটতে এলো, মুলে-বাছুব সঙ্গে নেই। আধেক-খাওয়া সেই বাছুর পরের দিন দীঘির পাড়ের জঙ্গলে পাওয়া গেল। সামাল-সামাল পড়ে গেছে। দিনমানে বেরোতে হলেও লোকে দল বেঁধে লাঠিসোটা নিয়ে বেরোয়।

গ্রামের এত বড় বিপদের মধ্যে সৌদামিনী ঠাকরুনের কিঞ্চিৎ ব্যাপারবাণিজ্য হচ্ছে। গোপন মহাজনি কারবার তাঁর—সব চেয়ে বেশি গোপন স্বামী বিরিঞ্চি দত্তব কাছে। বাড়িতে পাকা-কুঠুরি দেবার আয়োজনে বিবিঞ্চিব বিস্তব খরচপত্র—টের পেলে ঠাকরুনের যাবতীয় মূলধন তিনি একাই কর্জ নিয়ে নেবেন। ফলাফলের খুব যে ইতরবিশেষ, তা নয়। কিন্তু সৌদামিনী ঠাকরুনের বিশ্বাস, তাঁর প্রতিটি খাতক সত্যাশ্রয়ী—এখন না পারুক, কোন একদিন সুদ সহ সমস্ত টাকা পারিশোধ করে যাবে। স্বামীর বেলা সে বিশ্বাস নেই। ঠাণ্ডা সর্দার পুবানো খাতক তাঁর, কর্জ অনেকবার নিয়েছে—শোধ করেনি, তা-ও ঠিক। কিন্তু একটা বড় গুণ, গোড়ার এক মাসের সুদ হাতে হাতে অগ্রিম দিয়ে যায়।

আমি জানি কিছু কিছু বৃত্তান্ত, আমার সামনেই একবার—

ঠাণ্ডা সর্দার এসে বলল, একটা টাকার বড় গরজ।

সৌদামিনী রাগ কবে উঠলেন: আগেও তিন-চার বার নিলে, সে টাকা শোধ দিয়েছ?

ঠাণ্ডা চটে গেল, সমান তেজে জবাব দেয়: শোধ না দিই, সুদ তো নিয়ে নিয়েছ। মানুষটা কম তুমি ঠাকরুন—সুদ আগে কেটে নিয়ে তবে টাকা দাও।

চড়া সুদ সৌদামিনীর—টাকা প্রতি মাসিক দু-আনা। ঠাণ্ডা সর্দার তাতেই রাজি। এবং প্রথম মাসের সুদ দু-আনা অগ্রিম দিয়ে চোদ্দ আনা গাঁটে গুঁজে বেরোল।

সেই আমার স্বচক্ষে দেখা ছিল।

বাঘে বাছুর মেরেছে, বিপন্ন ঠাণ্ডা সর্দার এবারেও ঠাকরুনের কাছে ধর্না দেয়। বলে, অপঘাতে গেছে—গোবধের পাপ আমার ঘাড়ে। ঠাকুরমশায় ব্যবস্থা দিলেন। প্রাচিত্তিরের ছুটো টাকা না দিলে কিছুতে হবে না ঠাকরুন।

কায়দায় পেয়ে ঠাকরুন পুরানো প্রাপ্যের তাগিদ করেন: আমার আগের টাকা?

সে যখন পারব, তখন দেবো। পালিয়ে যাচ্ছি নে গাঁ থেকে—

সন্ত্রস্ত হয়ে সৌদামিনী বলেন, আস্তে করে বলো বাপু। কর্তার কানে গেলে রক্ষে থাকবে না। টাকা আমার হাতে নেই, দেওয়া যাবে না।

ঠাণ্ডা সর্দার আরও গলা চড়িয়ে বলে, শোধ দিতে পারিনি বলে তাড়িয়ে দিচ্ছ ঠাকরুন। মহাজনে সুদ পেলে খুশি, সে সুদ তো আগেভাগে কেটে নিয়েছিলে। এবারও তাই করো।

সৌদামিনী এতটুকু হয়ে গিয়ে বলেন, ঝঞ্ঝাট করিস নে বাপধন। নিয়ে যা টাকা। কর্তা যদি কিছু জিজ্ঞাসা করেন, সাফ বেকবুল যাবি। আমি টাকা দিই, তুই কর্জ নিস—কেউ যেন জানতে না পারে। এ-কানে ও-কানে কথা বড্ড ছড়িয়ে যায়।

কর্জ অতএব দিতেই হল—যে রকম চেঁচাচ্ছে, না দিয়ে রক্ষে ছিল না। ছু-টাকার সুদ চার আনা আগাম কেটে নিলেন। সুদের পয়সা সৌদামিনী আলাদা কৌটোয় রাখেন। তাঁর নিজস্ব রোজগার—এ জিনিষে বড্ড মায়া। সুদের কৌটো ভরে এসেছে। প্রসন্ন মুখে মাঝে মাঝে নেড়েচেড়ে দেখতেন। আমি একবার সেই সময় গিয়ে পড়েছিলাম। বেকুব হয়ে দত্ত-জেঠাইমা সামাল করে দিলেন: বলবি নে কাউকে—খবরদার, খবরদার!

নিশিরাত্রে দত্তবাড়ি আগুন লাগল। গোয়ালে সব লের আগে—সেইজন্যে অনুমান, সাঁজাল থেকে লেগেছে। গোয়ালের মশা তাড়াবার

জন্য তুষ-ঘুঁটে সাজিয়ে সাঁজের বেলা আগুন দিয়ে যায়। বাঘ এসেছে বলে এই ক'দিন বেশি করে দিচ্ছে—আগুন সারারাত থাকবে, আগুনে ভয় পেয়ে বাঘ গোয়ালে ঢুকবে না। কেমন করে সেই আগুন ছড়িয়ে গিয়ে মাচার উপরের শুকনো নারকেলপাতা ও কাঠকুটোয় লেগেছে, সেখান থেকে চালে। কেউ কেউ বলছে, শত্রুতা করে আগুন দিয়ে গেছে কেউ। না হতে পারে এমন নয়। বিরিঞ্চি লোক সুবিধের নন, চাকরি ছেড়ে গাঁয়ে এসে দিনকে দিন শত্রু জোটাচ্ছেন। তার উপর টাকাকড়ি হয়েছে। টাকাকড়ির মানুষকে কে কবে ভাল চোখে দেখে!

দাউ-দাউ করে গোয়াল জ্বলছে, ঘুম ভেঙে লাফিয়ে উঠে বিরিঞ্চি সর্বাগ্রে গরুর দড়ি কেটে দিলেন। অবোলা জীবগুলো ছুটোছুটি করছে। আগুন লাগা ব্যাপারটাকে বলে লালঘোড়া দাবড়ানো। সত্যি তাই। অমিততেজ শত শত লালঘোড়া যেন অন্ধকার আকাশে লাফালাফি জুড়েছে, এ-চাল থেকে লাফিয়ে ওই-চালে গিয়ে পড়ছে। দেখবার জিনিস বটে! গাছপালার মাথা লালে-লাল। বাঁশের গেরো ফেটে দুমদাম বন্দুকের আওয়াজ—আগুনের গোলা আকাশের উঁচুতে উঠছে।

গেল গেল—বলে বিরিঞ্চি দত্ত বুক চাপড়াচ্ছেন: সর্বস্ব গেল রে আমার—পথের ভিখারি হলাম। হায় ভগবান, হায় ভগবান!

পাড়ার মানুষ ভেঙে এসে পড়েছে, রাজ্যের ভাঁড়-কলসি জুটিয়ে জল ঢালছে। আটচালা ঘরটা আসল, সেই ঘর যদি রক্ষে হয়। মই লাগিয়ে জন আষ্টেক মটকার উপর উঠে পড়েছে, নিচে থেকে অনেকে জলের যোগান দিচ্ছে। আগুন ক্রমশ চতুর্দিক ঘিরে এলো—আর বুঝি ঠেকানো যায় না।

সৌদামিনী সেই আটচালা ঘরে। তাঁর নিজস্ব জিনিসপত্র তখনো সব বেরিয়ে আসেনি। অকুতোভয়ে গোছাচ্ছেন। বিরিঞ্চি ব্যাকুল

হয়ে চিৎকার করেন: করো কি মেজগিন্নি? চাল ভেঙে পড়বে মাথায়।

কেবা শোনে কার কথা! সুদের পয়সার কৌটো সৌদামিনী আঁচলে ভাল করে গিঁঠ দিয়ে বাঁধলেন। বিছানার চাদর মেজেয় পেতে টুকিটাকি জিনিস এনে ফেলছেন তার উপর। বোঁচকা বাঁধাও শেষ—দেখেশুনে ধীরেসুস্থে সব হয়ে গেল। সেই প্রকাণ্ড বোঁচকা দু-হাতে পাঁজা করে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। কেউ কিছু বলবার আগে তীরবেগে পুনশ্চ ঢুকেছেন। এবারে তারের জাল-দেওয়া বাক্স—আরশুলা ঠেকাতে যার মধ্যে পানের মসলা, বড়ি, আমসত্ব ইত্যাদি রাখা হয়। আবার যেতেন, কিন্তু বিরিঞ্চি দত্ত শক্ত মুঠোয় হাত ধরে ফেললেন: ক্ষেপে গেছ মেজগিন্নি? আত্মহত্যা করতে চাও?

জিনিষপত্রের মোটামুটি ব্যবস্থা হয়ে গিয়ে সৌদামিনী অনেকখানি নিশ্চিন্ত। তালপাতার হাতপাখা অবধি বোঁচকায়। বোঁচকার উপর বসে পাখা নাড়তে নাড়তে বলেন, সুরেনকে কার কাছে দিয়েছ?

বিরিঞ্চি চমকে উঠলেন, তাই তো খোকা—কী সর্বনাশ, খোকা যে রয়ে গেছে ঘরে!

সৌদামিনী কেঁদে বলেন, তোমাব সঙ্গে এক খাটে ছিল, তাকে ফেলে তুমি গরু বের করতে ছুটলে?

মশারির মধ্যে সুবেন, মশারি তুলে সৌদামিনী আব দেখতে যাননি। গুঞ্জন উঠছিল: তুমিই বা কী ঠাকরুন, তালপাতার পাখা অবধি আনতে পারলে আগুনের তাপে হাওয়া খাবে বলে—

কিন্তু মুখের গালি মুখে থেকে যায়, জ্বলন্ত চালের খানিকটা পড়ে দরজার পথ আটকে গেল। আর্তনাদ করে সৌদামিনী চক্ষের পলকে সেই আগুনে গিয়ে পড়লেন।

আর দেখলাম শশীপণ্ডিতের ব্যাপার। নিশিরাত্রে তিনিও এসে পড়েছেন। রোগা-লিকলিকে মানুষটির গায়ে যেন অসুরের বল।

সৌদামিনীর সঙ্গে তিনিও ছুটলেন। পলকের ব্যাপার—কে আগে কে পিছে, ঠাহর হল না।

ছেলে উদ্ধার করে নিয়ে বেরোলেন। অদ্ভুত ঘুমকাতুরে ছেলে—ঘটনার কিছুই জানে না, শীতের রাত্রে অগ্নিতাপে আরাম করে ঘুমোচ্ছিল। তাপটা চড়া রকমের হয়ে সবেমাত্র জেগেছে। ভয় পেয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে এঁরা গিয়ে পড়লেন।

বিপদটা বাইরে এসে। দরজার আগুন পার হয়ে শশীপণ্ডিত লাফ দিয়েছেন—দাওয়া থেকে উঠানে গড়িয়ে পড়লেন। কী হল, কী হল—করে সকলে ঝুঁকে এসে পড়ে। শশী বলেন, কিচ্ছু হয়নি, সুরেনকে দেখ তোমরা। আগুন তার গায়ে ঠেকেনি—ছোট ছেলে ভয় পেয়েছে বড্ড।

নিজের কথা উড়িয়ে দিলেন, কিন্তু পায়ে বিষম চোট লেগেছিল। সেই থেকে বরাবর খুঁড়িয়ে চলতেন। অমাবস্যা-পূর্ণিমায় পা ফুলে উঠে শয্যা নিতে হত। সেবারে এসে শুনলাম, হাঁটার শক্তি একেবারে হারিয়েছেন, চোখেও দেখেন না। শুয়ে শুয়ে দিন কাটে। দেখতে গেলাম পণ্ডিতমশায়কে, পায়ের ধুলো নিয়ে এলাম। তখন এক ভারি মজা হয়েছিল। বলছি পরে, আগে এটা শেষ করে নিই।

অগ্নিকাণ্ডের পরের দিন আবার এক উৎপাত। বাঘ দেখা দিয়েছে। কী অভিশাপ দত্তবাড়ির উপর—চণ্ডীমণ্ডপের পাশে কাঁঠালগাছ, বাঘ সেই গাছে চড়ে বসে আছে। রাত্রে যেসব লোক পেরে ওঠেনি, সকাল থেকেই তারা সব বিরিঞ্চি দত্তর সর্বনাশ দেখতে আসছে। তাদেরই একজন উপর মুখো তাকিয়ে বাঘ দেখে ফেলল।

খবরটা চাউর হয়ে গিয়ে দূর-দূরান্তর থেকেও লোক ছুটেছে। মেলায় পয়সা নিয়ে বাঘ দেখায়, এ বাঘ বিনি-পয়সার। ঘর পুড়ে কী এমন ক্ষতি বিরিঞ্চি দত্তর—দালানের ভিত বাঁধা হয়েছে, দুদিন পরে নিজে থেকেই খোড়োঘর ভেঙে ফেলতেন। উঠানের উপর বাঘ—

বাঘে যদি কিছু করতে পারে, দেখা যাক। দুর্ধর্ষ বাঘ বটে! এত মানুষ দেখেও নড়াচড়া নেই, মানুষ যেন পোকামাকড়ের সামিল। ওত পেতে রয়েছে, দোডালার পাতালতার ভিতর থেকে জুলজুল করে দেখছে। পছন্দসই কাউকে কায়দার মধ্যে পেলেই বোধহয় ঝাঁপিয়ে পড়ে।

নিকটবর্তী কালকাসুন্দে-ঝোপে সকলে লাঠি পেটাচ্ছে, ক্যানেস্তারা বাজাচ্ছে। এমনি সময় সড়কি কাঁধে ঠাণ্ডা সর্দার হাজির। বাছুর মেরেছিল, সেই রাগে কাঁপছে। আমগাছের দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার দিয়ে পড়েঃ আয় রে—

মানুষটাকে ক'জনে ধরে ফেললঃ কী হচ্ছে ঠাণ্ডা সর্দার? গোঁয়ার্তুমির কাজ নয়, বাঘ ডাকছ তুমি কোন বিবেচনায়?

ঠাণ্ডা সর্দার কানেও নিল না। সকলকে ঠেলে সরিয়ে একেবারে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়ায়ঃ চলে আয়, গাছে বসে চোখ পাকাস কেন? অবোলা বাছুর মেরে খেয়েছিস, বাপের বেটা হোস তো নেমে এসে সামনাসামনি দাঁড়া।

বাঘ ভ্রূক্ষেপও করে না। অবহেলায় চোখ বুজে পড়ল, মনে হচ্ছে। কে-একজন এরই মধ্যে রসিকতা করে ওঠেঃ ও নামবে না, তুমিই উঠে যাও ঠাণ্ডা সর্দার। কোলে করে নামিয়ে আন।

ঠাণ্ডার কণ্ঠস্বর করুণ হয়ে উঠল। বলে, পারলে কি আর বলে দিতে হত? দু-হাত ভরা খোসপাঁচড়া, ডাল ধরে উঠি কেমন করে? সড়কিটাও, দেখতে পাচ্ছ, হাতে ধরতে পারি নি—কাঁধে ফেলে আনতে হল।

ঠাণ্ডা সর্দারের কাজ নয়, অঞ্চলের সেরা শিকারি পঞ্চু হালদারের কাছে লোক ছুটল। বন্দুক দিয়ে এসে পড়ুক।

গেলো কেমন? বাড়ি নেই পঞ্চু, পাখি মারতে হংসের বিলে নেমে পড়েছে। সেই অবধি চলে যেতে হয়।

হালদার-ভাই, একটা বাঘ মেরে দিয়ে যাও।

পঞ্চু বলে, পাখি মেরে মাংস খাব, বাঘ মেরে কি হবে ?

লোকের উপকার। বাঘ শিকারি বলে নাম হবে তোমার। আমডালের উপর বাঘ তাকিয়ে রয়েছে, কখন কার ঘাড়ে পড়ে ঠিক-ঠিকানা নেই।

পঞ্চু হালদার ধমকে ওঠে: যাও, যাও। নাম বিস্তর হয়েছে—নইলে বিল ভেঙে তুমিই বা এত কষ্ট করে আসতে যাবে কেন ? উপকারের সময়-অসময় আছে—মাঝ-বিল থেকে যাচ্ছি এখন উপকার করতে!

মুফতে হবে না, কাজেব কথায় আসতে হয়: কাদায়-জলে ঘুরে ঘুরে পাখি মারবে, পাখি না-ও পড়তে পারে। সে হল খটখটে ডাঙার উপরের কাজ। বাঘ যদি মারতে পারো বড়-মোরগ একটা—পাকা-পাকি কথা হয়ে বইল।

মোরগেব কড়াবে পঞ্চু দত্তবাড়ি এসে উঠল। নজর ফেলেই বলে, আসল মানুষখেগো—সুন্দববনেব আমদানি।

ডোরা-কাটা চেকনাই চেহারা দেখে সে পরিচয় মিথ্যা মনে হয় না। তবে আয়তনে বড্ড ছোট যেন।

পঞ্চু হালদাব রায় দিল: বয়স কম বলে দেখতে ছোট। এদের নিয়ে বেশি বিপদ। ভয়ডব নেই, তাকাচ্ছে কী রকম চেয়ে দেখ না। বড্ড বিপদে ফেললে হে তোমরা—

আমগাছেব চারিদিক ঘুরেফিরে দেখে পঞ্চু হুকুম দিল: ছররায় মরবে না, জালের কাঠি আনো।

সে কোথায় পাওয়া যায় ?

তবে থাকল—

বলে পঞ্চু সঙ্গে সঙ্গে বিলের দিকে আবার পা বাড়ায়। বিরিঞ্চি ব্যাকুল হয়ে বলেন, খেপলা-জাল নতুন বানিয়েছি—জাল কেটে কাঠি বের করে আনো। প্রাণের চেয়ে জাল ব[illegible] নয়।

হল তাই। আশ্চর্য বাঘ—জালের কাঠির কঠিন গুলি খেয়েও গাছ

থেকে নামে না। গলায় একটু আওয়াজ তুলল—ঠিক মানুষখেগোর গর্জন বলেও মনে হয় না, মিনমিনে কান্নার মতো। সকলের দিকে একবার বাঘ চোখ ঘুরিয়ে নিল, তারপর ঘাড় ভেঙে পড়ে। একেবারে নিস্পন্দ। শিকারি পঞ্চু তা বলে ছাড়বাব পাত্র নয়—এই সব ভয়ানক জন্তু বেঁচে থেকেও অনেক সময় মরার ভান করে পড়ে থাকে। বারুদ ঠেসে ঠেসে সামনে-পিছনে ডাইনে-বাঁয়ে সকল দিক দিয়ে দেওড় করে। তারপর চণ্ডীমণ্ডপের বাবাণ্ডায়উঠে নিদারুণ শ্রমেপঞ্চু হাঁপাতে লাগল।

এত কাণ্ডের পর বাঘ না মরে পারে না। দুঃসাহসী এক ছোঁড়া গাছে উঠে লেজ ধরে টান দেয়। লেজ ধরে ঝুল খেয়ে পড়ল শেষটা। ও হরি, দোডালার মধ্যে মোক্ষম আঁটা এঁটে গেছে—ইঁদুরের জাঁতিকলে পড়বার মতো। সেই জন্যে বাঘ নড়তে চড়তে পারে নি—সকলের দিকে চেয়ে চেয়ে ওইরকম সকরুণ কাতরানি।

লোকসানের কপাল পড়েছে বিরিঞ্চি দত্তব। পদ্মকোষা কাঁঠালগাছের বড় ডালখানা কেটেফেলে তবে বাঘের উদ্ধার হল। বাঘও ঠিক নয়, আসল-বাঘ গাছে চড়ে না—গোবাঘা। বাছুরেব লোভেই বোধহয় গোয়ালের এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করছিল, আগুন হঠাৎ দাউদাউ করে ওঠায় ভয় পেয়ে গাছে উঠে পডেছে। উঠে তারপরে আর নামবার অবস্থা রইল না।

কতকালের কথা, ছেলেমানুষ আমি তখন। বিরিঞ্চি সেই ভিত কেটেছিলেন, দালানের কাজ অনেক বছব ধরে ধীবেসুস্থে এগিয়ে চলল। পাড়াগাঁয়ের কাদার গাঁথনি—শীতকালে খানিকটা করে দেয়াল ওঠে, বর্ষায় কাদা ধুয়ে ভেঙে পড়ে। পরের শীতে আবার। এমনি চলছিল—চার দেয়াল পুরোপুরি উঠেও গেল কোন এক সময়। ছাতটা কেবল হয়নি—চুন-সুরকি কড়ি-বরগা সমস্ত এসে রয়েছে—শুধুমাত্র মিস্ত্রির কাজ বাকি। ইতিমধ্যে বিরিঞ্চি মারা গেলেন, স্বাধীনতা পেয়ে দেশ দু-খণ্ড হল, হিন্দুস্থানে সরে পড়ল সুরেন।

কেবল সৌদামিনী ঠাকরুনকে কিছুতে নড়ানো গেল না, একলা মানুষ বাড়ি আগলে পড়ে আছেন। ওই চুন-সুরকি কড়ি-বরগার মধ্যে তাঁর প্রাণ। সতর্কতার অন্ত নেই—রাতে ভাল করে ঘুমোন না, এই বুঝি চোরে এসে চুরি করে নিয়ে গেল। অথচ এমন বস্তু, দিনমানে দান করে দিলেও কেউ নেবে না। বছরের পর বছর বৃষ্টির জলে ধুয়ে ধুয়ে সুরকি বলে পদার্থ নেই, একগাদা কাঁকর। চুন জমাট বেঁধে পাথর হয়ে আছে। কড়ি-বরগার কাঠ পচে গিয়ে এমন অবস্থা, হাতের মুঠোয় খানিক খানিক উঠে আসে। সুরেন কবে একদিন বাড়ি ফিরে দালানের ছাত আরম্ভ করবে, মালপত্রগুলো তাব হাতে সঁপে না দেওয়া পর্যন্ত ঠাকরুনের সোয়াস্তি নেই।

দেয়ালগুলো খাড়া এখনো, গোটা পাঁচেক বট-অশ্বথ উঠে আচ্ছাদন হয়েছে, সেই জন্যে বোধহয়। দেয়ালের একটা কুলুঙ্গিতে দত্ত-জেঠাইমার খাবার-জলের কলসি থাকে। সেকালে এনে রাখতেন, এখনো রাখেন। সাপের ভয়ে কেউ যায় না বলে ছোঁয়াছুঁয়ির শঙ্কা নেই। ছায়া-জায়গায় জলও ঠাণ্ডা থাকে বেশ।

ভাল আছ জেঠাইমা?

আরে আরে, কবে এলি তুই?

'তুই' বলবার মানুষ গাঁয়ের মধ্যে ক'জন মাত্র এঁরা। এই সৌদামিনী ঠাকরুন, আর একজন শশীপণ্ডিত। আর সেকালের ঘোড়সওয়ার আদিত্যদা'ও খেয়াল মতন কখনো 'তুই' বলে ডাকেন, কখনো বা তুমি।

সৌদামিনী একগাল হেসে বলছেন, দেশভুঁই মনে পড়ল? সঙ্গে এটি কাদের ছেলে বাবা?

জবাবের অপেক্ষা নেই। মহানন্দে বৃদ্ধা একটানা বলে যাচ্ছেন, বেশ, বেশ! জুটেপুটে আয় দেখি সকলে। সব আবার সেই আগেকার মতন হোক।

(আর কি হবে জেঠাইমা—কী জানি! মাটি দু-ভাগ হয়ে গেছে। মানুষও যাতে একেবারে ভিন্ন হয়ে যায়, অবিরত সেই চেষ্টা। আমি-তুমি নিতান্তই মাছি-পিঁপড়ে, কূটনীতিক আর রাষ্ট্রধুরন্ধররাই সব।)

বলছেন, আমার সুরেনকে এত করে লিখি, জবাবটাও সে দেয় না। বউমা কষ্টদুঃখ জানিয়ে কালেভদ্রে লেখে এক-আধখানা। তা বাপু, কষ্ট করে আছিস কেন পড়ে? কোন অভাবটা তোদের! দেখা হয় তোর সুরেনের সঙ্গে? তাকে বলিস, বাড়ি এসে দালানের ছাতটা দিয়ে নিক। সবই তো জোগাড় রয়েছে।

একটা মাদুর বিছিয়ে দিয়ে বলেন, দাঁড়িয়ে কেন রে, বোস্ তোরা। শুনি সব কথা।

জল খাব জেঠাইমা, তোমার মেটেকলসির জল। দেখ, সব কেমন মনে আছে আমার। দালানের কুলুঙ্গিতে তোমার জলের কলসি—বড় ঠাণ্ডা জল। এঁকে তাই বলছিলাম, সারা দুনিয়া খুঁজে আমার জেঠাইমার জলের স্বাদ কোনখানে পাবেন না।

জেঠাইমা বলেন, শুধু জল খাবি কেন রে, ক'খানা ফেনি-বাতাসা এনে দিই।

হাজু-ময়রার ছাঁচের-পুতুল খেতাম, পণ্ডিতমশায় সেই হাঁড়ি ভরে রাখতেন। হাজুর ছেলেপুলেরা আছে তো সব জেঠাইমা, ছাঁচ-পুতুলের দোকানটা আছে?

বিষণ্নমুখে জেঠাইমা ঘাড় নাড়লেন: কেউ নেই, কিছু নেই। হাজু কবে মরে গেছে। ছেলেপুলেরা হিন্দুস্থানে চলে গেল। কী যেন হয়ে গেল বাবা, চোখের উপর উড়েপুড়ে গেল সমস্ত। জল না খেয়ে যাবিনে কিন্তু। ভাল হয়ে বোস্।

জল-বাতাসা দিয়ে দত্ত-জেঠাইমা বলেন, কবে আসবে সুরেন, কি বলে তোর কাছে? সর্বস্ব ছেড়ে শতেক কষ্ট সয়ে কেন সে শহুরে পড়ে আছে? চলে আসুক।

কস্মিনকালে সুরেনের সঙ্গে আমার দেখা হয় না। কে জানে,

তারও হয়তো সপরিবারে স্টেশনে বসতি। কিম্বা ততোধিক জঘন্য কোন জায়গায়। মহোৎসাহে তবু সুরেনের অপার সুখসৌভাগ্যের বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছি। আপনি চোখ টিপছেন, হাতধরে টানছেন কথাবার্তায় ইতি দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়বার জন্য। কিন্তু মিথ্যের পর মিথ্যে সাজিয়ে গল্প বানানো কাজ যে আমার—চিরকাল তাই করে আসছি। মায়ামুগ্ধ নিরক্ষর এই গ্রামবৃদ্ধা জেনে বসে আছেন, আমার ভারতবর্ষের উপর ক্ষণকালীন মেঘ উঠেছে, মেঘ কেটে প্রসন্ন আলো ফুটে উঠল বলে। জীবনান্ত অবধি সেই আশ্বাস নিয়ে থাকুন, সে আর ক'টা দিনই বা! বেপরোয়া মিথ্যা রচে যাচ্ছি—আপনি লজ্জা পেলেন, মনে মনে কিন্তু গরব হল আমার।

সেবারে এমনিধারা শশীপণ্ডিতের কাছে। পণ্ডিতমশায় একেবারে শয্যা-া্রী, তাই শুনে দেখা করতে গেলাম তাঁর বাড়ি। ছোটবয়সে দুঃখ ছিল, আমার কেউ পায়ের ধূলো নেয় না। আজকে উল্টো—প্রণাম করে পায়ের ধূলো নেবো, সে মানুষ খুঁজে পাইনে। পণ্ডিতমশায়ের পায়ের ধূলোর লোভে ছুটেছি।

একেবারে অথর্ব হয়ে গেছেন, নামে-মাত্র বেঁচে থাকা। যে ছেলেটাকে একদা আশ্রয় দিয়েছিলেন, বিয়েথাওয়া করে সে এখন ঘোরতর সংসারী। তারাই দেখাশুনা করে।

চোখে দেখতে পান না, কিন্তু কান খুব তী়়। আগ্রহে উঠে বসলেন পণ্ডিতমশায়।

বলিস কি রে! তুই এসেছিস? সত্যি সত্যি তুই?

কেন আসব না বলুন? আমার দেশভূঁই, আমারই আপন সব মানুষ।

আজকাল তুই খুব বড় হয়ে গেছিস শুনতে পাই—

প্রতিবাদ করে বলি, না পণ্ডিতমশায়। কতদিকে কত শত্রু—মিথ্যে করে কে লাগিয়েছে, আপনি তাই ধরে বসে আছেন।

পণ্ডিত এদিক-ওদিক বার কয়েক ঘাড় নেড়ে বলেন, না রে, মিথ্যে কেন হবে! ছাপার অক্ষরে তোর নাম বেরোয়। দুটো বছর আগেও চোখ আমার এত খারাপ হয়নি—তোর রচনা নিজে পড়েছি সেই সময়।

সঙ্কটাপন্ন অবস্থা, কিন্তু জীবন ভোর মিথ্যার সাধনা ব্যর্থ হবার নয়। মাথা খুলে গেল, জবাব এলো গড়গড় করে ঠোঁটের আগায়।

আমি সে মানুষ নই পণ্ডিতমশায়, যথার্থ বলছি। এক নাম কত জনের হতে পারে। আমাদের এইটুকু গাঁয়েই তো চার সতীশ—

কৈফিয়ৎ খানিকটা মনে ধরল। পণ্ডিত চুপ করে আছেন। আরও জোর দিয়ে বলি, বড় হলে কি এক-পা নড়তাম শহর ছেড়ে! গাঁয়ে আসতে যাব কেন—ভিন্ন রাষ্ট্রের এলাকায় এত ঝঞ্ঝাট করে? বড়দের কে কবে এপার-ওপার করতে যান? নিজ নিজ জায়গা থেকে তাঁরা দরদ দেখান, উদ্বেগ ছাড়েন।

এ হেন অকাট্য যুক্তির পরে শশীপণ্ডিত নিঃসংশয়। শীর্ণ ডান হাতখানা বাড়িয়ে খুঁজছেন। বলেন, মাথাটা কই তোর? এগিয়ে নিয়ে আয়, হাত রাখব।

দেখুন, বেধড়ক মিথ্যে রচতে পারি বলেই সেদিন পণ্ডিতমশায়ের ভালবাসা কুড়িয়ে নিয়ে এলাম। ছোট্টবেলাকার মতো আমার গায়ে মাথায় কত তিনি হাত বুলালেন।

॥ পঁচিশ ॥

পাঠশালার পড়ুয়াদের কাছে শশীপণ্ডিত বাঘ, কিন্তু সেই মানুষ একবার কী নাজেহাল তলির মা'র কাছে!

একশ' বছরের কাছাকাছি বয়স তলির মা'র, এই আমতলায় ওই বাঁশতলায় পথে-ঘাটে বনে-বাদাড়ে একখানা গাছের ডাল ঠুকঠুক করে

ঘুরতেন। ছায়ান্ধকারে আজ যেন সেই বুড়োমানুষটার মূর্তি দেখতে পাচ্ছি।

মাজা একেবারে পড়ে গিয়েছে, মাটি থেকে মাথা সামান্য দূরে। তলি বা ত্রৈলোক্যতারিণী কোন্‌কালে গত হয়েছে, মায়ের সঙ্গে মরা-মেয়ের নামের একটুকু জুড়ে আছে।

এখানে এককুচি আমের ডাল, ওখানে একখানা কঞ্চি—সারা পথ খুঁটে খুঁটে তলির মা রান্নাঘরের দাওয়ায় রেখে বলেন, ঘরে তুলে নাও গো বউমা।

উত্তরের-বাড়ির জীবনকাকার বউ—তাঁকে ডেকে তলির মা বললেন। কাকিমা হাসেন: বাঁচালে মা। এই ক'খানা কাঠের কুচির অভাবে আমার রান্না আটকে আছে। না আনলে উনুনে হাঁড়ি চড়ত না আজ।

ভাগ করে হিসাব করলে জীবনকাকার সঙ্গে একটা সম্পর্ক নিশ্চয় বেরিয়ে পড়বে। মা সকলকেই বলা যায়, কাকিমা তাই মা বলে ডাকেন। জীবনকাকা বলেন, আছেন বুড়োমানুষটা—কোথায় আর যাবেন! কেউ তোমরা কিছু বোলো না। যদ্দিন বেঁচে আছেন, থাকতে দাও। সে আর ক'টা দিনই বা!

তলির মা'র কথা বলতে গিয়ে ঝণ্টুর কথা এসে পড়ে। জীবন-কাকার ছোট ছেলে ঝণ্টু, আমার একেবারে সমবয়সি। শশীপণ্ডিতের পাঠশালায় পড়ি সকলে। হাজিরা-খাতায় নাম আছে ঝণ্টুর, কিন্তু সে বড়-একটা পাঠশালায় যায় না। জীবনকাকা নড়ালের জমিদার সরকারে কাজ করেন। নড়াল বিস্তর দূর এখান থেকে। মামলা-মোকদ্দমায় সদর আদালতে আসতে হল তো তার মধ্যে ফাঁক কাটিয়ে বাড়ি এসে গেলেন একটা রাত্রির জন্য।

একবার এমনি বাড়ি এসে ঝণ্টুর বৃত্তান্ত শুনলেন: মাঠেঘাটে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, পাঠশালায় যায় না, কায়েতের ঘরের আকাট-মুখ্যু হচ্ছে একটা।

সরেজমিনে তদন্ত করতে জীবনকাকা সকালবেলা পাঠশালায় চলে এলেন। দত্তবাড়ির ওই চণ্ডীমণ্ডপে।

যা শোনা গিয়েছে, ঠিক তাই। ঝণ্টু অনুপস্থিত। অথচ ফ্যানসা-ভাত খেয়ে পাততাড়ি ও বইয়েব দপ্তর নিয়ে পাঠশালায় যাচ্ছি বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। সামনের মাথায় শশীপণ্ডিত— জীবনকাকার রাগটা অতএব তাঁব উপবেই পড়ল: মাসে মাসে চার গণ্ডা পয়সা মাইনে গণে যাচ্ছি, দৈনিক তাহলে আধেলাব বেশি পড়ে গেল। দিনের পর দিন ঠকিয়ে যাচ্ছেন, পণ্ডিত মানুষ হয়ে এটা কেমন হচ্ছে বলুন তো!

কথাটা শশীপণ্ডিতেব মনে লাগল। বিকালে পাঠশালা ভাঙবার সময় আমাদের চাব-পাঁচ জনকে অন্তবালে ডেকে বললেন, ফ্যানসা-ভাতের মুখে কাল তোবা উত্তবেব-বাডি চলে যাবি। বাড়ির মধ্যে সকলে ঢুকে পড়িস নে, সন্দেহ কববে। এই একজন কি দু'জন। ভুলিয়েভালিয়ে পাড়া থেকে সবিয়ে আনবি ঝণ্টুকে, তাব পবে দেখা যাবে।

আর আমাদের বারম্বার সামাল কবে দেন: তলিব মা বুড়ি কিছু বুঝতে না পারেন—খবরদাব, খববদাব!

তাই হয়েছে। উত্তরের-বাড়ি ঢুকেছি একলা আমি। আশশ্যাওড়ার ডাল ভেঙে বাস্তার উপব দাঁড়িয়ে কেউ কেউ দাঁতন করছে। কেউ বা ছিপ-খালুই নিয়ে বিলের দিক থেকে এসে উঠল— যেন কইমাছ ধরে ফিরে আসছে। আমায় দেখে জীবনকাকার বউ বললেন, খাবি নাকি দুটো ভাত, খেয়ে যা।

উঠানে পেয়ারাতলার উনুনে কড়াইয়ের উপব ভাত টগবগ কবে ফুটছে। কাঠির মাথায় ক'টা ভাত তুলে কাকিমা টিপে দেখেন। হয়ে গেছে ভাত। গোবরমাটি দিয়ে নিকানো উঠানের উপর সারি সারি থালা পড়ে গেছে; আমার জন্যে একটা থালায় হাতা ঢেলে দিলেন। কড়াইয়ে রান্না বলে নীলাভ রং। কী মিষ্টি সে ভাত!

চালের দর এখন আট-দশ গুণ, কিন্তু জিনিষও কি একেবারে বদলে গেল। সেই স্বাদ কোথায় এখন! ফ্যানসা-ভাত আর কাঁঠালবীচি-ভাতে। আর ঘরের তৈরি সর-বাটা ঘি খানিকটা ঢেলে দিলেন ভাতের উপরে।

ঝণ্টুর সঙ্গে খুব ভাব আমার। দুজনে পাশাপাশি বসেছি। ভাব যতই হোক, সকলের উপরে পণ্ডিতমশায়ের হুকুম। ফিসফিসিয়ে ঝণ্টুকে এক গুহ্য খবর দিলাম। বানানো—মিথ্যে রচনায় ওই বয়সেই কেমন দড় হয়েছি দেখুন। বললাম, ব্যাপারি এসে আজ জামির গাজির গাছের বাতাবিলেবু পাড়বে। গাছ শূন্য হয়ে যাচ্ছে, তার আগেই কিছু চেখে নেওয়া এবং কিছু সঞ্চয় করে রাখা উচিত এ বছরের মতো। তুমি ছাড়া অন্য কাউকে দিয়ে হবে না তো ঝণ্টু।

পাড়াগাঁয়ের ছেলে—গাছে চড়ার কাজটা বিলক্ষণ পারি সকলে। কিন্তু জামির গাজির বাতাবিলেবু-গাছের বিশেষত্ব আছে। ডাল-বাছা লেবু—এ ডালের লেবু মধুর মতো মিষ্টি, ঠিক তার পাশের ডালখানায় এমনি যে মুখে ঠেকাতে না ঠেকাতে দাঁত টকে যাবে। বিশাল গাছ, অগণ্য ডালপালা—কিন্তু ঝণ্টু প্রতিটি ডাল ভাল রকম চিনে রেখেছে, ভুল হবার উপায় নেই। এই বাতাবি-গাছটা বলে নয়, তিন-চার খানা গাঁয়ের যত গাছপালা, সকলের নাড়িনক্ষত্র তার জানা। শুধু গাছই বা কেন, গরু-ছাগল হাস-মুরগি কোন্‌টা কোন্ গৃহস্থর, কোন বছর কে কতগুলো বাচ্চা দিয়েছিল, যাবতীয় খবর ঝণ্টুর কণ্ঠাগ্রে। লেখাপড়ার ব্যাপারটাই কেবল মাথায় ঢোকে না। একদিন পণ্ডিতমশায় ক-খ-গ-ঘ-ঙ পাঁচটা অক্ষর গণে গণে কুড়িবার ঝণ্টুকে লেখালেন। তারপর পরীক্ষা নিচ্ছেন: কী এটা? ঝণ্টু জবাব দেয়: দন্ত্য-স। দন্ত্য-স অক্ষরটা একসময় তার কী ভাল লেগেছিল—যা-ই কিছু ধরুন না কেন, বলত দন্ত্য-স।

বাতাবিলেবুর কথাটা ঝণ্টু প্রণিধান করে। জামির গাজির গাছের লেবু ঠিকভাবে চিনে পাড়া, ঝণ্টু ছাড়া কাউকে দিয়ে হবে না।

অসুবিধাও নেই—গাছটা জামিরের বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে, গাঁয়ের শেষপ্রান্তে। লেবু পেড়ে ব্যাপারিরা হাটে নিয়ে যাবে, অতএব দুপুরের আগেই তারা এসে পড়বে। হাতে সময় অল্প, থাবা থাবা খেয়ে ঝণ্টু উঠে পড়ল। এক-ছুটে লেবুতলায়।

একনজর উপরমুখো তাকিয়ে ডাল ঠিক করে নিল। তারপর ফন-ফন করে উঠে পড়ে কাঠবিড়ালির মতো। বন্দোবস্ত এদিকে ঠিকই আছে। হাতের ছিপ রেখে দিয়ে দাঁতন-কাঠি ছুড়ে ফেলে দলবল এসে গাছ ঘিরে যে-াল: নেমে আয় বে ঝণ্টু। ভালর তরে বলছি।

এতগুলো একসঙ্গে মাবমুখি হয়ে পড়েছে, চক্রান্ত বুঝতে ঝণ্টুর বাকি থাকে না। বেড়াজালেব মধ্যে পড়েছে। সকলকে ছেড়ে আমার দিকে তাকায় আহত দৃষ্টিতে। অর্থাৎ, তুমিও এই?

তুমুল গর্জন করে ওঠে সহসা: পালা, পালা সব। নয়তো রক্ষে নেই আজ কারো—

পট করে একটা বাতাবিলেবু ছিঁড়ে ডান হাতে উঁচিয়ে ধবেছে: কামান ছুড়ে মাথা ফাটাব। পালিয়ে যা শিগগির।

গ্রামের ছেলে, কামান কী বস্তু চোখে দেখবাব কথা নয়। বন্দুক দেখেছি সাহেবরা সেবার যখন আমাদের বিলে পাখি মাবতে এসেছিল। বন্দুকের বড়দাদা যখন কামান, কামানের গোলা নির্ঘাৎ বাতাবিলেবুর সাইজের হবে। মুখেব তড়পানি শুধু নয়, সত্যি সত্যি বাতাবিলেবুব গোলা ছিঁড়ে ঝণ্টু এলোপাথাড়ি মারছে। আমার কানেব পাশ দিয়ে একটা বেরিয়ে গেল। আমাদের পক্ষও রণে ভঙ্গ দেবে না সহজে। চষা-ক্ষেতের ঢিল কুড়িয়ে এনে ছুড়ছে। রাগে গবগর করতে করতে দুটো যণ্ডা ছেলে মালকোঁচা সেঁটে গাছে উঠে পড়ল। ঝণ্টুকে টেনেহিঁচড়ে নামাবে। বিপদ বুঝে ঝণ্টু পালাচ্ছে উপর মুখো। মগডালে গিয়ে উঠল। ভয় পেয়ে নিচে থেকে আমি চেঁচাচ্ছি: কী করিস ওরে ঝণ্টু। আর উঠিস নে, ডাল ভেঙে পড়ে মরবি।

গাছে চড়ে চড়ে এত বড়টা হল, ঝণ্টু কি আর বোঝে না সেটা।

ডালে সজোরে এক দোলা দিয়ে ভুঁয়ে লাফিয়ে পড়ল। মতলব ছিল, লাফ দিয়ে পড়েই ছুটে পালাবে। কিন্তু ঝোঁক সামলাতে না পেরে আছাড় খেয়ে পড়ল। তলায় যারা ছিল, তড়াক করে অমনি ঘাড়ের উপব চেপে পড়েছে।

আমি বললাম, পাঠশালে চল ঝণ্টু। পণ্ডিতমশায় কিছু বলবেন না।

কিন্তু যমের বাড়ি বরঞ্চ যাবে, পাঠশালায় কদাপি নয়। প্রচণ্ড বেগে ঝণ্টু হাত-পা ছুড়ছে। হাত-পা এঁটে ধরে সকলে মিলে তখন চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলল। উত্তেজনার বশে শশীপণ্ডিত চণ্ডীমণ্ডপের ভিতর স্থির থাকতে পারেন নি, একটা ফুলো-কঞ্চির ছাট নাচাতে নাচাতে উঠানে নেমে পড়েছেন। সপাং করে একটা বাড়ি দিয়েছেন কি কি না দিয়েছেন—

ও বুড়োমা গো!

খুনই যেন হয়ে গেল ছেলেটা, করুণ আকাশভেদী এমনি একটা আর্তনাদ। এবং সঙ্গে সঙ্গেই—

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, লেবুতলায় আমবা যখন কলরব করছি, রসিক ব্যক্তি কেউ মজা দেখবার অভিপ্রায়ে তলির মার কাছে বৃত্তান্ত পৌঁছে দিয়ে এসেছিল। নয় তো এত সকালে এতদূরে এপাড়া অবধি তাঁর আসবাব কথা নয়। লাঠি ঠুকঠুক করে আসতেও তো বুড়োমানুষেব অনেকক্ষণ লাগে। অপচ যেইমাত্র ঝণ্টুব চিৎকার, নাটকীয় ভাবে তলির মা এসে পড়লেন উঠানে। চরকিবাজিতে আগুন দিলে যেমন তারা কাটে, কোটরগত চক্ষু দুটো থেকেও অবিকল সেই কাণ্ড হচ্ছে। ওই তো কুঁজো মানুষ, ধুঁকতে ধুঁকতে চলেন—চক্ষের পলকে ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতো খাড়া হয়ে গেলেন।

দ্রুত ঝণ্টুর কাছে গিয়ে গুম-গুম করে কিল ঝাড়ছেন তার পিঠে। সে কী আথাড়ি-পাথাড়ি মার! পণ্ডিতের মারে ঝণ্টুর লাগেনি, কিন্তু বুড়ির কিলে পিঠ যেন ভেঙে যায়। আগের কান্না লোক-দেখানো, এখন ধারা বয়ে যাচ্ছে চোখের জলের।

বুড়ি গজরাচ্ছে: মর্ মর্, এক্ষুনি মরে যা তুই। চোখ উলটে পড়্, পণ্ডিতের ফাঁসি হোক।

তুমুল কাণ্ড! পাড়ার মানুষ আসতে কারো বাকি নেই। একশ বছুরে বুড়ির গায়ে যেন অসুরের বল—এতজনে মিলে ঠেকাতে পারে না।

সেইসব মানুষ কবে অতীত হয়ে গেছেন! তলির মা, জীবনকাকা এবং আমার সেই সহপাঠীদেরও কতজনা। শশীপণ্ডিত আছেন, কিন্তু না থাকারই শামিল। ঝণ্টুও গেছে ভেবেছিলাম। কিন্তু মাস কয়েক আগে বনগাঁয় হঠাৎ তাকে দেখলাম। আধবুড়ো অভাবী মানুষেব চেহারা—বিড়ি বেঁধে দিন চালায়। একটা কাটারি নিয়ে ঝণ্টু ডাল কেটে বেড়াচ্ছে, দখতে পেয়ে আমি গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। একজনে আমার পরিচয়ও দিয়ে দিল—ঝণ্টু চোখ তুলে তাকাল চিনতে পারল না। হাত ধরলাম এগিয়ে গিয়ে, ঝণ্টু হাত সবিয়ে দিল। শশীপণ্ডিত চোখে দেখেন না, দুনিয়ার খোঁজখবর রাখেন না, মিথ্যে বলে তাঁব কাছে রেহাই পেয়েছিলাম। কিন্তু ঝণ্টু দেখল, গাড়ি করে একটা দল সমারোহে আমায় নিয়ে সভা কবতে যাচ্ছে—ভিন্ন জাতেব মানুষকে সে আমল দিতে যাবে কেন?

॥ ছাব্বিশ ॥

তলির মা ও শশীপণ্ডিতে হয়েছিল—সেটা নিতান্তই একতরফা। তলির মা'র মুখোমুখি দাঁড়ানোর তাগত মিনমিনে পণ্ডিতমানুষের হয় না। সে একবার বেধেছিল বটে ভুবন-পিশির সঙ্গে। দুজনেই স্ত্রীলোক, এবং বয়সে প্রবীণা। কলহ তাঁদের আমলে রীতিমত কলা-বিদ্যা, সাধনা করে শিখতে হত। দুজনে বে-রে পড়লেন—ইনি বলেন আমায় দেখ্, উনি বলেন আমায়। গ্রামের যে যেখানে ছিল, পিলপিল করে রণক্ষেত্রে হাজির। তৃপ্তি ভরে উপভোগ করছে।

উপলক্ষ আমি। আমিই শেষটা ধামা চাপা দিয়ে অনেক কষ্টে ঠেকিয়ে দিলাম।

আজ্ঞে হ্যাঁ, ধপাস করে আমি এক ধামা উপুড় করলাম, মন্ত্রবৎ উভয়ের মুখবন্ধ। রীতি ছিল এই।

ভুবন-পিশিও খুনখুনে বুড়ি, তবে বয়সে তলির মা'র অনেক নিচে। এমনি তলির মা'র টানও খুব ভুবনের উপর। যোগ্য প্রতিপক্ষ বলে তো বটেই। তা ছাড়া বলেন, আমার তলি আর ভুবন একবয়সি। ঠোলামালা নিয়ে ছুটিতে রাঁধাবাড়া খেলত—এই তো সেদিনের কথা।

একবার পালাজ্বরে ভুগে ভুগে ভুবন-পিশি সলতের মতো হয়ে গেছেন। তাই দেখে কে যেন বলল, পিশি যাবেন এবারে। ভুবন-পিশি অমনি পাক দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে মানুষটাকে চক্ষের আগুনে দগ্ধ করে বললেন, কেন রে কেন রে—আমি যেতে গেলাম কেন? যাবে যাদের ভরভরন্ত সংসার। মড়া ঘিরে একপাল মানুষ হাউ-হাউ করে কাঁদবে। পালঙ্কে শুইয়ে খই-পয়সা দু-হাতে ছড়াতে ছড়াতে নিয়ে যাবে। আমি গেলে কার কোন ফুর্তিটা হবে শুনি?

গ্রামসুদ্ধ লোকের পিশি, কিন্তু রক্তের আপন কেউ নেই। তলির মা জীবনকাকার বাড়ির লোক হয়ে আছেন। ভুবন-পিশির সে ব্যাপার নয়। কিছুদিন এর বাড়ি, কিছুদিন তার বাড়ি—দায়ে পড়ে মানুষ আদর করে ডাকে, ভুবন-পিশি সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়ে ওঠেন। এই সময়টা বিরিঞ্চি দত্তর বাড়িতে তিনি।

পুরানো কোঠাবাড়ির চোরকুঠুরিটা বিরিঞ্চি সাফসাফাই করে দিলেন। কুঠুরির পিছনে পাঁচিলের গায়ে চালও তোলা হল একটা—পিশি খুব শুচিবেয়ে, তাঁর জন্যে আলাদা রান্নাঘর। নিরিবিলি থাকেন পিশি। বিরিঞ্চি দত্ত হিসাবি মানুষ, লাভ-লোকসান যথোচিত খতিয়ে দেখেছেন। বিধবা মানুষের একবেলা চাট্টি ভাতের বদলে সুরেনকে কোলে-কাঁখে নিয়ে ঘোরা, তিন-তিনটে উঠান জুড়ে গোবর-নিকানো, গরুর সেবা, এবং রাত্রে শুয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তির অভাবে একা একা কোন্দল

করা—যার ফলে দত্তবাড়ি চোর ঢুকতে সাহস পায় না। বিস্তর কাজ পাওয়া যাচ্ছে বিধবাকে আশ্রয় দিয়ে।

বিরিঞ্চি দত্তর সঙ্গে আমাদের কর্তাদের তখন ভারি গণ্ডগোল। গাঁয়ের এই দস্তুর—এবেলা উৎকট মেঘ, ওবেলা ঝিলমিলে রোদ্দুর। দত্তদের পাঁচিলের গায়ের এক আমগাছ নিয়ে মামলা চলছে। প্রকাণ্ড গাছ, আম মধুব মতো মিষ্টি, কানাইবাঁশি নাম। কার দখলে কানাই-বাঁশি গাছ, গাছতলাব জমিটা কাব? সদরের ছুটো আদালতে আমাদের হার হয়ে এবাবে হাইকোর্টে যাবাব তোড়জোড় হচ্ছে। ইতিমধ্যে খরচপত্র যে পবিমাণ হয়ে গেছে, গোটা আমগাছ এবং গাছ-তলার তাবৎ মাটিতে হাঁড়ি-কলসি গড়ে বিক্রি কবলেও অর্ধেক পয়সা উশুল হবে না। এক গাঁয়ে বসত, কিন্তু টাকাব শোকে আমাদের কর্তাবা মুখ-দেখাদেখি বন্ধ করেছেন বিরিঞ্চি দত্তর সঙ্গে।

দু-দুবার মামলায় জিত, তদুপবি বিরিঞ্চির অনেক আহ্লাদেব দুলাল সুরেনের অন্নপ্রাশন। যে সুরেন হিন্দুস্থানের বাসিন্দা এখন, দত্ত-জেঠাইমা যার অপেক্ষায় বাড়ি পাহারা দিয়ে আছেন। অন্নপ্রাশনের ব্যাপারে বিরিঞ্চি দত্ত ধুমধাড়াক্কা লাগিয়াছেন। গ্রামসুদ্ধ নেমন্তন্ন, আমাদেব বাড়িটা শুধু বাদ। ময়রা এসে দত্তবাড়ি ভিয়ান করছে আজ ক'দিন। আমি ছেলেমানুষ—আমার বয়সি সমস্ত ছেলে ভিয়ানের চতুর্দিক ঘিরে ভিড় করেছে।

বিরিঞ্চি দিলদরিয়া। বনকরের চাকরির কল্যাণে পয়সার মুঠো ধুলোমুঠোর সমান।

দাও হে হালুইকর, দু-হাতে দুটো করে পানতুয়া দিয়ে দাও ছেলেগুলোর হাতে। যদ্দুর রস ভরেছে, তাই চলুক। পরশুদিন ভোজে বসে ভাল করে খাবে।

আমি দল-ছাড়া। সকলের মুখে নানান গল্প শুনে শেষটা না পেরে কানাইবাঁশি গাছে উঠে পড়লাম। পাঁচিলের অন্তরালে

দত্তবাড়ির কাণ্ডকারখানা এক নজরে দেখছি গাছের উপর থেকে।

পুকুরঘাট থেকে ভুবন-পিশি জল নিয়ে আসছেন। অন্যের ছোঁয়া জল তিনি খান না। আর খেতেনও যদি, কে-ই বা এনে দিচ্ছে যত্ন করে! কী করে টের পেলেন জানি নে—নড়াচড়ায় শুকনো ডাল-পাতা পড়েছিল বোধহয় পায়েব কাছে। উর্ধ্বমুখী হয়ে পিশি হুঙ্কার দিচ্ছেন: কে, কে রে? ও-বাড়ির বাঁদরটা বুঝি? মা গো মা, প্রাণের ভয়ও করে না!

ভুঁয়ে তাকিয়ে সত্যি সত্যি আমার বুক শুকিয়ে গেল। উঠতে উঠতে কোথায় উঠে পড়েছি, খেয়াল ছিল না। লিকলিকে এক সরু ডালের উপব।

পিশি ওদিকে সমানে চেঁচাচ্ছেন: নেমে আয় এক্ষুনি। পরের গাছের আম পাড়া—এখনই এই, ও ছেলে বড় হয়ে ঠিক সিঁধকাঠি ধরবে।

একটি আমও নেই কিন্তু সে গাছে। গাছটা তবু কানাইবাঁশি—মামলা জিতে বিরিঞ্চি দত্ত যার দখল পেয়েছেন। থরথরি কাঁপছি। বিরিঞ্চি দত্ত এসে যাচ্ছেতাই করবেন, সে ভয় তো আছেই। তার চেয়ে বড় ভাবনা, আমার জেঠামশায় যদি ঘুণাক্ষরে টের পান যে বিরোধের বৃক্ষচূড়ায় উঠে আমি দত্তবাড়িব ভিয়ান দেখছিলাম, তবে আর রক্ষে রাখবেন না।

এ-ডাল ও-ডাল করে সন্তর্পণে নামছি, ভুবন-পিশি কলসি কাঁখে ঠায় দাঁড়িয়ে। একটি কথা বলছেন না মুখে। বিড়াল যেমনধারা মুখাগ্রের শিকারের জন্য ওত পেতে থাকে।

তারপরে ভুঁয়ের উপর যে-ই না পা পড়েছে, কাঁখের কলসি ঢপ করে নামিয়ে রেখে—এই তো জীর্ণ মানুষটা, চোখে না দেখলে সে জিনিধ ধারণায় আসে না - ধনুক থেকে ছোঁড়া তীবের মতন ছুটে এসে পিসি কান টেনে ধরলেন। কান ধরে চেঁচাতে চেঁচাতে ঢুকিয়ে নিলেন দত্তবাড়ির পাঁচিলের ভিতরে।

যজ্ঞিবাড়ি একপাল স্ত্রীলোক। তারা সব ছুটে এসে পড়ে: কি হল পিশিমা? ছেলেটা কি করেছে?

ছেলে বলিস কাকে তোরা? বিচ্ছু, কাঠপিঁপড়ে। গাছের মাথা থেকে ধাঁই করে কাঁচা-আম ছুঁড়ে মারল। চোয়ালে লাগত একটু হলে।

হাঁপাচ্ছেন ভুবন-পিশি। এতখানি ছুটোছুটি ও উত্তেজনায় দম লেগে এসেছে, গলার তেজ কিছু মিইয়ে গিয়েছিল। মুহূর্তকাল সামলে নিয়ে ডবল জোরে গর্জন ছাড়লেন। আমাদের পাড়াগাঁয়ের মোটরগাড়ি স্টার্ট দিয়ে যেমনধারা গর্জে ওঠে।

তারপর ইনিয়ে-বিনিয়ে বলছেন, ছোঁড়া বিষপুঁটুল গো! জলের কলসি নিয়ে আসছি, কাঁচা-আম তাক করল আমার পানে। বললাম, বুড়োমানুষ কলসি নিয়ে এত পথ আসতে হাঁপিয়ে গেছি—সোনা আমার, অমনধারা করতে নেই। আম ফেলে দিয়ে তখন করল কি—তরতর করে নেমে এসে পিছন থেকে দিল এক ধাক্কা: এই বুড়ি, আদাড়-বাগান ভেঙে এসে ছুঁয়ে দিলাম—কি করবি কর্। সেই পুকুরঘাট অবধি আবার আমার ভোগান্তি। তা বলে একেও ছাড়ছি নে—না চান, না খাওয়া, শিকল দিয়ে ঘরে আটকে রাখব। যেমন কুকুর তার তেমনি মুগুর।

মিথ্যেবাদী বুড়িকে মনে মনে গালমন্দ করছি। দত্তবাড়ি অর্থাৎ শত্রুব্যূহের মধ্যে এনে ফেলেছে, শত্রুজনে ঘিরে আছে—মুখে কিছু বলবার উপায় নেই। বুড়ির বানানো গল্প বাদ দিলেও মারাত্মক অপরাধ আছে একটা বই কি—কানাইবাঁশি-গাছে উঠে পড়েছিলাম। যে গাছ নিয়ে এত মামলা-মোকদ্দমা। শুধুমাত্র ওই গাছে-ওঠা নিয়ে নতুন একনম্বর ফৌজদারি রুজু হয়ে যেতে পারে। জবাব না দিয়ে ভুবন-পিশির হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করছি। আঙুলের জোর বটে! কাঁকড়ায় দাঁড়া দিয়ে যেমন কামড়ে ধরে, শির-ওঠা জীর্ণ হাতে তেমনি ধরে রেখেছেন। কার সাধ্য ছাড়িয়ে যাবে!

নিয়ে ফেললেন নিজস্ব চোরকুঠুরির ভিতর। এবং যেকথা মুখে বলেছেন—বাইরে থেকে শিকল এঁটে দিলেন ঝনাৎ করে। আমাকে এবং সকলকে শুনিয়ে বলছেন, থাক্ সারা বেলাস্ত আটক এখানে। তবেই ছেলে তুমি ঠাণ্ডা হবে। আমি পুকুরঘাটে চললাম।

বাড়ির সকলকে শাসাচ্ছেন: কেউ তোরা শিকল খুলবি নে বলে দিচ্ছি। তা হলে তোদের একদিন কি আমার একদিন।

বয়ে গেছে! শত্রু-বাড়ির ছেলে ইঁদুরের মতন জাঁতিকলে পড়ে গেছে—পীড়ন যত বেশি হবে, তত আনন্দ সকলের।

বেশ খানিকক্ষণ কেটেছে। আছি বন্দী হয়ে, শব্দসাড়া নেই কোন দিকে। পিশি তো জল আনতে বেরিয়ে গেছেন। আর সবাই এদিক-ওদিক কাজকর্মে ব্যস্ত। মনে মনে ফুঁসছি: বুড়ি তুমি মিথ্যে অপবাদ দিয়ে আটক করেছ, এর শোধ তুলবই। কাঁচা-আম আজকে ছুঁড়িনি, কিন্তু শিগগিরই তোমার মাথা ফাটাব আমে হোক কিম্বা ইট মেরে হোক।

মেজের উপর বসে আছি ঘাড় গুঁজে, খুট করে একটু আওয়াজ। চমকে তাকাই। পিছনের যে দিকটা চালাঘর, ছোট্ট এক দরজা সেখানে —সেই দরজার পথে ভুবন-পিশি ঘর থেকে রান্নাঘরে যান। দরজা খুলে পিশি টিপি টিপি ঢুকছেন।

মেজের উপর কেন রে? তক্তাপোশে না বসিস—ছাপবাক্স আছে, তার উপরে বসতে কী হয়! আ মোলো, ছোঁড়া কালা নাকি রে! শুনতে পাসনে? উঠে বোস বলছি।

পাথরের বাটি ভুবন-পিশির হাতে। বাটি ভরতি পানতুয়া। আমার সামনে ধরে বললেন, খা—

অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম।

খাবি নে? তৈলঙ্গ-স্বামী হয়ে বসেছ, বাতাস খেয়ে থাক? তবে হতভাগা মগডালে উঠে কি দেখছিলি অমন তাক করে? মাগো মা, চোখে দেখেই তো ভিরমি লাগে। খাওয়ার টানে প্রাণের ভয় থাকে না, খাবার মুখে এনে ধরলে রাগ দেখানো হয় তখন।

গুম হয়ে আছি। রেগেছেন পিশি, কথাবার্তা বাইরে না যায় তেমনিভাবে চুপিচুপি বলছেন, খেয়ে নে ভালর তরে বলছি। নয়তো রক্ষে রাখব না। ভিয়ানখোলা থেকে আমার জন্যে মিষ্টি পাঠিয়ে দিয়েছে। চান করে এসে এই ছাইপাঁশ খেতে যাচ্ছি আমি! বয়ে গেছে। এক বেলা দু-মুঠো চাল ফুটিয়ে দিই, তার মধ্যেও পাঁচ-শত্তুর বাদ সাধতে আসে।

সহসা অনুনয়ের কণ্ঠে বললেন, সব ক'টা যদি খেয়ে ফেলিস, পাঁচিলের পিছন দিয়ে বের করে দেবো। কাকপক্ষী জানবে না। নয়তো বুঝতে পারছিস—বিরিঞ্চি বাড়ি এসে পড়লে কী কাণ্ড হবে বুঝে দেখ।

সেটা খুব বুঝি। এখন এই মেয়েদের মধ্যে হল, বিরিঞ্চি আদ্যোপান্ত শুনে গাঁয়ের মাতব্বরদের সালিশ ডাকবেন। মামলায় হেরে যাওয়ার পরেও বাড়ির ছেলে পাঠিয়েছে কানাইবাঁশির গাছে চড়ে আম পাড়বার জন্য—হাতের মুঠোয় এহেন সুযোগ পেয়ে সহজে ছাড়বেন না দত্ত-জেঠা।

প্রাণের দায়ে বলুন কিম্বা লোভের বশেই বলুন, খানিকটা রাজি হয়ে পাথরের বাটির দিকে তাকালাম: অতগুলো নয় পিশিমা—

আবদার! দশটা কি বারোটা পানতুয়া—তাই হল অতগুলো! ঘেন্নার কথা বলবিনে। তার মানে বাগ। খেতে হবে না তোকে—বিরিঞ্চি এসে যাক, তখন হবে।

নিষ্ঠুর ভুবন-পিশি, এতটুকু রেহাই দিলেন না। বাটি থেকে তোলা, মুখের কাছে নিয়ে যাওয়া ধীরে ধীরে, গালে ফেলে নেড়েচেড়ে এক ঢোক জল খেয়ে পরেরটি আবার তুলে ধরা—প্রতিটি পর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে পিশির চোখ ঘুরছে। হাসছেন না রেগে আছেন—পিশির ওই থুতনি বেরিয়ে-আসা মুখ দেখে কোন-কিছুই ধরবার উপায় নেই। তবু একবার মনে হল গলার সুরটা কিছু মোলায়েম।

আরো দুটো দিই এনে?

রক্ষে করো পিশি, একেবারে মরে যাব।

মাপ হত না, বুলেটের মতন আরও কয়েকটা নির্ঘাৎ এসে পড়ত।

সদর-দরজার মুখে তলির-মা হঠাৎ হুঙ্কার ছেড়ে উঠলেন: দুধের বাছাকে ঘরে পুরে ফেলেছে গো! চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে বলে—

চমক লাগল। তলির মা কেন আমার হয়ে লড়তে এলেন? সেদিন অবাক হয়েছিলাম, এখন আন্দাজ করতে পারি। ঝণ্টু আমার সমবয়সি খেলুড়ে, সেই বাবদে কিছু টান আছে নিশ্চয়। এ জিনিষ কিন্তু ঝণ্টুর খাতিরে নয়। সমান জোরের মানুষ না হলে পাঞ্জা লড়ে সুখ নেই- শশীপণ্ডিত ইত্যাদি প্রতিপক্ষই নয় তলির মা'র কাছে। হঠাৎ এই সুবর্ণসুযোগ এসে গেছে—কোন সূত্রে খবরটা শুনে তলির মা ওপাড়া থেকে ছুটতে ছুটতে এসেছেন।

তলির মা চেঁচাচ্ছেন: রাক্ষুসি! রাঁড় হয়ে মাছ-মাংস খাওয়া ঘুচেছে—নোলা সুকসুক করে। বাচ্চাটাকে ঘরে নিয়ে পুরেছে, চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে। আপন যারা ছিল সকলকে খেয়েও ক্ষিধে মেটে নি, পরের ছেলের উপর নজর এবারে।

আর কোথা যাবে! বসে পড়েছিলেন ভুবন-পিশি আমার সামনে, তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন। সে মূর্তি চোখে না দেখে কিছুতে আপনি কল্পনায় আনতে পারবেন না। সৈন্যেরা সাজগোজ করে লড়াইয়ে নামে, কত সময় নেয় সেই সাজগোজে। ভুবন-পিশিমা থান-কাপড়ের আঁচলটা শুধু কোমরে ফেরতা দিয়ে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে একেবারে ভিন্ন চেহারা। চক্ষু আরক্ত—দু-চোখের ঢেলা নরকিবাজির মতো আগুন ছড়িয়ে পাক দিচ্ছে। বিধবা মানুষের খাটো খাটো চুল—একালের অনেক মেয়ে যেমন বব করে ছাঁটেন। মাথার ঝাকুনি দিতে খাটো চুল সিংহের কেশরের মতন ফুলে উঠল। এত কাণ্ড চক্ষের নিমেষে ঘটে গেল। দরজা খুলে পিশি সারা উঠোনটা একবার নেচে নিয়ে তলির মা'র একেবারে মুখের উপর গিয়ে দাঁড়ালেন।

ছাড়া পেয়ে আমিও পিছু পিছু জুটেছি। বাড়ির মধ্যে এতক্ষণ ছিল মেয়েলোকের দঙ্গল—একখানি উচ্চাঙ্গের কলহের সম্ভাবনা বুঝে পাড়ার পুরুষরাও দত্তবাড়ির দিকে ছুটেছে।

ঠিক-দুপুর, মাথার উপরে সূর্য। তলির মা'র পিছু পিছু উত্তরের-বাড়ির ঝন্টু এসেছে। ঝন্টুর মুখে পরে সব শুনলাম। আমার দুর্গতিতে বিচলিত হয়ে খবরটা তলির মার কানে সে-ই পৌঁছে দিয়েছিল। জীবনকাকার বউ সেই সময়টা রান্নাঘর থেকে ডাকলেন: খেতে এসো মা। তলির মা যাচ্ছিলেন রান্নাঘরে—এমন সময় আমার উপর ভুবন-পিশির অত্যাচারের কথা শুনে বাড়া-ভাত ফেলে দত্তবাড়ি এসেছেন।

ছুটে এসে তলির মা আমার দুটো হাত ধরে তুলে নিরীক্ষণ করেন: হায় হায়, ছেলেটাকে মেরে আধমরা করেছে গো—

গ্রেপ্তার হয়ে গেছি, সবে পড়বার জো নেই। জনতার শ্রুতিগম্য করে আমি চেঁচাচ্ছি: না বুড়োমা, মারেন নি। তুমি মিথ্যে খবর শুনেছ।

তলির মা খিঁচিয়ে ওঠেন: তোকে আর ঢাকাই-সাক্ষি দিতে হবে না। মারে নি—ঘরে আটকে তবে বুঝি ঠাকুরভোগ দিচ্ছিল এতক্ষণ?

হ্যাঁ, তাই। ভুবন-পিশিমা সামনের উপর বসে—

শেষ হল না, ভুবন-পিশিই শেষ করতে দিলেন না। কথা লুফে নিয়ে বলেন, মেরেছিই তো! সামনের উপর বসে পড়ে বেদম মেরেছি। বেশ করেছি, কে কি করতে পারে করুক। ডরাই নাকি? মেরেছি, আরও মারব। দত্তবাড়ির চিরশত্রু ওরা—বাগে পেলেই মারব।

কখন মারলে তুমি পিশিমা? উল্টে তো—

ভুবন-পিশি চোখ পাকিয়ে বললেন, ভারি যে উল্টোপাল্টা বলতে লেগেছিস—উঁ? মারি নি তো এই মারলাম। হল?

সত্যি সত্যি মারলেন থাবড়া এবারে। সর্বচক্ষুর উপরে।

পরবর্তী ব্যাপার পারেন তো আন্দাজ করে নিন। ভাষা দিয়ে বোঝানো যাবে না। আপনি তো কোন রকমেই বুঝবেন না, শহরে এ জিনিষ হয় না। গাঁ-অঞ্চলেই বা কতদিন আর বজায় থাকে দেখুন।

চলল তারপরে ধুন্দুমার। শুধুমাত্র দুজনের দুখানা মুখের ব্যাপার নয়, তাল ও সুরের সঙ্গে সর্বঅঙ্গ খেলিয়ে তবে এ জিনিষ উতরায়। দর্শকের কর্ণ ও চক্ষুর সমান পরিতৃপ্তি। তাদের মধ্যেও দুটো দল— কতক তলির মা'র পক্ষ নিয়েছে, আর কতক ভুবন-পিশিমার পক্ষে। কলহেরও দেবতা আছেন—ঢেঁকিবাহন নারদ। ক্লান্ত হয়ে কণ্ঠস্বর যদি কিছু ক্ষীণ হয়ে আসে, রসিক দর্শক নারদের নামে ধ্বনি দিয়ে তাতিয়ে দিচ্ছে।

আধ ঘণ্টার মতো চলল। দুজনেই বুড়োমানুষ, হাঁপিয়ে পড়েছেন। তবু যাক প্রাণ থাক মান। তলির মা'র তো রাঁধা-ভাত মজুত আছে। এদিকটা সেরে গিয়ে বসে পড়বেন। ভুবন-পিশি নিজে রান্না করেন—আবার পুকুরঘাটে গিয়ে জল নিয়ে এসে অবেলায় তাঁকে রান্না চাপাতে হবে।

ভেবেচিন্তে আমি ধামা নিয়ে এলাম একটা। মাথার উপরে ধামা তুলে বলি, অনেক হয়েছে, ক্ষমা দাও এবারে বুড়োমা। ক্ষমা দাও পিশিমা। ঝগড়াটা এখন ধামা-চাপা থাকুক। খেয়েদেয়ে জিরিয়ে আবার সন্ধ্যের দিকে লেগে যেও।

বাড়ির গিন্নি সৌদামিনী ঠাকরুন আপত্তি করে উঠলেন: উঁহু, সন্ধ্যেবেলা কেমন করে হবে? পুরুতঠাকুর তখন এসে ফর্দ মেলাতে বসবেন, চেঁচামেচির মধ্যে কাজকর্ম ভণ্ডুল হয়ে যাবে। কাল-পরশু দুটো দিন নয়। আবার যদি লাগতে হয়, ক্রিয়াকর্ম চুকেবুকে গেলে তারপরে।

অর্থাৎ জমজমাট ব্যাপারটা একেবারে শেষ হয়ে যাবে, দত্ত-জেঠাইমাও চান না সেটা। আশা ছিল, উভয় পক্ষই এই কথার পরে বেঁকে বসবেন। কিন্তু ভুবন-পিশির ক্ষিধে পেয়েছিল ঠিক। ঘাড় নেড়ে ধামার দিকে চেয়ে এক-কথায় রায় দিলেন: হোক তবে তাই—

এতক্ষণের শ্রমে তলির মা'র চেহারাও উৎকট রকম দাঁড়িয়েছে। যা

গতিক, মাথা ঘুরে পড়ে না যান। তিনিও রাজি হয়ে তারিখ দিলেন : শনিবার বিকেলে।

ঢপাস করে উঠানের প্রান্তে ধামা উপুড় করে দিই। ঝগড়া চাপা থাকল ওই ধামার নিচে। শনিবার বিকালে উভয় পক্ষ সমবেত হয়ে ধামা তুলবেন, আজ যে পর্যন্ত হয়ে গেল ঠিক সেইখান থেকে শুরু হবে তখন। আজকের শেষ কথাটার ধরতা দিয়ে। ধামা-চাপা দেওয়া কথাটা নিশ্চয় শুনেছেন, সে হল এই বস্তু। ঝগড়াঝাটির ব্যাপারে সত্যি সত্যি তাই ছিল। পোড়া একালে আমাদের প্রাচীন উত্তরাধিকার সমস্ত একে একে উঠে যাচ্ছে। মেয়েলোক হয়েও আধুনিকা এঁরা ঝগড়া জানেন না। কী ঘেন্না বলুন! ঝগড়াই থাকছে না, ধামা-চাপা দিয়ে আটকাবেন তবে কোন বস্তু?

॥ সাতাশ ॥

এর আগে ঝণ্টুর কথা হচ্ছিল। হতে হতে অন্য দিকে সরে গেলাম। ঝণ্টুর বড়ভাই অতুল—জীবনকাকার বড়ছেলে। চৌরাস্তার লাটবাহাদুর অতুল। কেমন করে হল সেটা বলি।

আমাদের সদর-শহরের সব চেয়ে বনেদি জায়গা চৌরাস্তা। নিজ চোখেই দেখে এসেছেন। অতুল সেখানে ঘিয়ের দোকান দিয়েছিল। খুরজা থেকে ঘি আমদানি হত দোকানে, জেলার গোয়ালাদের ঘি-ও আসত। আরম্ভে ভালই চলেছিল। কিন্তু হাতে পয়সা এলে অতুলচন্দ্রের মনমেজাজ চড়ে যায়। মস্তবড় বাসা ভাড়া করে বাড়ির সকলকে শহরে এনে তুলল। এলাহি খরচ।

আমার নিজ-চোখে দেখা একটা ঘটনা। মোটরবাসের দেরি আছে বলে অতুলদার দোকানে গিয়ে বসেছি। সবে তখন বারো টিন ঘি স্টেশন থেকে খালাস করে নিয়ে এল। কাগজ-কলম নিয়ে অতুলদা

সঙ্গে সঙ্গে পড়তা কষে ফেলে। দেখা গেল, পুরো চালান বিক্রি হবার পর যা মুনাফা দাঁড়াবে, সেটা প্রায় দুই টিন ঘিয়ের দাম। মাল যখন এসে পৌঁছেছে, বিক্রি তো হবেই—দাও টিন দুটো বাসায় পাঠিয়ে, খাওয়াদাওয়া চলুক। নিজেরা খায়, আত্মীয়-কুটুম্ব ইয়ারবন্ধুদের নেমন্তন্ন করে খাওয়ায়। লাটসাহেবের কাণ্ডবাণ্ড—দোকানের ঘি যখন, কঞ্জুষপনা কিসের? দুপুরে পোলাও, রাত্রে লুচি—সাদা-ভাত খাওয়া বাড়ির লোকে প্রায় ভুলে গেল। এবং যথারীতি রাত্রিবেলা বাইরের উপসর্গও দেখা দিয়েছে, শুনতে পাওয়া যায়।

দোকান ঘুচে গেল বছর কয়েকের মধ্যে। গাঁয়ের মানুষ অতুলচন্দ্র আবার গাঁয়েঘরে ফিরে হাটঘাট করে বেড়ায়, বিলের মধ্যে একহাঁটু কাদায় দাঁড়িয়ে ধানচাষের তদারক করে। সবই সেই আগেকার মতো, শহর থেকে শুধুমাত্র খেতাব নিয়ে এসেছে—চৌরাস্তার লাটবাহাদুর।

দেশে মেয়ের অপ্রতুল নেই, আমাদের ঝণ্টুরও বিয়ে হল একদিন। তখন আমি কলেজে ঢুকেছি। ঝণ্টুর বউ দেখবার জন্য তলির মা পাগল হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সম্বন্ধ পাকা হবার আগেই তিনি চোখ বুজলেন।

ভাল ঘরের সম্বন্ধ—মির্জানগরের জয়দ্রথ দে চৌধুরির মেয়ে। আগ্রহ করেই তাঁরা মেয়ে দিচ্ছেন। বংশমর্যাদায় ঝণ্টুরা বড়, মোটা-ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান আছে, তার উপরে চৌরাস্তার দোকানটা বজায় আছে তখনো। আরও যে গুহ্য কারণ, সেটা জানা গেল বউ ঘরকন্না করতে আসার পর। বউ একটা চোখে দেখতে পায় না, বসন্তরোগে কানা হয়ে গেছে। জয়দ্রথ বরাবর বাইরে বাইরে কাটিয়ে এসেছেন, কনের এতবড় খুঁত অঞ্চলের মধ্যে তাই কেউ জানত না। পাথরের চোখ এমন নিখুঁতভাবে বসানো যে নিরিখ করে দেখেও ধরবার জো নেই। সে যাকগে, একটা চোখেই যখন দিব্যি দেখা চলে, বাড়তি একটা না আছে তো বয়ে গেল।

.ভাল ঘরে বিয়ে, বাজিবাজনা ও খাওয়াদাওয়ার অঢেল আয়োজন —সেই আনন্দে আমরা মশগুল। গাঁয়ের ছোঁড়াদের উপর— বিশেষ করে আমার উপরে, বর সামলানোর ভার। ঝণ্টুর লেখাপড়া শশীপণ্ডিতের পাঠশালাতেই শেষ। এবং সেখানে কতদূর কি হয়েছে, সেটা নিশ্চয় তলির মা বুড়ির ওই একদিনের ব্যাপারে আন্দাজ পেয়েছেন। জীবনকাকা পই পই কবে বলে দিয়েছেন, সাত-পাক সমাধা না হওয়া পর্যন্ত অতি সতর্ক হয়ে থাকি যেন আমবা, লেখাপড়ার কথা নিয়ে কেউ বরের কাছে ঘেঁসতে না পারে। সাত-পাকের ব্যাপারটা চুকে গেলে একেবাবে নিশ্চিন্ত - দলে লোক বেড়ে গেছে তখন, কন্যার আত্মীয়স্বজনরাও কোমর বেঁধে পাশে দাঁড়াবেন। জামাইয়ের নিন্দে বেরোলে তাঁদেরও মুখ ছোট হবে।

ঝণ্টুর মুখ জুড়ে ফুটকি-ফুটকি শ্বেতচন্দন, পবনে গবদের জোড়, বরাসনে তাকিয়ার ব্যূহেব মধ্যে গদিয়ান হয়ে বসেছে। আহা, সেই দেখেছিলাম একদিন—আর এই মাস চারেক আগে বিড়ি-বাঁধা একটা মানুষকে দেখলাম!

তখনকার দিনের যা রেওয়াজ—মির্জানগরেব ছেলেরা ঝণ্টুকে ঘিরে বসে জামাই-ঠকানো প্রশ্ন ছুড়ছে: এখান থেকে ফেললাম দড়া, দড়া চলে গেল বামনপাড়া—অর্থ কি?—পথ।' ঝণ্টুব মুখের কাছে কান এগিয়ে যেন তাব মুখ থেকে শুনে নিয়েই প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। ঘরের মধ্যে ঘর, তাব মধ্যে পরমেশ্বব—কোন্ বস্তু সেটা?—মশারি।

ওরা চটে গিয়ে বলে, বর কি বোবা, নিজে বলতে পারে না? আমাদের জবাব: ছুটকো সৈন্য দিয়ে হয়ে যাচ্ছে তো সেনাপতি কেন রণে নামতে যাবে? মুখ বাকিয়ে তারা বলে কিষ্কিন্ধ্যার সৈন্য—সুগ্রীব সেনাপতি—

যা খুশি বলুক গে, বিয়েয় বসবার জন্য ছাদনাতলার ডাক এসে গেলে যে বাচি!

গেরো কি একরকম! বড়ভাই অতুলের এমন ঘিয়ের দোকান, আর ছোটভাই ঝণ্টুর ঘিয়ের গন্ধে গা ঘুলিয়ে আসে, জিভে পড়লে হুড়হুড় করে বমি করে ফেলে। বিয়ের ভোজে লুচি খাওয়ানোর বিধি। সরষে বা নারকেল-তেলে ভাজা হলে ঝণ্টুর আপত্তি নেই। কিন্তু অন্নের বেলা সে ব্যবস্থা থাকেও যদি, জামাইয়েব পাতে সুনিশ্চিত ঘিয়ের বস্তু হাজির করবে। তখনকাব কী উপায়! বারম্বার আমাদের জনে জনের কাছে ঝণ্টু বিপদ জানিয়ে রেখেছে। বিয়ে হয়ে গেলেই হল না পরের ঝঞ্ঝাটগুলো আরও মারাত্মক।

আমি অতএব মেয়েব মার কাছে গিয়ে সবিনয়ে বলি, উপোস করে থেকে বরের গা বমি-বমি করছে। লুচি-টুচি নয়, লঘু জিনিস—চাট্টি ভাত-মাছের ঝোলেব ব্যবস্থা করে দিন।

বুদ্ধি করে বমির কথাটাও শুনিয়ে রাখলাম। দৈবাৎ ঘৃত-সংযোগ হয়ে সেই কাণ্ডই যদি ঘটে যায়, তখনকার কৈফিয়ৎ হয়ে থাকল।

লুচি বাতিল হয়েও তবু ফাঁড়া কাটে নি। সরু চালের ফুরফুরে ভাত, থালা ঘিরে ডজনখানেক ব্যঞ্জনের বাটি। আয়োজন দেখে উপোসি ঝণ্টুর খিধে আরও চনচন করে ওঠে। কিন্তু হলে হবে কি, সর্বনাশ করে রেখেছে—ছোট্ট একটা বাটিতে পাতে-খাবার গব্যঘৃত। দু-পাঁচ গ্রাস খেয়ে কিঞ্চিৎ ক্ষুধার উপশম করে নেবে, তারও কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না—সর্বাগ্রে ওই বস্তু, ঘি দিয়ে ভোজন শুরু করবার রীতি। করুণ চোখে একনজর আমার দিকে তাকিয়ে হাত গুটিয়ে ঝণ্টু চুপচাপ বসে রইল।

মেয়েরা বলে, কী হল জামাই, খাও না কেন?

চোখ টিপে নিম্নস্বরে আমি বলি, ঝণ্টু আমাদের আজেবাজে দশজনের মতো নয়। ঈশ্বরবিশ্বাসী খুব। মনে মনে ঠাকুরের নাম করছে।

বলছি, আর উপায় ভাবছি মনে মনে। ঈশ্বরই সুরাহা করলেন অকস্মাৎ। বাইরে-বাড়ি তুমুল চেঁচামেচি, প্রায় এক কুরুক্ষেত্রের

ব্যাপার। কি হল কি হল করে মেয়েরা ছুটল—বিয়েবাড়ির কোন মজা কেউ বাদ দেবে না। যেতে পারলেন না কেবল ঝণ্টুর শাশুড়ি। মন আনচান করছে, বুঝতে পারি—কিন্তু জামাইকে পরিবেশন করছেন, যাবেন এখন কেমন করে?

মাছ-ভাজা দিয়েছেন পাতে। আমি বললাম, খয়রামাছ-ভাজা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে জুত থাকে না।

কথাটা মোক্ষম রকম লেগে গেল। শাশুড়ি তাড়াতাড়ি বললেন, তার জন্যে কি বাবা, দিচ্ছি এনে গরম করে।

ভাজা-মাছ তুলে নিয়ে গরম করতে রান্নাঘরে ঢুকলেন। যেই মাত্র আড়াল হয়েছেন, ঘিয়ের বাটি আঁস্তাকুড়ে উপুড় করি। ঝণ্টুকে তাড়া দিইঃ ডাল ঢেলে নে শিগগির। তাকিয়ে দেখিস কি? ভাতের সঙ্গে মেখে নিয়ে সপাসপ গিলতে থাক।

ক্রমশ বাইরে-বাড়ির বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। লাটবাহাদুর অতুলচন্দ্রের কাণ্ড। বাজিওয়ালাদের উপর হচ্ছিল—চরকিবাজি নাকি যথেষ্ট তারা কাটে নি। একজন তার জবাবে বলেছে, তোমার নিজের চোখেই বাবু হরদম তারা কাটছে, বাজি তুমি আর দেখলে কখন!

ভাইয়ের বিয়ের মচ্ছবে কিছু বেএক্তিয়ার হয়ে পড়েছে অতুল, তা বলে সর্বলোকের সামনে বলবে সেই কথা! অতুলকে আর ধরে রাখা যায় না—এই মারে তো এই মারে। আবার খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষও ইদানীং এমন হয়েছে, এক কথার বদলে দশ-কথা শুনিয়ে ছাড়ে, বাবু বলে খাতির রাখে না।

মেয়েরা ফিরে আসছে এইবার। অতুলের ভাবভঙ্গি আর কথাবার্তা নকল করে হাসে খিলখিল করে—হাসতে হাসতে এ-ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে।

কি লা, হাসিস-ক্লেন রে অত, থাম্। যে মানা করে, সে-ও হেসে শতখান হয়ে পড়ছে।

শাশুড়িঠাকরুন মাছ-ভাজা গরম করে নিয়ে বেরোলেন। ইতিমধ্যে

কাজ হাসিল আমাদের, আর কিছু পরোয়া করিনে। পরমোৎসাহে বলি, দিয়ে দিন। বেশ মুচমুচে হয়েছে তো? আপনার জামাই ডালে-ঘিয়ে মেখে নিয়েছে, দিব্যি চাখনা হবে।

খাওয়ার পর্ব চুকল তো শোওয়া। শুধু ঝণ্টু বলে নয়, জীবন-কাকার অবধি চিন্তা ঢুকেছে মাথায়। বলেন, পুরোপুরি মেয়েদের রাজ্য ওটা। বেটাছেলে তোদের তো ত্রিসীমানা মাড়াতে দেবে না। তালিম দিয়ে দিয়েছিস ভাল করে? কথাবার্তা যেন চেপেচুপে বলে।

সত্যি, পাখি পড়ান পড়িয়ে রেখেছি ঝণ্টুকে: ঘন ঘন হাই তুলবি ঝণ্টু, চোখ বুজে নেতিয়ে পড়বি বালিশেব উপর। যেন ঘুম ধরেছে সারাদিনের ধকলে, কাতর হয়ে পড়েছিস। সাতটা কথার পর তবে একটা জবাব—তা-ও 'হুঁ'-'হাঁ'ব বেশি নয়। ঘুমের আবেশে কথা জড়িয়ে যাচ্ছে, এমনি একটা ভাব।

ঝণ্টু একবার বলে, বউয়ের সঙ্গেও?

এমন কাতরভাবে বলল যে অতখানি কড়া নির্দেশ দিতে বাধ-বাধ লাগে। নরম হয়ে বলি, বউ হল আপনার লোক। তখন কেউ তো আর ঘরে থাকছে না, এক যদি বাইরে থেকে পাতান দেয়। দেয় কেন, দেবেই। গলা চেপে ফিসফিস করে কথা বলবি। মেয়েলোক তায় বয়সে ছোট—বাসরঘরের ভিতর তত ভয় বউকে না-ই করলি।

যদি কিছু জিজ্ঞাসা করে বসে?

যত ভরসাই দি, সেই আশঙ্কা আমাদের মনেও। বাপের সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে নানা জায়গায় ঘুরত, লেখাপড়া কতদূর করেছে সঠিক সংবাদ নেই। ধরুন বাসরঘরে নতুন বউ জিজ্ঞাসা করে বসল, 'ভার্বাল নাউন' কাকে বলে, কিম্বা চতুর্থীর একবচনে 'অনডুহ' শব্দের কোন রূপ দাঁড়াবে।—তখন?

সেই জন্যে তো বলছি ঝণ্টু, কাজ নেই পয়লা দিন বেশি ঘাঁটাঘাটি করে। বউ তো পালিয়ে যাচ্ছে না, চিরজীবন ধরে বহাল রইল। যত কথা বলতে চাস, এর পর মনের সাধে বলিস।

ইত্যাদি বিস্তর রকম বুদ্ধি দিয়েছি। মেয়েরা আগে-পিছে ডাইনে-বাঁয়ে ঘিরে ঝণ্টুকে বাসরে নিয়ে চলল। দূরে দাঁড়িয়ে দেখছি। ফাঁসির আসামিকে কনেস্টবলে ঘিরে বোধকরি এমনিভাবে ফাঁসি-কাঠে চড়ায়।

ভোর না হতেই ঘুম ভেঙে গেল। মনটা খারাপ লাগছে। নিঃসহায় একলা একটি প্রাণী বিষণ্ণ মুখে সেই গিয়ে বাসরে ঢুকল, রাতের খবর না জানা অবধি সোয়াস্তি নেই। বেরিয়ে এল হেন কালে ঝণ্টু। স্ফূর্তিতে ডগমগ। একপাশে আমাদের ডেকে নিয়ে বলে, আর ডরাই নে। আমি আর কতটুকু মুখ্যু! বউ আমার অনেক উপর দিয়ে যায়।

বটে, বটে!

প্রথম কথা বউয়ের সঙ্গে—ঝণ্টুর মুখে আদ্যোপান্ত শুনলাম। বউকে প্রশ্ন করে ঠকাতে হবে, আসরে বরাসনের উপর বসিয়ে ঝণ্টুকে যেমন কন্যাপক্ষের ছোঁড়ারা ঠকাতে চেয়েছিল।

ভেবেচিন্তে ঝণ্টু বলে, তোমার বৃদ্ধ-পিতামহের নাম কি?

অতিশয় সঙ্গিন প্রশ্ন। পিতার পিতা হলেন পিতামহ, তাঁর কাঁধের উপর বৃদ্ধ চাপানো হয়েছে। সম্পর্ক হিসাব করে জবাব দেওয়া সহজ হবে না।

ঠিক তাই। বউ চুপ করে থাকে। অনুজ্জ্বল প্রদীপের আলোয় সঠিক ধরা না গেলেও বরের বিদ্যাবত্তায় চমক লেগেছে, সন্দেহ নেই।

প্যাঁচে ফেলে ঝণ্টু আরও চেপে ধরে: কী নাম বলো।

থতমত খেয়ে বউ একেবারে বাপের নাম বলে দিল, শ্রীযুক্ত বাবু জয়দ্রথ দে চৌধুরি—

নতুন-বউয়ের মূর্খতার কাহিনী বলতে বলতে হাসি আর সামলাতে পারে না—হি-হি হো-হো করে উচ্চ-হাসি হেসে ওঠে। বাসরের

রণক্ষেত্রে পরের মেয়েকে নাস্তানাবুদ করে ষোলআনা রণজয় করে ফিরেছে আমাদের ঝণ্টু।

কতকাল আগেকার কথা, মনে হয় কালকের ব্যাপার। ও-বছর যখন গাঁয়ে এলাম, ঝণ্টুব খবর কেউ বলতে পারল না। ঝণ্টুর বড়ভাই চৌরাস্তার লাটবাহাদুর আছে বেশ ভাল। বউ হিন্দুস্থানে পার হয়ে গেছে, সেখানে সে চাকবে ভায়ের আশ্রয়ে থাকে। কিন্তু অতুলের প্রখর আত্মমর্যাদা—প্রাণে মরবে, তবু কিছুতে শ্বশুরবাড়ির ঘরজামাই হবে না। দেশে-ঘরে পড়ে আছে। তবে নিজেব ঘরে থাকে না কোনদিন। চালে ছাউনি নেই, দেয়াল খসে খসে পড়ছে, থাকবে সেখানে কেমন করে! চাব মেয়েব বিয়ে হয়ে গেছে—কোন একটির বাড়ি গিয়ে ওঠে। খাতিবযত্ন পায় কিছুদিন—তাবপর মেয়েই হয়তো বলল, বাবা জায়গাব বড্ড অসুবিধা, তাই এবা বলছিল—। বোঁচকাবুঁচকি বেঁধে নিয়ে অতুল চলল আব এক মেয়েব বাড়ি।

যার কাছে খবব নিই, সেই লোক দেখি রীতিমতো ঈর্ষ্যাপব অতুলের সম্পর্কে। বলে, কপালখানা দেখুন। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমাদের পেটেব অন্ন জোটে না, আব বাবোমাস তিরিশ দিন জামাইবাড়িব শ্বশুব হয়ে অতুল দিব্যি কুটুমভাতা খেয়ে বেড়াচ্ছে। চাবটে মেয়ে—তিন মাস হিসাবে বাড়ি ভাগ করে নিলে বছর কেটে গেল। এমন সুবিধে থাকতে কি জন্যে বলুন শালার সেই খাঁচার মতন কোয়ার্টারে পড়ে থাকতে যাবে?

ঝণ্টু আছে কি নেই, সে খবর কেউ দিতে পারল না।

সেই ঝণ্টুকে হঠাৎ চোখে দেখলাম। একটা অনুষ্ঠানে বনগাঁ গিয়েছিলাম। বিরাট সম্বর্ধনা। উদ্বাস্তু-পল্লীর সামনে দিয়ে যাচ্ছি—দেখি ঝণ্টু।

রোখো, রোখো গাড়ি—

রোগা হয়ে গেছে বিষম, বড় বড় চুল। চেহারা বদলেছে, তবু

আদলটা যাবে কোথায়। কাটারি হাতে ঝণ্টু এ-গাছে একটা কোপ ও-গাছে একটা কোপ দিয়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরছে। ছোট ছেলেপুলের হাতে নতুন অস্ত্র পড়লে হাত নিশপিশ করে—সেই অবস্থা।

গাড়ি থেকে নেমে এসে বলি, ঝণ্টু তুমি এখানে! আছ কেমন? আর সকলে কোথায়?

তাকিয়ে বইল ফ্যালফ্যাল কবে। শতছিন্ন ন্যাকড়া পবনে। একেবাবে দিগম্বব না থেকে নিতান্তই লজ্জাবক্ষাব মতো আচ্ছাদনটুকু।

(একটা গাল-ভবা কথাব খুব চলন হয়েছে—বিশ্বমানবতা। তাই বুঝি মহাপ্রাণ নেতাবা লাখ লাখ নিবীহ নিবপবাধেব সঙ্কীর্ণ গৃহস্থালী ভেঙে তাদেব পুবোপুরি বিশ্বমানব বানিয়ে ছেড়ে দিলেন। মূর্খমানুষ ঝণ্টু এ জিনিষেব মহিমা বোঝে না।)

কী ঝণ্টু, আমায় চিনতে পাবলে না? দেখ দিকি নজব কবে।

গায়ে হাত দিলাম। হাত ধবলাম। একটু যদি সাহস পেতাম, জড়িয়ে ধরতাম বুকে। কিন্তু কেমন হতভম্ব ভাবে তাকিয়ে ঝণ্টু হাতখানা সরিয়ে দিল। পবিচ্ছন্ন ধবধবে পোশাকআশাক আমার, মোটব হাঁকিযে যাচ্ছি। একটা বযসে দুজনে একগাছে চড়ে খেজুররস খেয়েছি, শশীপণ্ডিতের পাঠশালে একসঙ্গে পড়েছি—সে যেন কোন এক ভিন্ন জন্মের কথা।

॥ আঠাশ ॥

দত্তপাড়ার সর্বশেষ এই বাড়িটায় রাজেন ঘোষ মশায় থাকতেন। বিষম শিক্ষিত তিনি, এল. এ. পাশ (ছাপাব ভুল নয়, এল. এ.-ই। এণ্ট্রান্স পাশ করে তখন এল. এ. পড়ত)। বিনয় দত্ত শেষাশেষি যে উকিলবাবুর আদায়-তহ্‌শিল করতেন, রাজেন তাঁর ছোটভাই। সদরে থাকতেন ইনিও, ইস্কুলের মাস্টার। তার পরে,

কি কারণে জানি নে, সেই কাজ ছেড়ে দিয়ে গাঁয়ে চলে এলেন। মামা কৃষ্ণপদ দত্ত নির্বংশ, বাড়ির সব মরেহেজে গেছে, মাতুল-সম্পত্তির দখলিকার হয়ে সেইখানে রাজেন এসে উঠেছেন। আছেন বেশ ভাল।

শিক্ষিত বলে গাঁয়ের মধ্যে রাজেনের বড় খাতির। নতুন জুতো পায়ে মসমস করে বিচরণ করেন। মাথায় চকচকে টাক, তাই গন্ধতেল মাখার কায়দা নেই। এসেন্স ছিটিয়ে দেন কাপড়ে-জামায়, যে পথে চলাচল করেন গন্ধে ভরে যায়। জেঠাইমা বলতেন বিদ্যের গন্ধ। আর শহরে থাকার দরুন কথার মধ্যেও কিছু বাঁকা টান। জেঠাইমা বলতেন, মন দিয়ে লেখাপড়া কর্, তোদের কথাতেও এমনি টান ধরবে।

স্ত্রী দজ্জা-, স্ত্রীর সঙ্গে বনে না। তিনি রয়ে গেছেন শহরে। ছেলেরা মায়ের সঙ্গে। রাজেন একলা প্রাণী ডোঙাঘাটায়। গোবিন্দ, ফলাও করে প্রাণগোবিন্দ—নামক এক ছোঁড়া আছে রসুইবাসের জন্য। হাবাগবা মানুষ। -বে সুবিধা আছে, প্রজার ম-্যে পড়ে, ভিটেবাড়ির দরুন খাজনা বাকি পঁচিশ বছরের। মাইনেটা তাই নগদ দিতে হয় না, খাজনা থেকে কাটান যাবে। কত মাইনে, খাজনাই বা কত পাওনা, তার কোন ঠিকঠাক হয়নি অবশ্য। চলুক এমনি, পরে এক সময় হিসাব করলে হবে। নির্ঝঞ্ঝাট দিব্যি আছেন। মাস্টারি জুটেছে ইতিমধ্যে পাশের গ্রামের ইস্কুলে। এমন গুণীলোক পাড়াগাঁয়ে ক'টা মেলে! ভাগ্যবশে এসে রয়েছেন তো ডেকে নিয়ে তারা চাকরি দিল।

প্রাইভেট পড়ানোও ধরতে হল খাতিরে পড়ে। ছাত্র সুশীল—বিনয় দত্তের বড়ছেলে। আরও পরিচয় পেয়েছেন সুশীলের– সেই যে জন অটল ডাক্তারের সঙ্গে কম্পাউণ্ডার হয়ে গিয়ে ফকিরের ছেলের গুলির চিকিচ্ছে করল। এ সময়টা সুশীল ইস্কুলের ছাত্র। থার্ডক্লাসে পড়ে। চার বছর একাদিক্রমে চেষ্টা করছে, দাড়িগোঁফ উঠে গেল, সেকেণ্ডক্লাসে উঠতে পারল না। সে নাকি বড় শক্ত। সেকেণ্ডক্লাস মানে ম্যাট্রিক-

প্রিপারেটরি ক্লাস—ম্যাট্রিকুলেশনের আধাআধি না হলেও রকম চার-আনা তো বটেই। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ওই অবধি যেতে হয়। এমনি তো কোন আশাই নেই, বাজেন ঘোষেব মতো বিদ্বান ব্যক্তি যদি ঠেলে তুলতে পাবেন।

পাড়াগাঁয়েব টুইশানি। বিনয় দত্ত এসে বলেন, পাঁচটা কবে টাকা দেব রাজেনদা, তাব বেশি পেবে উঠব না। পড়াবেন সকালে দু-ঘণ্টা, সন্ধ্যায় দু-ঘণ্টা। ব্যস! পডানো আব কি, নিয়ে বসে থাকা। আপনার কাছে বসে থাকলে অজান্তে যা ছাডবেন, তাতেই ছেলের বিদ্যেব ভবা বোঝাই হয়ে যাবে।

ঠিক হল তাই। রাজেন ঘোষেব দাবাখেলাব নেশা। ইস্কুল থেকে ফিরে এসে দাবায় বসে যান সীতেশ্বব অথবা অতুলেব সঙ্গে। হেবিকেন জ্বলে টিমটিম কবে, সুশীল পডে সেখানে বসে। অর্থাৎ দাবাখেলা দেখে হাঁ কবে। এবং ফরমাশ হলে, অথবা না হতেই—তামাক সেজে এনে হুঁকোব মাথায কলকে বসিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে বাজেনেব বিবেক জাগ্রত হয়ে ওঠে: দাবার চাল ভাবতে ভাবতে নজব পডে যায়, মাস্টাবেব সঙ্গে ছাত্রটিও গালে হাত দিয়ে চাল ভাবতে বসেছে। তখন হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন: খেলা দেখা হচ্ছে? হুঁ-হুঁ-উ মোটে এদিকে তাকাবি নে, তাহলে দাবাব খোঁচায় চোখ কানা কবে দেবো। পড়্—

পাটীগণিত টেনে নিয়ে তিনটে অঙ্ক দাগ দিয়ে দেন। বেশ ওজনদাব অঙ্ক—যত তাড়াতাড়ি করুক, নিদেনপক্ষে আধ ঘণ্টা। আধ ঘণ্টায় বাজিটা কাবার হবে। তারপব নতুন কবে গুটি সাজাবার আগে তাড়াতাড়ি খানিকটা পড়িয়ে নেবেন। কর্তব্যহানি হতে দেবেন না কিছুতে।

দোষই বা দেবেন কোন বিবেচনায়! পাঁচ টাকা মাস-মাইনে—মাস চারেক হয়ে গেছে, তা সাকুল্যে বোধহয় চারটে টাকাও উশুল হয়নি। বিনয় দত্ত প্রবোধ দেন: হবে, হবে। ঘাবড়ান কেন

রাজেনদা? চোতমাসে সালতামামি, সমস্ত শোধ করে দেব তখন। রাজেনও এখন তাগিদ ছেড়ে দিয়েছেন। যখন খুশি দেবে, না দেয় না-ই দিক। সকাল-বিকাল বলে কথা কি, সুশীল ইদানীং রাজেনের প্রায় সর্বক্ষণের ছাত্র। তাগড়া জোয়ান, এবং খুব কাজের ছেলে। পড়ার মধ্যেও মুহুর্মুহু উঠে গিয়ে তামাক সেজে আনে। রাত্রে শোয় এখানেই—ঘুমের মধ্যেও উঠে হুঁকো এনে ভক্তিভরে রাজেনের মুখে ধরে।

শ্রাবণ মাসে দিনমানেও আকাশ অন্ধকার। বৃষ্টিবাদলা জোর চেপেছে আজ ক'দিন। খানাখন্দ জলে টইটম্বুর। ব্যাং ডাকছে অবিরত। গুঁড়িকচুর পাতা থেকে জলের ফোঁটা মুক্তোর মতন গড়িয়ে পড়ছে। হঠাৎ বা দেখা যায়, কইমাছ ডাঙায় উঠে পথের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে কানকোয় ভর দিয়ে। রাজেনের ইস্কুলে যাওয়া হচ্ছে না। উপরে বৃষ্টি, নিচে হাঁটুভর জলকাদা, এর মধ্যে দেড় ক্রোশ পথ ভেঙে গিয়ে দেখা যাবে ক্লাস ফাঁকা—ছেলেই আসেনি মোটে। পাড়াগাঁয়ের লোকের লেখাপড়া নিয়ে এত বেশি মাথাব্যথা নেই যে বৃষ্টিবাদলার মধ্যেও ছেলে পাঠাতে হবে দিগ্‌গজ করে তোলবার জন্য।

বাড়ি বসে বসেই বা কী করা যায়? এই সময়টা ম্যালেরিয়া ঘরে ঘরে। অতুলকে জ্বরে ধরেছে, আর সীতেশ্বর সদরে গিয়েছেন মামলা করতে। দাবার খেলুড়ে নেই। সুশীলকে ডেকে রাজেন বললেন, বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। হুঁ-হুঁ-উ রাত্রে একটু মাংস-টাংস হলে কেমন হয় রে? ইয়ে-ই দেখ্‌ না।

প্রবল বর্ষার মধ্যে সুশীল বেরোল। এই গুণেই রাজেন মুগ্ধ। ইয়ে অর্থাৎ মোরগ। রাজেন একটিমাত্র টাকা দিয়েছেন, ভাল জিনিস ওতে হয় না। ভন্নার মধ্যে বাড়ি বাড়ি ঘুরছে, তাইতে বুঝে নিয়েছে দায়ে পড়ে গেছে বাবুরা। সুশীলও নাছোড়বান্দা—আরে ভাই, না দেবে তো কি হয়েছে? ওষুধ নয় যে খেতেই হবে। অনেক ঘোরাঘুরির পর পছন্দমতো একটা মিলল দেড় টাকায়। এক টাকা

এই নগদ—বাকি আট আনা কাল রাজেন ঘোষ এই পথে ইস্কুলে যাবার সময় দিয়ে যাবেন।

কক্-কঅক্-কক্ ডাক শুনে এবং উজ্জ্বল চেহাবাখানা দেখে বাজেন প্রসন্ন হলেন, কিন্তু দামেব খুঁতখুঁতানি গেল না। হায় রে, কালে কালে কী হয়ে দাঁড়াল! আমাদেব ছেলেবেলায় পাঁচ-ছ আনায় এই বস্তু বিকাত। মানুষ সব ম্লেচ্ছাচাবী হয়েছে—অধ্যাপক-বামুনরা পর্যন্ত নামাবলী ঢেকে বামপক্ষী কিনে নিয়ে যাচ্ছেন, দর বাড়বে না কেন বলো?

বললেন, গোবিন্দ বোধহয় ছোঁবে না। তোয়ের কবে হুঁ-হুঁ-উ সকাল সকাল তুমি চাপিয়ে দাও সুশীল। এত বড জিনিসটা দু-জনে বোধহয় শেষ কবতে পাবব না।

সুশীল সোৎসাহে বলে, পটলাকে নেমন্তন্ন কবে দিই তবে। আ'ল ভেঙে ওদের বাড়ি সকলেব আগে উঠলাম—জিনিস দেখে খুব তারিপ কবতে লাগল।

বাজেন রেগে উঠলেন: কি বলিস তুই। এই আক্রা মাল, আর তুই একেবাবে নেমন্তন্নেব বাযনা নিযে এসেছিস? ও-সব হবে-টবে না। রাত্রে যদ্দূব পাবি সাঁটব, হুঁ-হুঁ-উ বাদ-বাকি কাল সকালে দেখা যাবে। চাল চাট্টি বেশি কবে নিস। ভাতে জল ঢেলে পান্তা করে বাখা যাবে। পান্তাভাত আব বাসি-মাংসেব আলাদা মজা।

খবরটা এদিকে চট কবে পটলা অবধি পৌঁছে গেল। প্রাণগোবিন্দ টিউবওয়েলে জল নিতে গিযেছিল, ওই পথে পটলাব বাডি গিয়ে সেবে এল কাজটা।

পটলা আহত স্ববে বলে, নেমন্তন্ন না কবল তো বয়ে গেল। আমাদের লুচি হবে বাত্রে। ময়দা কিনে এনেছি, ঘানি-ভাঙানো টাটকা নারকেল-তেল—ভাতের বদলে বাত্রে আজ লুচি। ওবা নেমন্তন্ন করল না তো সুশীলকে বলবি, আমবাই তাকে নেমন্তন্ন করছি। নকড়ি যাচ্ছে এখনই।

নকড়ি পটলাদের বাড়ির মাহিন্দার—পটলার প্রধান শাগরেদ। সে গিয়ে সুশীলকে নেমন্তন্ন করে। সুশীল অবাক হয়ে বলে, সে কি রে, আজ কী করে হবে? আমাদের এখানে মাংস-ভাত—রামপাখী। আমিই রসুই করছি আবার।

নকড়ি বলে, আমাদের লুচি-ছক্কা। তাই তো জিজ্ঞাসা করছি, ভাত না লুচি—কোনটা পছন্দ তোমার? ভাত তো অন্নপ্রাশনের দিন থেকেই খাচ্ছ। বিয়েথাওয়ার ব্যাপার না হলে লুচি ক-দিন জোটে বলো। তবে হ্যাঁ, ভাতের উপরে মাংসের চাপান পড়ছে। দেখ সেটা ভেবে।

সুশীল সত্যি ভাবিত হয়ে পড়ে। ভাত-মাংস না লুচি-ছক্কা—পাল্লার কোন দিকে ভারী? আশা করে এমন মোরগটা এনেছে—ওরা আর লুচি খাওয়ানোর দিন পেল না!

নেমন্তন্নের ব্যাপারে আরো কিছু কথাবার্তা বলে নকড়ি চলে গেল। সেই থেকে সুশীল ভাবছে।

লোকাভাবে রাজেন একলাই দু-দিককার দাবা-বড়ে সাজিয়ে বসে গেছেন, দু-পক্ষের চাল দিচ্ছেন। ভাতটা প্রাণগোবিন্দ আগে নামিয়ে দিয়েছে, সুশীল মাংস চাপিয়েছে। ছোঁড়া সর্বকর্মে বিশারদ। এমন খাসা গন্ধ বেরিয়েছে, নাকের মধ্য দিয়ে মাথা গোলমাল করে দেয়। দাবার চালে মন বসে না।

রাজেন হাঁক ছাড়লেন: হুঁ-হুঁ-উ হয়ে গেল নাকি রে?

দেরি নেই। সিদ্ধ হয়ে গেছে। জল আর একটু মরলে নামিয়ে ফেলি।

রাজেন ঘোষ গাড়ু-হাতে শশব্যস্তে উঠে পড়লেন। উদর যতদূর সম্ভব খালি করে নিয়ে বসতে হবে। তাড়াতাড়ি সেরে আসা দরকার, মাংস জুড়িয়ে গেলে জুত হয় না।

কিন্তু মুশকিল, ভীতু মানুষ তিনি' ভূতের ভয়, সাপের ভয়—চোরেরও। বৃষ্টিটা জোরে নামল এই সময়। অন্ধকার যেন নিরেট।

রাজেন বললেন, দূরে নয়, ওই বাতাবিলেবু-তলায় বসছি আমি। হুঁ-হুঁ-উ কে দেখছে এখন! সুশীল, তুমি বাবা রান্নাঘর থেকে বাইরে এসে একটু দাঁড়াও।

সুশীল বলে, দাঁড়াব তো রাজেন-কাকা, কিন্তু মাংস যদি ধরে যায়?

সেইটে দেখো। মাংস বেজুত হলে হুঁ-হুঁ-উ মাথায় ঘা দিয়ে মরব।

সুশীল প্রণিধান করে দেখে বলে, না, ফুটছে টগবগ করে। দেরি আছে একটু। চলুন।

রাজেন এ গিয়ে গেছেন। সুশীল সবে বাইরে বেরিয়েছে—হঠাৎ আঁ-আঁ করে ওঠে। বিষম তোড়পাড়।

কি, কি হল রে?

দুমদুম করে লাঠির ঘা পড়ছে রান্নাঘরের দাওয়ায়। সুশীল আর্তনাদ করে: ডাকাত পড়েছে কাকা। আসুন, ছুটে আসুন -আমায় মেরে ফেলল। বাঁচান।

আর তখন ছুটে আসা! গাড়ু পড়ে রইল। রাজেন ঘোষ হতভম্ব হয়ে এদিক-ওদিক করছেন। সুশীল ডাকাতের কবল থেকে কোনো গতিকে বেরিয়ে এঁটেসেটে ধরল তাঁকে। থরথরি কাঁপছে আর প্রাণপণে জাপটে ধরেছে। রাজেন ঘোষ এর পরে অবশ্য বলতেন, ভয়-টয় মিছে কথা, ভয় পেতে বয়ে গেছে সুশীলের—তিনি পাছে রান্না-ঘরে এসে পড়েন সেইজন্য ভয়ের ছুতোয় আটকে রাখল তাঁকে। বিষম হুল্লোড়। মাথায় ঝুপঝুপে বৃষ্টি, পায়ের তলে প্যাচপেচে কাদা—তার মধ্যে পা পিছলে পড়ে গেল সুশীল। পড়ল রাজেন ঘোষকে নিয়ে। জলে-কাদায় মাখামাখি।

চেঁচামেচিতে পরামাণিকবাড়ি অবধি সাড়া পড়ে গেছে। তারা চেঁচাচ্ছে: কি হয়েছে, আসব নাকি?

এসো, শিগগির এসো—চোর—

সুশীল আরও জোরে হাঁক দিয়ে ওঠে: ডাকাত—

বৃষ্টি কমে এসেছে তখন। শুধু পরামাণিকবাড়ি নয়—লণ্ঠন নিয়ে

এদিক-ওদিক থেকে তিন-চারটে দল এসে পড়ল। দালানের দরজা খোলা পড়ে আছে। সকলে সেদিকে ছোটে। না, ক্ষীণ দৃষ্টি ডাকাতের—দালান অবধি নজর যায় নি। ওদিকে গেলে রাজেন ঘোষের ট্যাঁকঘড়িই তো যেত সর্বাগ্রে। একেবারে সামনে রয়েছে। কোন-কিছুতে হাত দেয় নি। ভালমানুষ ডাকাত রান্নাঘরের ক'টা বাসনকোসন নিয়ে সরেছে। সর্বরক্ষে!

রান্নাঘরে ঢুকে দেখা গেল, তা-ও নয়, থালা-ঘটি-বাটি-বোগনো যেমন-কে-তেমন রয়ে গেছে। কি নিল তবে? বৃষ্টিতে ভিজে লাঠিসোটা মেরে শুধু কেবল পদচারণা করেই ফিরে গেল? তারপরে নজরে পড়ল সুশীলেরই: অ্যা, মাংস কই? ও কাকা, কড়াইসুদ্ধ লোপাট।

উনুনের উপর টগবগ করে মাংস ফুটছিল, কড়াই তেতে আগুন—অতএব দুটো মানুষ দুদিকের আংটা ধরে খুব সতর্ক ভাবে নিয়ে গেছে। জিনিসপত্র কোন-কিছু না নিয়ে অত কষ্ট করে মাংসের কড়াইটা শুধু নিয়ে গেল কেন? গেল তো গেল—একটা বাটিতে রাজেন ঘোষের জন্য খানিকটা অন্তত ঢেলে রেখে যেত যদি!

সুশীল বলে, বেশি দূর যেতে পারেনি কাকা। ছুটে দেখে আসব?

রাজেন তাড়া দিয়ে ওঠেন: না, যেতে হবে না কোথাও। ঘরে গিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়্।

রাজেন ঘোষ চিরকাল বলে গেছেন, সুশীল ছিল ওই মাংস-চুরির মধ্যে। নিশ্চয় ছিল। তাঁর কথা মান্য করে সে শুয়ে পড়ে নি, পটলার বাড়ি নিমন্ত্রণ রাখতে চলে গেল। জোয়ান-যুবা ছেলে, খালি পেটে টনটনে হয়ে থাকতে পারবে কেন? বিশেষত লুচি-ছক্কার অমন নেমন্তন্নটা মজুত যখন। রাজেনের বড় ইচ্ছে হচ্ছিল, পটলার বাড়ি হঠাৎ গিয়ে পড়ে দেখে আসেন যে লুচির সঙ্গে নিরামিষ ছক্কাই শুধু পড়েছে, না অন্য কিছু? কড়াই-ভরা রামপক্ষীর মাংস? সাপের ও ভূতের ভয়েই কেবল পেরে উঠলেন না।

অনেক কাল পরে জয়নাল গাজি পটলাদের এঁদো-পুকুর থেকে মাটি তুলতে তুলতে কড়াই পেয়ে গেল একখানা। কটকটে কালো হয়ে আছে, ঘষেমেজে চকচকে হল। পিতলের কড়াই—রাজেন ঘোষের সেই বস্তু, সন্দেহ নেই। কিন্তু কোথায় সেই সব মানুষ! রাজেন ঘোষ মারা গেছেন। ছেলেপুলেরা হিন্দুস্থানে উঠে গেছে।

॥ ঊনত্রিশ ॥

আমাদের পাশের গাঁয়ের হাই-ইস্কুল—রাজেন ঘোষ যেখানে মাস্টার ছিলেন। আমি কিছুদিন ওই ইস্কুলের ছাত্র ছিলাম। জীবনের প্রথম মাস্টারিও ওখানে। মাত্র একদিনের জন্য। কিন্তু প্রবীণেরা ক্ষণ-অক্ষণের কথা বলে থাকেন—সেই যে একটা দিন মাস্টার হয়ে এলাম, তারপরে কুড়ি-কুড়িটা বছব কাটাতে হল মাস্টাবের চেয়াবে নিয়মিত বসে। শহরের উপব এক নাম-করা ছাত্র-পড়ানোর কারখানায়। সমস্ত যৌবন আমার পুড়েজ্বলে গেল। তার কথাও উপন্যাস করে লিখেছি।

যাক গে, গোড়ার কথায় আসি। অজ পাড়াগাঁয়ের ইস্কুল—হেডমাস্টার একজন অবশ্য আছেন, ভুবনমোহন বসু। থাকেন তিনি কলকাতায়, হেণ্ডারসন কোম্পানির জুট-ডিপার্টমেণ্টের বড়বাবু। দশটার সময় কলকাতার অফিসে এবং সাড়ে-দশটায় একশ মাইল দূরবর্তী স্বগ্রামের ইস্কুলে একই সঙ্গে বরাবর হাজিরা দিয়ে আসছেন। লাটুবাবু খাতাপত্র লেখেন, তাঁর কাজে খুঁত নেই—তাঁরই কারুকর্ম এ সমস্ত। উপায় কি বলুন? কম পক্ষে বি. এ. পাশ তো চাই হেডমাস্টারির জন্য। কোন্ হতভাগা বি. এ. এই ধাপধাড়া জায়গায় পড়ে থাকবে একরকম বিনি-মাইনেয়? কিন্তু লাটুবাবুর খাতায় দেখতে পাবেন

গ্রাজুয়েট অমন একগণ্ডা কাজ করছেন। অগুন্তি ছেলে, মাইনেপত্র নিয়মমাফিক আদায় হয়, মাস্টাররা মাঝারি গোছের মাইনে পেয়ে আসছেন মাসের ঠিক পয়লা তারিখে।

খাতা দেখে মন প্রসন্ন হবে আপনার। আসলে ফক্কা। হাজিরা-বইয়ে যত ছেলের নাম, তার সিকি পরিমাণও নেই। এই গাঁয়ে এবং আশপাশের গাঁয়ে যত ছেলে আছে, বয়স বিবেচনা করে লাটুবাবু এ-ক্লাসে ও-ক্লাসে নাম লিখে রেখেছেন। কল্পনার নামও অনেক আছে, যে নামের কোন ছেলে কস্মিন কালে জন্মে নি। রাজেন ঘোষ তাই বলেন, লাটুবাবু, হিসেব না লিখে হুঁ-হুঁ-উ গল্পটল্প লিখলে আপনি মশায় নাম করতে পারতেন। খুব কিন্তু মাথায় আসে আপনার।

তবে মাস্টারের মধ্যে একজনও পুরোপুরি কল্পনার নন। জরুরি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সমস্ত মাস্টার ইস্কুলে হাজির করানো সম্ভব হতে পারে। গাঁয়ের কেউ ধরুন বি. এ, বি. এল. হয়ে সদরে ওকালতি করছেন। মাস্টার রূপে তাঁর নাম চলে আসছে লাটুবাবুর খাতায়। অবরে-সবরে বাড়িতে এলে মাইনের খাতা আর হাজিরা-খাতা লাটুবাবু সামনে নিয়ে ধরেন: সই করে দিন স্যার কতকগুলো। ক'মিনিটের ভিতরে অকাট্য প্রমাণ হয়ে রইল, উক্ত উকিল ব্যক্তিটি মাস্টার রূপে প্রত্যহ ইস্কুলে হাজিরা দিচ্ছেন, এবং প্রতিমাসের পয়লা মাইনে পেয়ে আসছেন।

ভুবনমোহন এম. এ. পাশ বলে সব মাস্টারের চূড়া হেডমাস্টার হয়ে আছেন। তাঁর ব্যাপারেও মোটামুটি এক ব্যবস্থা। তবে মাস দুয়েক অন্তর একবার করে এসে নানা খাতায় সইটা তাঁকে কিছু অধিক পরিমাণে করে যেতে হয়।

অ্যাসিস্টাণ্ট-হেডমাস্টারটি খাঁটি। কাজ চালানোর মতন একজন কাউকে চাই—ইনি সেই ব্যক্তি। এইটিকে জোটাতে বড় ধকল হয় গ্রামবাসীর। নতুন পাশ করে কোন ছোকরা চাকরি খোঁজাখুঁজি করছে, তখনই হয়তো গ্রামের কারো খপ্পরে পড়ে গেল: চাকরি

দেবো চলুন। শুনতেই গাঁ-গ্রাম—গ্রাম নয় সে, ইন্দ্রপুরী। মস্তবড় ইস্কুল—সেই ইস্কুলের সর্বময় কর্তা হয়ে যাচ্ছেন। সোনার চাকরি, গিয়ে দেখতে পাবেন।

এ হেন চাকরি পেয়ে স্ফূর্তিতে ডগমগ হয়ে ছোকরা গাঁয়ে এলো। এসে পড়ে সর্ষেফুল দেখে চোখে। পালাই পালাই ডাক ছাড়ে। দু-মাস ছ-মাসের বেশি কিছুতে রাখা যায় না। তখন আবার কাকে পাওয়া যায় দেখ।

আমি ছাত্র ওই ইস্কুলের, কোন ব্যাপারটা আমার অজানা? দুনিয়ার নিয়মকানুন বদলাচ্ছে। আমাদের তল্লাট বহু দূরবর্তী দুনিয়া থেকে। পথের ধকলে পুরো মানুষটাই আধখানা হয়ে পৌঁছয়, তা নিয়মকানুন পৌঁছবে!

ইনস্পেক্টর আসছেন—সাড়া পড়ে যায় অমনি ইস্কুলে। শুধু ইস্কুল বলে নয়, সারাগ্রামের মর্যাদা জড়ানো এর সঙ্গে। ইস্কুলের ঘরদুয়ার সাফসাফাই করা, উঠান ও পাশের জঙ্গল কাটা—সমারোহ ব্যাপার। পথ-চলতি লোকটার অবধি নজরে এসে যায়, ইস্কুলের রজনী বেয়ারাকে প্রশ্ন করে: কি গো, ইনস্পেক্টর আসছে বুঝি তোমাদের?

লাটুবাবুর ওদিকে আহার-নিদ্রা বন্ধ হবার জোগাড়। খাতা হালফিল অবধি লিখে ফেলা। দরকার মতো নতুন খাতা বানানো, এবং গাঁয়ের ছেলেপুলে ডেকে যথাযোগ্য ক্লাসে বসিয়ে রিহার্শাল দেওয়া। অনেক কাজ লাটুবাবুর। ইনস্পেক্টর পাকা প্রবীণ মানুষ—মোটামুটি বোঝেন সবই। গাঁয়ের কেউ কেউ কাজে-কর্মে সদরে থাকে, ভাবসাব তাদের সঙ্গে। ইনস্পেক্টর খবর দিয়ে দেন: যাচ্ছি অমুক তারিখে আপনাদের ইস্কুলে।

যথেষ্ট সময় থাকতে বলেন, অর্থাৎ যা-কিছু করণীয় সেরে ফেল এর মধ্যে। তার ফলে গ্রামের উপকার, তাঁকেও গিয়ে ঝামেলার মধ্যে পড়তে হল না। খবর পেয়ে গাঁয়ের মধ্যে সোরগোল পড়ে। চাঁদা তুলছে। পোলাও পাঁঠা-পিঠে চন্দ্রপুলি—খাওয়ার উপর খাওয়া।

একনাগাড় এমনি চলল যে এই সমস্ত চুকিয়ে ইস্কুল পরিদর্শন দশ-পনের মিনিটের বেশি ঘটে ওঠে না। কখনো বা এমন হয়েছে, ইনস্পেক্টর কষ্ট করে ইস্কুলবাড়ি অবধি গেলেন না, খাওয়া-দাওয়ার পর শয্যায় গড়িয়ে লাটুবাবুকে বলে দিলেন, গিয়ে কি হবে মশায়, আপনারা কি মিছে কথা বলছেন! ঝামেলা বাড়াবেন না, ভিজিট-বুকটা নিয়ে আসুন, এইখান থেকে সেরে দিয়ে যাই। ওদিকে ইনস্পেক্টরবাবুর জন্য কইমাছ ক্যানেস্তারায় ভরা হচ্ছে, খেজুরগুড়ের নাগরির তলায় পোয়ালের বিড়ে বাঁধা হচ্ছে বাসের ঝাঁকুনিতে গুড়ের নাগরি যাতে ভেঙে না যায়। ইনস্পেক্টর আড়নজরে তাকিয়ে দেখেন, আর ভিজিট-বুকে মন্তব্য লেখেন: ইস্কুল পরিদর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলাম। সর্ববিষয়ে ইহার উন্নতি লক্ষিত হইতেছে।

আমি নিচের ক্লাসে পড়ি, সেই সময় সুদেব বলে এক বিদেশি ছেলে ফার্স্ট ক্লাসে ভর্তি হল। ছেলে বলা ঠিক হল না। ইহা দশাসই জোয়ান—গালপাট্টা ও বাবরিচুল। এই গাঁয়ে বোনের বিয়ে হয়েছে। সেই সম্পর্কে আসা-যাওয়ায় সকলের সঙ্গে পরিচয়। বিহারের কোনখানে চাকরি পেয়ে ভগ্নিপতিরা সবসুদ্ধ চলে গেছেন। খালি বাড়ি।

ফার্স্ট ক্লাসে দু-চারটের বেশি ছেলে থাকে না। বেশির ভাগ মাঝ-পথেই ইস্তফা দেয়, আর নয়তো চলে যায় শহরের ভাল ইস্কুলে। গাঁয়ের লোকে গিয়ে সুদেবকে ধরে পড়ল: ভগ্নিপতি গেছে তো কি হয়েছে, আমরা সকলে আছি। তুমি চলে এসো। দু-দুবার দেখলে তো পরীক্ষা দিয়ে—এবারে আমাদের ইস্কুল থেকে দাও। খাওয়া-পরা বই-মাইনে বাবদ এক পয়সা লাগবে না। হেডমাস্টার নিজে প্রাইভেট পড়াবেন। ড্যাং-ড্যাং করে পাশ হয়ে যাবে—ফার্স্ট-ডিভিশনে পাশ করবে, তুমি যে দরের ছেলে। দৌলতপুর কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যালের মেয়ে হল আমাদের গাঁয়ের বউ। কলেজেও যাতে সুবিধে হয়, সে ব্যবস্থা করে দেবো।

এ হেন দরাজ প্রস্তাবে সুদেব ভর্তি হয়ে পড়ল। প্রথম ঘণ্টায়

রাজেন ঘোষ ক্লাসে গেছেন। স্পষ্টবক্তা মানুষ। কথার সঙ্গে হুঁ-হুঁ-উ জুড়ে দেওয়া তাঁর মুদ্রাদোষ। সবিস্ময়ে ক্ষণকাল সুদেবের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, হুঁ-হুঁ-উ, তুমি কে বট হে? মরতে এলে কি জন্যে এখানে?

সুদেব সুখ-সুবিধার আদ্যোপান্ত ফিরিস্তি দিয়ে বলল, এসবের উপরেও হেডমাস্টার প্রাইভেট পড়াবেন রোজ সকালে।

রাজেন ঘোষ চোখ পিট-পিট করে বলেন, ও, পড়াবেন বুঝি! তবে তো হুঁ-হুঁ-উ কলকাতায় যেতে হবে সকালবেলা উঠে। একশ মাইল পথ। হেডমাস্টার হলেন হেণ্ডারসন কোম্পানির বড়বাবু, কোন কায়দায় তাঁর কাছে পড়তে যাবে হুঁ-হুঁ-উ তার কিছু ভেবেছ?

সুদেব ঘাবড়ে গেল কথাবার্তার ধরনে। আবার দেখা গেল, ক্লাসে আজকে একজন এলেন, কাল ভিন্ন একজন। এসে গল্পগুজব করে চলে যান। আবার হয়তো মোটেই কেউ এলেন না সমস্ত পিরিয়ডের মধ্যে।

ছেলেরা বলে, আগেভাগে টের পেলে সময়টা বৃথা কাটে না। দাবা-বড়ে আমরাও আনতে পারি, ক্লাসে বসে এক-হাত দু-হাত হয়ে যায়। সে তো বলে দেবে না কিছু!

সুদেব বলে, রুটিন নেই?

মাস্টারই নেই তো রুটিন দিয়ে কি হবে? জানুয়ারিতে একটা তৈরি করে। দেখ গিয়ে, লাটুবাবুর কাছে থাকতে পারে।

সুদেব রীতিমতো গরম হয়ে লাটুবাবুর কাছে গিয়ে পড়ে: পাঁচ-হাত ছাতির বাঁট দেখিয়ে তো নিয়ে এলেন। ফ্রী বইপত্তোর, হেডমাস্টার প্রাইভেট পড়াবেন।

লাটুবাবু বললেন, কলকাতায় অর্ডার চলে গেছে, ভি. পি. হয়ে আসছে বই। আর হেডমাস্টার এসে গেলে নিশ্চয় তিনি পড়াবেন।

হেডমাস্টার যদি আরও দু-বছর পরে আসেন—

তখনই পড়াবেন। কথার বেঠিক হবে না।

সুদেব বলে, দু-বছর কি পড়ে থাকব আমি ?

লাটুবাবু বলেন, কেন থাকবে না ? রাজেন মাস্টারমশায় তো বললেন, অনেক বছর থাকতে হবে তোমায়। আমরাও তাই চাই। ঝট করে পাশ করে বেরোলে তো হয়ে গেল। ফেল হয়ে ফিরে ফিরে আসছ, জেনে রইলাম একটা ছাত্র পাকাপাকি রইল তবু ফার্স্ট ক্লাসে।

তারপর আরও কিছুকাল কেটেছে। ইনস্পেক্টর আসার খবর হল একবার। টেলিগ্রাম পেয়ে ভুবনমোহন এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে কলকাতা থেকে সশরীরে এসে পড়লেন। সমস্তটা দিন লাটুবাবুর সঙ্গে বসে নানা খাতায় সই করলেন। নানান বিষয়ে ওয়াকিবহাল হলেন।

সুদেব ক্ষেপে আছে ঃ ফাঁকিজুকি ধরিয়ে দেব আমি। আসুক ইনস্পেক্টর, সমস্ত বলব। জেবা করুক হেডমাস্টারকে, একশ মাইলের ফারাকে একই সঙ্গে কলকাতার চাকরি আর গাঁয়ের হেডমাস্টারি করা যায় কেমন ক'রে ?

লাটুবাবুর কানে উঠল সুদেবের তড়পানি। তিনি সেক্রেটারিকে বললেন। সেক্রেটারি হন্তদন্ত হয়ে এলেন ঃ এ সমস্ত কী কথা সুদেব, ইস্কুলের দফা শেষ করতে চাও ?

ফাঁকি-কথা বলে আপনারা আমায় এনেছেন। বারোমাসের মধ্যে হেডমাস্টারের একটা টিকি দেখা গেল না। সর্বনাশ করলেন আমার। এ বছরটাও যাবে।

সেক্রেটারি খিঁচিয়ে উঠলেন ঃ ওঃ, জজ-ম্যাজিস্ট্রেট ক'রত কিনা হেডমাস্টার থেকে ! আরও তো দুবার পরীক্ষা দিয়েছ, হেডমাস্টারও ছিল সেখানে—তবে হল না কেন ? খবরদার ! কোন-রকম পাগলামি করতে যেও না ইনস্পেক্টরের সঙ্গে।

পাগলামি কেন, সত্যি কথা বলব।

সেক্রেটারি বলেন, বললে কচু হবে। এ-কিছু নতুন ব্যাপার নয়। ইস্কুলের পত্তন থেকে চলছে। আর ভিজিটবুকে কী সব লিখে যাচ্ছে, পড়ে দেখগে যাও।

সুদেব বলে, তা হলে গোড়া ধরে ঝাঁকি দেব। ডি. পি আই-কে লিখব। সহজে ছাড়ছিনে আমি।

সেক্রেটারি আগুন হয়ে বলেন, দেখছ লাটু, ক্ষেপে গেছে একেবারে। বদ্ধ পাগল। পাগল সামলানোর যা ব্যবস্থা, তাই করতে হবে। সতীশবাবুর চিলেকোঠায় ধরাধরি করে তুলে তালাচাবি দিয়ে দাও। কিনা টাইফয়েড হয়েছে। তাই বলবে সকলকে। ইনস্পেক্টর চলে গেলে তবে তালা খুলবে।

মুখের হুকুম মুখে থাকতেই যে তালিম করে বসে। মালকোঁচা সেঁটে জন আষ্টেক ধেয়ে এলো। তার মধ্যে সুদেবের ক্লাসের বন্ধুরাও রয়েছে। নিজে সে কম যায় না—কিন্তু একটি প্রাণী কতক্ষণ লড়তে পারে এতজনের সঙ্গে! ন পিতা ন মাতা ন বন্ধু ন ভ্রাতা। দিদির সুবাদে এখানে আসা, তাঁরাও দেশেঘরে নেই।

অসহায়েব চেহারা ফুটেছে মুখের উপর, সেক্রেটারি তখন করুণা করলেন: ওহে, আজকে থাক। রাতটুকু চরতে ফিরতে দাও। সকালবেলা ইনস্পেক্টর এসে পড়বার আগেই ঢুকিয়ে দিও। এত আগে থেকে দরকার নেই।

সকালে উঠে আর সুদেবকে পাওয়া গেল না। গ্রাম ছেড়ে সরে পড়েছে। খেয়ানৌকোয় খাল পার হতে হয়। নিশিরাত্রে খেয়া মিলল না তো সাঁতার দিয়ে খাল পাড়ি দিয়েছে।

এমনিধারা আমাদের ইস্কুল। রাজেন ঘোষের ছাত্র আমিও। একদিন আমাদের বাড়ি এসে বললেন, একটা কথা শোন তো—হুঁ-হুঁ-উ মাইনে দিয়েছ তুমি?

ঘাড় নাড়ি। পাড়াগাঁয়ের ইস্কুলে ক'টা ছেলে বা মাইনে দেয় পরীক্ষার মুখে ছাড়া!

রাজেন ঘোষ বলেন, দাও নি কেন? দেওয়া তো উচিত। হুঁ-হুঁ-উ মাইনে না দিলে ইস্কুল চলে কি করে?

হাফ-ফ্রী'র জন্য দরখাস্ত করা হয়েছে। করবে কি না করবে সেই জন্যে চেপে রয়েছি।

মীটিং হয়ে গেছে, কিচ্ছু খবর রাখ না তুমি। ফ্রী হাফ-ফ্রী যা করবার হুঁ-হুঁ-উ করে ফেলেছে এ-বছরের মতো।

আমার কিছু করেনি। পুরো মাইনে লাগবে, লাটুবাবু বলে দিলেন।

রাজেন ঘোষ বলেন, লাগবে তো দিয়ে দাও—

বাড়ি থেকে দেবে না। বলছে, বছরের অর্ধেক ছুটি, বাকি অর্ধেক দিন মাস্টার থাকে না। অর্ধেক মাইনে—সেই তো অনেক বেশি।

রাজেন ঘোষ ভাবলেন একটু। বললেন, হুঁ-হুঁ-উ অর্ধেক মাইনেই দাও তুমি। আমার কাছে দাও। পুরো মাইনের রশিদ পাবে। কবে দিচ্ছ তা হলে—আজ?

লাটুবাবুর কানে গেছে। ক্লাস থেকে আমায় ডেকে পাঠালেন: এইও, মাইনে আমার কাছে দেবার কথা। রাজেনবাবুকে দিস কেন তুই?

উনি বাড়ি গিয়ে নিয়ে এলেন।

ও মাইনে মঞ্জুর হবে না।

টাকা বাজিয়ে নিয়ে রশিদ দিয়ে এলেন, নামঞ্জুর বললেই হল!

রাজেন ঘোষ ক্ষিপ্ত হয়ে এসে পড়লেন: নামঞ্জুর মানে? সমস্ত জমা দিয়েছি ইস্কুলে। অর্ধেক পেয়ে পুরোপুরি লিখিয়ে দিয়ে আমার মাইনের খাতে উশুল করে নিয়েছি। টাকা চুরি করেছি নাকি?

সেকেণ্ড-পণ্ডিত সেইদিন আমায় ছুটির পরে ধরলেন: আসছে-মাসের মাইনেটা আমার হাতে দিবি, বুঝলি?

রাজেনবাবু বলে রেখেছেন যে!

শুধু এক মাথায় তেল ঢালবি কেন রে? চারিয়ে দিতে হয়। আমারও ওই রেট। যাকগে যাক, আমায় না হয় আরও চার আনা কম দিস। তু-বছরে সাকুল্যে কুড়িটি টাকাও দেয় নি আমায় লাটু।

এর পরে শুনি, প্রায় সব মাস্টারই এই পথে নেমেছেন। বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন। ছেলে ও ছেলের গার্জেন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে মাইনের তাগিদে। রেটও হু-হু করে নেমে তেভাগায় এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ তিন ভাগের এক ভাগ দিয়ে পুরো অঙ্কের রশিদ।

আমি যখন ছাত্র, এ সব সেই আমলেব কথা। তারপর বিস্তর দিন কেটে গেছে, লায়েক আমি এখন। বি. এ. এগজামিন দিয়ে বাড়ি এসেছি। কাজকর্ম নেই। কচি-আম গাছে, পাকবার দেরি আছে। দলবল জুটিয়ে নুন আর ঝিনুক নিয়ে গাছের এ-ডাল ও-ডাল করি। ধন্য-ধন্য পড়েছে আমার নামে। মুরুব্বিরা আমায় দেখিয়ে অন্য ছেলেদের বলেন, পাশ কবতে করতে বিদ্যের মুড়ো অবধি পৌঁছে গেল, সাদাসিধে কী রকম তবু! গাছে চড়ে, সাঁতার কাটে, গড় হয়ে পায়ের ধূলো নেয়—আগেব স্বভাব একটুও বদলায় নি।

এক সকালে রাজেন ঘোষ ডেকে পাঠালেন। শিক্ষক বলে বড় মান্য করি তাঁকে।

ওই অত সকালেই দাবাখেলা আবম্ভ হয়ে গেছে। বললেন, শোন, হুঁ-হুঁ-উ শরীরটা ভাল লাগছে না—

প্রতিপক্ষ সীতেশ্বর উদ্বিগ্ন হয়ে বলেন, শরীরের আবার কি হল?

মাথা টনটন করছে বড্ড। কিন্তু মাথা ছিড়ে পড়ে গেলেও হুঁ-হুঁ-উ আজ তোমার অব্যাহতি নেই। মাত শুধু নয়, গজঘুর করিয়ে ছাড়ব। ভাবছ কি হাঁ কবে, চাল দাও। উঁহু—দাবা ওঠে না, কিস্তির মুখ। নৌকো পেয়ে গেছ, নৌকো নিয়ে এবারে দাবা দিয়ে দাও।

সীতেশ্বর গুটির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে হতাশভাবে বলেন, যাকগে যাক। এ বাজি গেল, দেখা যাবে পরের বাজিতে।

পরের বাজিতে দেখো, তারও পবে দেখো। সমস্ত দিন পড়ে রইল—হুঁ-হুঁ-উ ওবেলা দেখো, রাত্তিরে দেখো।

সীতেশ্বর চাল ভাবছেন, রাজেন ঘোষ ইত্যবসরে ঘাড় তুলে আমায় বলেন, শরীর বেজুত লাগছে। গ্রীষ্মের ছুটি এসে পড়ল, ছুটির আগে হুঁ-হুঁ-উ পুরোমাসের মাইনে দেবে বলছে। এ সময়টা কামাই করা ঠিক নয়। আজকের দিনটা ইস্কুলে যাব না, হুঁ-হুঁ উ আমার হয়ে তুমি পড়িয়ে এসোগে।

রাত্রে খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে। খানাখন্দ জলে ভরতি, পথেঘাটে কাদা। ঘাস আর বনকচুর পাতার উপর ছিনেজোঁক নুলো বাড়াচ্ছে মানুষের গায়ে লাগবে বলে। আকাশে প্রচুর মেঘের আনাগোনা— আজকেও, মনে হচ্ছে, দুপুরের পর থেকে জল ঢালবে। কাল-বৈশাখীর সময়—শুধুমাত্র বৃষ্টি নয়, বৃষ্টির আগে ঝড়বাতাস হয়ে যায় একচোট। ডালপালা ভাঙে, গাছগাছালি উপড়ে পড়ে, ঘরের চালও পড়ে যায় কখনোসখনো। এমন অবস্থায় পথে না বেরিয়ে ঘরের মধ্যে বসে বসে দাবাখেলা ভাল। রাজেন ঘোষের শরীরকে অতএব দোষ দেওয়া চলে না।

রাজেন বলছেন, ছাত্র আর পুত্র মানুষ হয়ে গেলে হুঁ-হুঁ-উ মজা বেধে যায়। পায়ের উপর পা চাপিয়ে স্রেফ তখন আরাম করো। কালি-কলম নিয়ে এসো দিকি, লাটুবাবুকে চিঠি দিই। জিজ্ঞাসা করলে বলবে, শুয়ে আছেন, জ্বরও একটু পাওয়া যাচ্ছে নাড়িতে। বন্ধের মুখ, অকারণে কামাই করা এখন ঠিক হবে না।

এত করে বোঝানোর দরকার ছিল না। আমি তো এক-পায়ে খাড়া। মাস্টারের চেয়ার না সম্রাটের সিংহাসন। জলকাদার কথা কি বলেন -শামুকভাঙা কেউটে এমন কি রয়ালবেঙ্গল-টাইগারও যদি পথের উপরে ওত পেতে থাকে, তবু চলে যাব। যতদিন ইস্কুলে ছিলাম, ছোঁক-ছোঁক করে তাকিয়েছি মাস্টারের চেয়ারের দিকে। অমোঘ ক্ষমতা চেয়ারের। যে ছেলের উপর যত রাগ, এখানে বসে স্বচ্ছন্দে তার শোধ তুলে নেওয়া যায়। পড়া ধরুন, কিংবা লিখতে দিন। দু-চারটে ভুল কি আর হবে না? নতুন-পড়ায় কায়দা

করা গেল না তো পুরনো-পড়া। লেখার ভিতরে বানান ভুল না পেলেন, লাইনটাও কি আর একটু বেঁকে নেই? পাওয়া যাবে যা-হোক কিছু -তার পরে চলল মজা। বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে দিন, কান টেনে নেতি ছিঁড়ে ফেলুন, পিটিয়ে চামড়া তুলে নিন পিঠের। যেমন আপনার অভিরুচি, কারো কিছু বলবার নেই।

ঘণ্টা বেজে এক মাস্টার বেরিয়ে চলে গেলেন, অন্য মাস্টার আসবেন। বেরিয়ে যাওয়ায় বিদ্যুতের গতি। আর, আসছেন—গজেন্দ্রগমন কোথায় লাগে তার কাছে! ক্লাসঘরের বারাণ্ডায় এসে পড়েছেন, সেখানেও দাঁড়িয়ে পড়ে এ-মাস্টারে ও-মাস্টারে গল্পগুজব। ঢুকতে আর ইচ্ছে করে না। আমাদের এই ফাঁক—মাস্টারেব চেয়ারে টুক করে বসে নিয়ে শখ মেটাই। একদিন তাই হয়েছে—নীলকমল-মাস্টারের পিরিয়ড, অতএব নির্ভয়ে চেয়ারে গিয়ে বসেছি। একটা ঘণ্টা শেষ হলে নীলকমল-মাস্টার লাইব্রেরিতে গিয়ে দপ্তরিকে তামাক সাজতে হুকুম দেন, ছিলিমটা শেষ করে তবে ওঠেন। ততক্ষণ মাস্টার হয়ে চেয়ারে বসতে বাধা নেই।

কিন্তু বিপদ এলো অন্যদিক দিয়ে। অ্যাসিস্টাণ্ট-হেডমাস্টার নতুন এসেছেন। রগচটা মানুষ - তারও চেয়ে ভয়ানক, অবিরত ইংরেজি বলেন। তিনি ঢুকে পড়লেন, চেয়ারেব উপর তখনও আমি গদিয়ান, সামলাবার সময় পাই নি। ক্লাসসুদ্ধ সকলের মুখ চুন—কী কাণ্ড না-জানি ঘটে এবারে! আর কিছু নয়, গোটা চারেক ইংরেজি শব্দ বললেন তিনি, দুটো তাব মধ্যে অতিশয় কড়া। বলে যেমন এসেছিলেন, গটমট করে বেরিয়ে গেলেন তেমনি। কিন্তু অর্থ কি ওই কথাগুলোর? এ-ওর মুখে তাকাই। কেউ বলল, মোটা রকম ফাইন করবে, নোটিশ এসে যাবে এখনি। কেউ বা বলে, ছুটির পরে মাঠে দাঁড় করিয়ে সকলের সামনে বেত মারবে।

চারটে তো কথা --ক্লাসের অতগুলো ছেলের মধ্যে এর একটা ওর বা দুটো মনে রয়ে গেছে। টিফিন-পিরিয়ডে ভয়ে ভয়ে রাজেন ঘোষের

শরণাপন্ন হলাম : মানেটা মোটের উপর কি দাঁড়াল? রাজেন ঘোষ বলেন, ফার্স্ট ডিজার্ভ দেন ডিজায়ার—আগে যোগ্য হও, তার পরে বাঞ্ছা কোরো।

এই মাত্র? ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল রে বাবা! কী ধুকপুকানিটা গেল ওই একগণ্ডা কথা শোনার পর থেকে।

প্রথম সেই আমার মাস্টারের চেয়ারে বসা।

চেয়ারের সৌভাগ্য পুনশ্চ পায়ে-হেঁটে হাজির আজ। কিন্তু একদিনের মাস্টারির জন্য সকালবেলা সাত-তাড়াতাড়ি কে আমায় ভাত রেঁধে দেবে? পান্তাভাত আছে কাল রাত্রের—লেবু আর নারকেল সহযোগে সেই ভাত খেয়ে স্ফূর্তিতে বেরিয়ে পড়া গেল। তিন মাইল পথ, জায়গায় জায়গায় জলকাদা তা যেন উড়ে গিয়ে পৌঁছলাম ইস্কুলে।

লাটুবাবু আছেন, রাজেন ঘোষের চিঠি নিবেদন করলাম তাঁর সকাশে। ইস্কুলে স্থিতিবান একমাত্র লাটুবাবু, অন্য সবাই পদ্মপত্রে নীরবৎ কখনো আছেন কখনো নেই। যদিও হেডমাস্টার নন, চিঠিপত্র লোকে তাঁরই কাছে পাঠায়। অ্যাসিস্টান্ট-হেডমাস্টারের কাছে লাটুবাবু আমার পরিচয় দিচ্ছেন: আমাদের ছাত্র, পাঁচ-ছ বছর পড়েছে। শেষ মুখটায় ঘাবড়ে গিয়ে কলকাতার ইস্কুলে চলে গেল।

অ্যাসিস্টান্ট-হেডমাস্টার প্রশ্ন করেন, বি. এ. দিয়ে এসে?

লাটুবাবু তাড়াতাড়ি বলেন, ভাল ছেলে, পাশ করে যাবে। পাশেরই শামিল—ধরে নিতে পারেন গ্রাজুয়েট বলে।

তবে আর কি! চলে যাও সেকেণ্ড ক্লাসে। অঙ্ক—অসুবিধা হবে না তো?

শহরে থাকি, তায় প্রায়-গ্রাজুয়েট—পাড়াগাঁয়ের ছোঁড়াগুলোকে গণনার মধ্যে আনি নাকি? গটমট করে বীরোচিত ভঙ্গিতে ঢুকে পড়লাম সেকেণ্ড ক্লাসে। চেয়ারে গ্যাঁট হয়ে বসে এদিক-ওদিক তাকাই।

তাকিয়ে দেখে ধড়াস-ধড়াস করে বুকের মধ্যে। সত্যসখা এই

ক্লাসে। এত বছরের চেষ্টায় এখনো ইস্কুলের গণ্ডি ছাড়াতে পারে নি। কত খেলাধুলো করেছি তার সঙ্গে। খেলায় তাকে এঁটে ওঠা যেত না, মেরে ভূত ভাগিয়ে দিত। সেই ছেলে এখন তো ইয়া দশাসই জোয়ান, মোচার আকারের একজোড়া গোঁফ ঠোঁটের উপরে। ক্লাসের অন্য সকলেও অচেনা নয়, নিচের ক্লাসে পড়ত। আমাদের পাড়াগাঁয়ের ছাত্রেরা রয়ে-সয়ে পড়াশুনো করে। বেরোলে তো হয়েই গেল। ঝটাপট সবাই যদি পাশ হয়ে যায়, ইস্কুল খালি হয়ে যাবে। তখনকার উপায়টা কি?

কিন্তু মনের অবস্থা যা-ই হোক, বাইবে সে ভাব দেখানো যায় না। মাস্টারের উপযুক্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলি, অঙ্কের পিবিয়ড এটা?

কেউ জবাব দেয় না। ফুসফুস-গুজগুজ চলছে। সত্যসখা তারপর উঠে দাঁড়াল: কি চাই আপনার?

লক্ষ্য করলাম, 'আপনি' বলছে—সে আমলের মতো তুইতোকারি নয়। বলে, একেবাবে ক্লাসের মধ্যে চলে এসেছেন, কি দবকার বলুন?

পড়াব। রাজেনবাবুব জায়গায়।

চিঠি দেখি!

চিঠি—চিঠি আবার কিসের?

লাটুবাবুর কাছ থেকে লিখিয়ে নিয়ে আসুন। নয়তো বুঝি কি করে, মাস্টার হয়ে এসেছেন।

এই নিয়ম করেছ বুঝি—চিঠি দেখিয়ে তোমাদেব হুকুম নিয়ে পড়াতে বসতে হবে? আমিও এই ইস্কুলে পড়েছি, তখন কিন্তু এই নিয়ম ছিল না। তা ওঁরা তো সোজাসুজি ক্লাসে পাঠালেন, লিখে-টিখে দিলেন না কিছু।

রাগে গরগর করতে করতে ক্লাস থেকে বেরোলাম। লাটুবাবু মুখের দিকে চেয়ে বললেন, কি হয়েছে?

সমস্ত কথা শুনে সত্যসখাকে ডেকে পাঠালেন। একা সত্যসখা নয়, ক্লাসের সব ছেলে দল হয়ে এসেছে। লাটুবাবু ছি-ছি করেন: কী

কাণ্ড করে বসলি! কলকাতায় গিয়ে এই গল্প করবে, তোদের মুখ তখন কোথায় থাকবে বল্ দিকি?

সত্যসখা লজ্জা পায় না। বলে, গোলমাল আপনিই তো ঘটালেন। রাজেনবাবু চিঠি পাঠিয়েছেন, চিঠিখানা ওঁর হাতে দিয়ে দিলেই হত।

তারপরে সেই সত্যসখা পরম বিনয়ে আমার দিকে ঘাড় নিচু করে ডাকে: চলে আসুন সার। বোঝাবুঝি হয়ে গেল, এবারে কোন হাঙ্গামা হবে না। জাল-মাস্টার অনেক পড়িয়ে যায় কি না, সেজন্য চিঠির নিয়ম হয়েছে।

পড়াবার উৎসাহ তখন উপে গিয়েছে। কিন্তু জাল-মাস্টারের ব্যাপারটা শুনে নিতে হবে। মন-মরা হয়ে ওদের পিছু পিছু আবার ক্লাসে গিয়ে বসলাম। অতি-সম্প্রতি—মাত্র দশটা দিন আগে বিষম কাণ্ড হয়ে গেছে নাকি। কেশবপুরের বিনোদ চক্কোত্তি পড়িয়ে যায় এই ক্লাসে। ফুটবলের ফাইন্যাল-খেলা এবারে ছিল কেশবপুরের সঙ্গে। এরা জিতে এলো। শুধুমাত্র গোলের জিত নয়—তিনটে প্লেয়ারের এমন ঠ্যাং ভেঙে দিয়ে এসেছে, জীবনে তাদের আর ফুটবল খেলতে হবে না। কেশবপুর ক্লাবটাও খোঁড়া ওই তিন প্লেয়ারের সঙ্গে। সেই কেশবপুরের বাসিন্দা বিনোদ চক্কোত্তি হল ভটচাজবাড়ির কুটুম্ব। শুনতে পাওয়া যায়, গোটা দুই পাশও নাকি সে করেছে। কুটুম্ববাড়ি এসেছিল বিনোদ। এবং বাইরের মানুষ গাঁয়ে এলে যেমন হয়ে থাকে, লাটু-বাবুর অম্বুবি-তামাকের লোভে ইস্কুলে এসে আড্ডা জমায়, মাস্টারের অভাব হলে ক্লাস ঠেকিয়েও আসে একটা-দুটো। বিনোদকেও ভাবা গিয়েছিল সেই রকম। সেকেণ্ড ক্লাসটা খালি যাচ্ছে দেখে একটা জিওলের ডাল ভেঙে নিয়ে বিনোদ ক্লাসে ঢুকে গেল। জাপানের রাজধানী কোথায়—জিজ্ঞাসা করেই জবাবের তিলেক সময় না দিয়ে বেদম পিটুনি সত্যসখাকে। কেশবপুরের ম্যাচ-খেলায় খেলোয়াড় হিসাবে সত্যসখা নাম করে এসেছে। সেদিন খেলার মাঠে না পেরে আলটপকা ক্লাসে ঢুকে বিনোদ সেই রাগের শোধ নিয়ে গেল।

লাটুবাবু শুনে তারপরে আকাশ থেকে পড়েন। তিনি পাঠান নি বিনোদকে, মোটে সে আপিসেই যায় নি, সরাসরি ক্লাসে ঢুকে পড়েছে। অনুসন্ধানে প্রকাশ পেল, এমন ঘটনা আগেও দু-চারটে ঘটে গেছে। দুই শরিকে মামলা চলেছে—কোর্টে সুবিধা হল না তো এ বাড়ির একজন একদিনের জন্য মাস্টার হয়ে ও-বাড়ির ছোঁড়াটাকে ঠেঙিয়ে গেল।

ভেবেচিন্তে সত্যসখারা তাই নতুন নিয়ম করেছে। মাস্টারি করবে তো লাটুবাবুর সই-করা চিঠি দেখাতে হবে ক্লাসের ছেলেদের। গোলমাল ঘটলে তিনি যাতে বেকবুল যেতে না পারেন।

॥ ত্রিশ ॥

সুঁড়িপথ এখানটা। দুপাশে বাগবাগিচার ডালপালা আকাশ ঢেকে আছে। বিষম অন্ধকার। অন্ধকার, অন্ধকার।

নিথর গাছপালা আর নিঃশব্দ এই গ্রামপথ যেন মহাযুদ্ধের ভয়াল ধ্বংসাবশেষ। তেমনি এক অনুভূতি অন্তর আচ্ছন্ন করে তোলে। আকাশে তাকিয়েছি--একঝাঁক তারা অমনি ঝিকমিক করে উঠল। ঝিকমিক করে দেখছে রাত্রির পথিক আপনাকে আর আমাকে। যেন সামান্য ক'টি প্রাণীর পৃথিবী এখন—ধ্বংস হয়ে গিয়ে বুঝি ক'জন মাত্র টিকে আছি কোন রকমে।

হুমহাম শব্দসাড়া করে চলুন, কারণে অকারণে কথা বলুন। বুকের ভার খানিকটা কমবে। তা ছাড়া, সাপ থাকতে পারে পথের উপর শুয়ে, সাড়া পেয়ে সরে যাবে। দেখুন, তেড়ে এসে সাপ কদাচিৎ কামড়ায়। * হয়তো বা পা চাপিয়ে দিলেন সাপের পিঠের উপর—রাগ হবে না হেন অবস্থায়? আপনি আমি ক্ষেপে যাই, ওরা তো বুকে হেঁটে-চলা ইতর জীব।

কিন্তু থাক এসব। শহুরে মানুষ আপনি, ভুলে গিয়েছিলাম। কোন ভয় নেই, এগিয়ে চলুন—সাপ বেরোবে না। মা-মনসা চিরকাল ধরে বিস্তর দুধ-কলা খেয়ে আসছেন—নির্বাসিত ছেলেটা একজন সাথী সঙ্গে নিয়ে রাত্রিবেলা চুপিচুপি গাঁয়ে এসেছে, তার উপরে বিরূপ হতে যাবেন কেন মা-জননী!

পশ্চিমবাড়ি। চতুর্দিকে ছড়ানো এই যত ঘর-দালান, সমস্ত মিলিয়ে পশ্চিমবাড়ি—অথবা পশ্চিম-পাড়া। বাইরের উঠানের প্রান্তে বড় জামরুলগাছ আর লিচুগাছ। এমন মিষ্টি আর বড় সাইজের লিচু তল্লাটের মধ্যে পাবেন না। সে আমলে ডাল ভেঙে পড়ত লিচু-ফলে। এখন কেমন হয় জানিনে। কিন্তু হলে কি হবে—বাদুড়ের উৎপাত। কোন অন্ধকার বাঁশবনের ভিতরে দু-পায়ে কঞ্চি আঁকড়ে মাথা নিচের দিকে ঝুলিয়ে সমস্তটা দিন নিঃসাড় হয়ে থাকে, রাত্রি হলে উৎসব লেগে যায় তাদের। লিচু-ডালে ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে পড়ে। কিচির-মিচির আওয়াজ, পাখার ঝাপটানি! ফল লাল হতে দেবে না, তার আগেই খতম। খালি বোঁটাগুলো ঝাঁটার কাঠির মতো প্রত্যাশীদের দিকে উঁচিয়ে থাকে। সেই আমলে বাচ্চা আমরা ছড়া কাটতাম:

বাদুড় বড় মিঠা—
যা খায় তা তিতা।

একই ছড়ার মধ্যে খোশামুদি: বাদুড়কে মিঠা বলা হচ্ছে। আবার শাপশাপান্ত আছে: যে লিচুফল খেতে যাচ্ছে, তা তেতো হয়ে যাবে। বাদুড় কিন্তু নিরস্ত হবার পাত্র নয়, আমাদের ছড়া-কাটা মিছে।

প্রমথদা তখন আসরে নামলেন। নগর-কীর্তনের মূল-গায়েন, পোস্টমাস্টার—একধারে সমস্ত-কিছু সেই মানুষটি। তল্লাটের সকলে তাঁর নামে তটস্থ, সামান্য বাদুড় জব্দ করবেন সে আর কতবড় কথা! ক্যানেস্তারা চার-পাঁচটা জোগাড় করে লিচুগাছের এ-ডালে-ওডালে বাঁধলেন, ক্যানেস্তারার গায়ে ঝোলানো এক এক লোহার টুকরা।

ক্যানেস্তারায় বাঁধা দড়ি চলে গেছে ঘরের ভিতর অবধি। ঘরে বসে দড়ি টানলেই গাছের এখান থেকে ওখান থেকে টিনের বাত্ত বেজে ওঠে। ভয়ে বাদুড় গাছে পড়ে না। কিন্তু মুশকিল হল, সন্ধ্যা থেকে খাওয়াদাওয়ার রাত্রি অবধি এই ব্যবস্থা চালানো যায়। রাতের পর রাত সারাক্ষণ জেগে থেকে টিন বাজানোর মানুষ কোথা ? বাদুড় হল নিশাচর—যখন বাজনা বন্ধ, তখনই এসে পড়ে খেয়ে যায়।

ভেবেচিন্তে প্রমথদা ছেঁড়া-জাল জোগাড় করলেন এর বাড়ি তার বাড়ি থেকে। জালের মালিকদের সঙ্গে ফলের বখরা। গাছের মাথা ঢেকে দিলেন জাল দিয়ে। নিশ্চিন্ত। প্রমথদা মারা গেছেন অনেকদিন আগে, গিন্নি আর বউছেলে হিন্দুস্থানে চলে গেলেন। তাঁর অংশের দালান ভেঙেচুরে ইটের স্তূপ। গিন্নি, শুনতে পাই, রান্না করেন কলকাতার কোন এক বাড়িতে। ছেলেরা বিড়ি বেঁধে একবেলা খেয়ে দিন কাটায়। সে সব অনেক কথা, শুনলে কষ্ট পাবেন। থাক এখন।

বিধুর মা বুড়ির ঘর ছিল ওই যেখানটা কাঁটাঝিটকের জঙ্গল। পশ্চিমবাড়ির শরিক তিনিও। অবস্থার বিপাকে বিধু চাকরি করতে গেলেন। সেই থেকে বিধুর মা রোজ সকালবেলা এই তেমাথায় এসে বসতেন। একখানা লাঠি সর্বদা তাঁর হাতে, লাঠিটা শুইয়ে রে'খ বসে বসে তিনি মাথা কাঁপাতেন। পোস্টাপিস তখন এ-গাঁয়ে নয়, দেড় ক্রোশ দূরের ভিন্ন গাঁয়ে। সকালবেলা পিওনঠাকুর পূর্বদিনের চিঠি বিলির জন্য আসতেন, তাঁকে ধরবার জন্য বুড়ি পথের দিকে চেয়ে বসে থাকতেন। পশ্চিম-পাড়া ঢুকতে এই বাড়ি প্রথম।

বুড়ি বলতেন, আমার বিধুর চিঠি দাও ঠাকুরমশায়।

নেই।

আর কোথায় যাবে, বিধুর মা ক্ষেপে উঠতেন : সকলের চিঁঠি আনো, আমার বিধুর চিঠি আনতে পার না ? একচোখো মড়িখেগো বামুন—

বাঃ রে, চিঠি না এলে আমি কি করব ?

চালাকি রাখো। বড়-শরিকদের তুমি খোশামোদ করে বেড়াও। প্রসন্নর চিঠি তো হরবখত আনো—সূয্যিনারাণের বেটা কিনা সে! বিধু আমার গরিব, তার চিঠি ভারী লাগে তোমার কাছে।

কী ঝগড়া! আঙুল মটকে মটকে গালি দেন বুড়ি। চেঁচামেচিতে গ্রামের মানুষ এসে পড়ে। বিধুর মাকে কে বোঝাবে! কম্পান্বিত হাতে পাশের লাঠিখানা তুলে রুখে ওঠেন এক-একবার। মেরেই বসেন বুঝি বা—ব্রাহ্মণ বলে মানবেন না। গ্রামবাসীরা পিওন-ঠাকুরের দিকে চোখ টেপে ঃ সরে পড়ুন ঠাকুরমশায়।

তারপরে পিওনঠাকুর ভুলেও আর পশ্চিমবাড়ি আসতেন না বিধুর মা বুড়ির ভয়ে। এর তার হাত দিয়ে চিঠিপত্র পাঠাতেন।

সাত শরিক নিয়ে পশ্চিমবাড়ি, তার প্রধান-পুরুষ সূর্যনারায়ণ। সদরের বাংলা-উকিল। বাংলা-উকিলদের কলেজে পাশ করতে হত না, আইনের কলেজ ছিলও না তখন। বাংলায়-ছাপা আইনের বই কিছু পাওয়া যেত। জজ সাহেবের কাছে আপনি গিয়ে উকিল হবার অভিপ্রায় নিবেদন করলেন। পাঁচ-সাত জন এমনি জুটল। এইবারে তিনি পরীক্ষা নেবেন। পরীক্ষায় খুশি হন তো সার্টিফিকেট দিয়ে দেবেন একখানা। ওই হয়ে গেল। সদরে দপ্তর সাজিয়ে উকিল হয়ে চেপে বসুন, টাকাকড়ি ও ভূসম্পত্তি করুন, দশের প্রতিপালক হয়ে নামকাম করুন অঞ্চল জুড়ে।

বুড়ো হয়ে সূর্যনারায়ণ এক সময় গ্রামে চলে এলেন। ওকালতি আর নয়—ঐহিক ব্যাপার অনেক তো হল, এবারে পরকালের চিন্তা। মেজোঠাকরুন অর্থাৎ সূর্যনারায়ণের স্ত্রী বরাবর গাঁয়েই আছেন। স্বামীর সদরের বাসায় যান নি। যাবার উপায় ছিল না। বিশাল সংসারের সকল দায়ঝক্কি ওই একটি মানুষের কাঁধে—কার উপর ফেলে যাবেন ?

সূর্যনারায়ণও এসে পড়লেন এবার। দিবারাত্রি পুজোআচ্চা জপতপ নিয়ে আছেন, সকলের মধ্যে থেকেও ভিন্ন এক জগতে বাস করেন যেন তিনি।

প্রহরখানেক রাত থাকতে একদিন বাইরের উঠানে পালকি-বেহারা এসে উপস্থিত। গোপন বন্দোবস্ত আগে থেকে—নিঃসাড়ে সূর্যনারায়ণ পোঁটলা হাতে বেরিয়ে এসে পালকিতে উঠে বসলেন। বেহারারা পালকি নিয়ে ছুটল। যাবে সেই কাটাখালি অবধি। সেখান থেকে পানসি-নৌকায়। কাশী চললেন সূর্যনারায়ণ, কাশীবাস করবেন।

ওই যে প্রমথ-দা'র কথা হল, তাঁর বাবা পরেশনাথের আমল তখন। প্রমথ নিতান্ত শিশু। পরেশনাথের গুণপনার ক্ষুদকুড়ো সামান্য কিছু পেয়েই প্রমথ-দা'র এত নাম। যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানে কি সন্ধ্যা! পরেশনাথ জৈবিক প্রয়োজনে বাইরে এসেছিলেন —দেখলেন, সাঁ করে পালকি বেরিয়ে গেল। মাথার ভিতরে চকিতে বিদ্যুৎ খেলে যায়। মাঝের-কোঠায় গিয়ে দেখেন, খোলা দরজা হাঁ-হাঁ করছে—ওই ঘরে সূর্যনারায়ণ জপতপ নিয়ে থাকতেন।

হৈ-হৈ করে উঠলেন পরেশনাথ: কর্তা পালাচ্ছেন, সংসার-বিরাগী হয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। বাড়িসুদ্ধ জেগে উঠল। পরেশনাথ বললেন, আমি আগে ছুটলাম। তোমরা সব জুটেপুটে এসো।

গায়ে অসুরের বল। তিন ক্রোশ পথ আগাগোড়া দৌড়লেন, পথে একটুও জিরোন নি। পালকি সবে নিয়ে পৌঁছেছে কাটাখালির ঘাটে, সূর্যনারায়ণ পানসিতে তখনও জুত করে বসতে পারেন নি—এমনি সময়ে ঝড়ের বেগে পরেশ গিয়ে পড়লেন। কাছি দিয়ে গাছের সঙ্গে নৌকা বাঁধা, পরেশনাথ ছুটে এসে সর্বাগ্রে কাছি এঁটে ধরেন।

রাতে রাতে বেরুনো হল, আমরা যাতে টের না পাই। পশ্চিমবাড়ির মাথা হলে তুমি—এতগুলো অপোগণ্ড তোমার মুখ চেয়ে। তাদের বিলিব্যবস্থা করে দিয়ে তবে তো যাবে?

পরেশনাথ জ্ঞাতি সম্পর্কে ভাইপো, মেজোখুড়ো বলে ডাকেন। পৈতৃক সম্পত্তির এজমালি আদায়পত্র বটে, কিন্তু হাঁড়ি আলাদা। এত সমস্ত বিচার-বিবেচনার কে ধার ধারে? কাশীবাসী হবেন তো পশ্চিম-বাড়ির প্রতিটি শরিকের ব্যবস্থা করে দিয়ে তবে নড়বেন। হ্যাঁ, গায়ের জোরে। কাছি টেনে ধরে আছেন - মাঝিমাল্লা কার কত ক্ষমতা দেখা যাক, এই কাছি খুলতে আসবে! একটা দুটো খুন হয়ে যাবে তার আগে।

বিপন্ন সূর্যনারায়ণ বলেন, ব্যবস্থা হয়েছে রে বাপু। প্রসন্নকে বলে এসেছি, সে করবে।

ভোর হবো-হবো। কাক ডাকে, বাছুর হাম্বা হাম্বা করছে কাদের গোয়ালে। পরেশনাথ সেই থেকে কাছি ধরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে। হেনকালে কলরব করতে করতে পশ্চিমবাড়ির মানুষজন এসে পড়ল। সূর্যনারায়ণের একমাত্র ছেলে প্রসন্ন—সে তো আসবেই। সমর্থ জোয়ানপুরুষ আসতে কেউ বাকি নেই একমাত্র সওয়ারবাবু আদিত্যনারায়ণ ছাড়া। ঘোড়ার তবিয়ৎ হঠাৎ খারাপ হয়েছে, এবং মাটিতে আদিত্যনারায়ণ কদাপি পা ছোঁয়ান না। মেয়েদের মধ্যে এসেছেন মেজোঠাকরুন ভবানী। বয়সে বুড়ো, থলথলে শরীর, চুল পেকে গিয়েছে, সিঁথি-ভরা দগদগে সিঁদুর। শরীরের কষ্ট মানেন নি তিনি। আট বছর বয়সে সূর্যনারায়ণের শ্বশুর গৌরীদান করেছিলেন—সেই স্বামী অন্তিম বয়সে গাঁটছড়া খুলে আলাদা সরে পড়বেন তো যথোচিত ব্যবস্থা করে যেতে হবে সকলের জন্য। এই চেপে বসলেন পানসির খোপে, কে তাঁকে নড়াতে পারে দেখা যাক।

আর পরেশনাথের ওদিকে ধনুর্ভঙ্গ-পণ: পূবের বাড়ির ওরা মস্ত ডিক্রি করেছে, পানসির কাছি ছাড়া হবে না যতক্ষণ না সেই ডিক্রি শোধের ব্যবস্থা হচ্ছে।

সূর্যনারায়ণ বললেন, সে তো মবলগ টাকা রে!

পরেশনাথ সোজাসুজি সে কথার জবাব না দিয়ে শরিকদের ইসারা

করলেন। কাছি টানবার জন্য চলে এলো অনেকে, আবার পিছনে পানসির গলুই ধরে ঠেলছে কতক। পানসি সড়সড় করে ডাঙায় উঠে গেল খানিকটা।

সূর্যনারায়ণ ছেলেকে ডেকে বললেন, ডিক্রির টাকা দিয়ে দিস রে প্রসন্ন। হতভাগারা যাত্রা পণ্ড করে দেয়।

ডিক্রি ছাড়া সালিয়ানা-খাজনাও বিস্তর বাকি। সেটাও শোধ করে দিতে বলো মেজোখুড়ো।

দিস রে প্রসন্ন। খালের দিকে চেয়ে দেখে ব্যস্ত হয়ে সূর্যনারায়ণ বলে উঠলেন, আবার কি, এক-পো ভাঁটি সরে গেল—ঠেলে দে নৌকো শিগগির।

পরেশনাথ মাথা চুলকে বলেন, ভূসম্পত্তির কি রকম বাঁটোয়ারা হবে, তার সম্বন্ধে একটা হুকুম দিয়ে যাও মেজোখুড়ো।

সূর্যনারায়ণ আগুন হয়ে বললেন, পৈতৃক যত-কিছু এজমালি রয়েছে। বাকি সব আমার স্বোপার্জিত সম্পত্তি। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পয়সা রোজগার করেছি, সেই পয়সায় খরিদ। সে জিনিষের বাঁটোয়ারা কিসের?

পরেশনাথ সমান তেজে বলেন, বংশের মধ্যে বড় হয়েছ। তোমার নাম করে বুক ফুলিয়ে বেড়াই। প্রসন্ন ছেলে বলে একলা সে পাবে, এই-বা কেমন বিচার শুনি?

মুখ বেঁকিয়ে বলে উঠলেন, কাশী যাওয়া হচ্ছে আবার—বাবা বিশ্বনাথের পায়ে! বিশ্বনাথের লাথি খেয়ে ফিরতে হবে।

সূর্যনারায়ণ মুহূর্তকাল ভাবলেন। বেরিয়ে যাবার মুখে যত সব অনাসৃষ্টি! আবার একথাও সত্যি, মনটা দরাজ হওয়া উচিত তীর্থ-গমনের মুখে। হুকুম দিয়ে দিলেন: সম্পত্তির সমান বখরা হবে রে প্রসন্ন।

অধীর হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন: এবারে ঠেলবি তো নৌকো—না কি?

জয়ধ্বনি করে সকলে পানসি স্রোতের দিকে ঠেলে দিল।

॥ একত্রিশ ॥

একমাত্র ছেলে সূর্যনারায়ণের—প্রসন্ন। কাশীযাত্রার সময় তাঁকে কত টাকা দিয়ে গেছেন, কেউ জানে না। অনেক—অনেক। এমনিই প্রসন্ন মাথা-পাগলা মানুষ—টাকা হাতে পড়ে মেজাজ বিষম চড়ে গেল।

বড়-বাড়ির বাসিন্দা, বড় বাপের ছেলে—বৃহৎ বস্তু ছাড়া প্রসন্নর পছন্দ নয়। মূলগাঁয়ের কাঁসারি-বাড়ি ফরমাস দিয়ে গাড়ু গড়ালেন—সে গাড়ু দু-হাতে বয়ে বিস্তর কষ্টে তিনি বাগানে নিয়ে যান, তিনি ছাড়া অন্য-কেউ অত কষ্ট করে ব্যবহার করে না। প্রসন্নর হুঁকো হবে—নারকেলের খোল কত বড় আকারের পাওয়া যায়, তাই দেখ। চর লাগিয়েছেন, এ-গ্রাম সে-গ্রাম তারা খোঁজখবর করছে। তার পরে হুঁকো বানিয়ে নিয়ে দিব্যি তামাক খাওয়া চলছে—তার চেয়েও বড় একটা খোল পাওয়া গেল তো আগের হুঁকো বাতিল। মামলার ব্যাপারে সদরে এসেছেন—বিশাল নটের-ডাঁটা পাওয়া গেল, এত বড় গাছ হামেশা নজরে পড়ে না। প্রসন্ন ডাঁটা কিনে ক্রোশের পর ক্রোশ ঘাড়ে করে বাড়ি এনে ফেললেন। সে জিনিস সিদ্ধ হল না, কাঠের মতন শক্ত। গোয়ালে গরুর মুখে দিলেও শুঁকে শুঁকে গরু মুখ তুলে নেয়। নটের-ডাঁটা আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিতে হল। হাটে গিয়ে লাউ কিনবেন, তারও ওই গতিক। বেগুনও তাই। হাটুরে মানুষ তাঁকে ভাল রকম চিনে ফেলেছিল: বড়বাবু, আপনার জন্যে জিনিষ এই আলাদা করে রেখেছি। বড় হলেই হল—যে বড়-জিনিস কোন খদ্দের নেবে না, প্রসন্ন তাই দুনো দামে কিনে আনেন।

গাঁয়ে-ঘরে ক-জনের কাছেই বা কাঁচা-টাকা থাকে! নোট ভাঙাতে হলে যেতে হবে অতএব প্রসন্নর কাছে। নিদারুণ গ্রীষ্মের দুপুরেও

মোজা পরে জুতো পায়ে তিনি রোয়াকের উপর মসমস করে পায়চারি করছেন।

ভাঙানি আছে?

না—না—না—

চকচকে নতুন নোট কিন্তু প্রসন্নদা।

প্রসন্ন সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ। নোটখানা দু-হাতে মেলে চোখের সামনে ধরতে হবে—আড়-চোখে প্রসন্ন তাকিয়ে দেখছেন। হঠাৎ ছুটে এসে বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে নোট কেড়ে নিলেন। নিয়ে দালানে ঢুকলেন। মুখে কথা নেই একটি। টাকা এনে একটা একটা করে গণে আপনার হাতের উপর দিলেন।

মাঝে মাঝে কেমন হয়—টাকা দিয়ে কি করবেন, প্রসন্ন ভেবে পান না। টাকা হয়ে যায় দু-চোখের বিষ। এমনি এক মেজাজে, শোনা যায়, এক বোগনো টাকা পুকুরের জলে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। প্রবাদের মতো এই কাহিনী। কত লোকে ডুব দিয়েছে টাকার লোভে। পাবে কি করে? পাড় ধ্বসে পুকুর ভরাট হয়ে যাচ্ছে। টাকা সত্যি যদি পুকুরে ফেলে থাকেন, জিনিষ মাটির তলে চাপা পড়ে আছে।

অনেক বছর পরে সেই পুকুর ঝাড়ানো হচ্ছে। প্রসন্ন তখন গত হয়েছেন। মিছরিলাল সম্পর্কে প্রসন্নর জেঠতুত ভাই। শরিকদের মধ্যে একজন—সম্পত্তি ও পুকুরের রকম তিনআনা অংশের মালিক। সমস্তটা দিন মিছরিলাল ছাতা মাথায় দিয়ে আছেন পুকুর-কাটাদের সঙ্গে। ওরা খেতে বসবে তো তিনিও এক ছুটে বাড়ি গিয়ে নাকে-মুখে চাট্টি গুঁজে আবার আসবেন। প্রসন্নর টাকার বোগনো দৈবক্রমে উঠে পড়লো বেটারা গাপ করতে না পারে।

কিন্তু রোদে পোড়াই সার, বোগনো উঠল না।

মিছরিলাল না-ই পেলেন, টাকার গল্প কিন্তু একেবারে মিথ্যা নয়। প্রমথদা পেয়েছিলেন, তাঁর স্বমুখে শুনেছি। মাটি কেটে পাড়ের

উপর ফেলেছে। কালমেঘা আমগাছ সেই পাড়ে। কালবৈশাখির সময় রাতে একচোট বৃষ্টি-বাতাস হয়ে গেছে। প্রমথদা ভোরবেলা আম কুড়াতে গেলেন। খুঁজতে খুঁজতে—আম পেলেন না, পেয়ে গেলেন টাকা একটা। বৃষ্টির জলে মাটি ধুয়ে গিয়ে টাকা বেরিয়ে পড়েছে। কোম্পানির আমলের খাঁটি রুপোর টাকা, কিন্তু কটকটে কালো। আমরুল-শাকের পাতা ঘসে ঘসে টাকা আবার চকচকে হল।

মিছরিলাল মানুষটি ভাল, কিন্তু লেখাপড়া জানেন না। শেষ বয়সে বানান করে করে নাম-সই পর্যন্ত শিখেছিলেন। স্ত্রী ঠিক উল্টো। দেখতে কুরূপা, কিন্তু সে আমলের তুলনায় দস্তুরমতো শিক্ষিতা বলতে হবে। ঝরঝর করে বাংলা লিখে যেতেন, একটি বানান ভুল নেই। অক্ষর নয়, সারবন্দি যেন মুক্তা সাজানো।

মিছরিলালের বিয়ের গল্প বলি। আমাদের ঝণ্টুর বিয়েরই রকমফের।

হাঁড়ি আলাদা মিছরিলালের বাপের আমল থেকে—তা হলেও সূর্যনারায়ণের ভাইপো তিনি। বিয়ে দিয়ে ভাইপোকে সংসারে বসানো সূর্যনারায়ণ ছাড়া আর কে করবে? কাছাকাছি কোন সম্বন্ধ টেকে না। অনেক লোক আছে, অন্যের ভাল দেখতে পারে না। বেনামি চিঠি ছাড়ে, পায়ে হেঁটে গিয়ে ভাংচি দিয়ে আসে: ইটে নেই ভিটে নেই, এমন পাত্রের হাতে না দিয়ে মেয়ে বস্তায় পুরে গাঙের জলে ভাসিয়ে দেওয়া ভাল। এই সমস্ত শুনে কন্যাপক্ষ পিছিয়ে যায়।

সূর্যনারায়ণেরও জেদ চড়ে গেল। পিছপাও হবার মানুষ তিনি নন। অনেক দূরের এক সম্বন্ধ করলেন তিনি। ভিন্ন জেলায়—তিন-চারটে গাঙ পার হয়ে সেখানে যেতে হয়। সদর থেকে বন্ধুদের মারফতে সম্বন্ধ পাকা করে ফেললেন। নিজে গিয়ে মেয়ে দেখে এলেন চুপি চুপি, গ্রামের কেউ ঘুণাক্ষরে জানল না। তারপর একদিন মেয়েওয়ালারা পাত্র দেখতে এলো। পাত্র দেখবে, পাত্রের ঘরবাড়ি দেখবে।

তাদের সঙ্গে সূর্যনারায়ণও সদর থেকে চলে এসেছেন। সর্বক্ষণ আগলে আছেন—তাঁকে আড়াল করে অন্য কেউ কথা বলার ফাঁক পায় না। হাত ঘুরিয়ে নিজের দালানকোঠা ও চণ্ডীমণ্ডপ মিছরিলালের বলে দেখিয়ে দিলেন। সন্ধ্যার পর এসে পৌঁছেছেন—এসেই পাশায় বসে গেলেন কুটুম্বদের সঙ্গে। পাশাখেলা ও খাওয়াদাওয়া সমাধা হতে আড়াই প্রহর রাত্রি।

সূর্যনারায়ণ কাছারি কামাই করতে পারবেন না, মক্কেলের জরুরি মামলা—ভোরবেলা কুটুম্বদেব নিয়ে ডোঙাঘাটা থেকে বেরিয়ে পড়লেন। এমন তাড়াহুড়োর মধ্যে কুটুম্বরা ভাল করে দুটো কথাই বলতে পারলেন না মিছরিলালেব সঙ্গে। সূর্যনারায়ণের ভাইপো যখন, বেশি খোঁজখবরেব প্রয়োজনও অবশ্য নেই। পাত্র দেখে খুশি হয়ে তাঁরা চলে গেলেন।

গ্রামের লোক পুরোপুরি জানল বরযাত্রী যাবাব জন্য বলা হল যখন সকলকে। তখন আর করবার কিছু নেই। চার পানসি বোঝাই বর-বরযাত্রীরা চলেছে। বরকর্তা রূপে সূর্যনারায়ণ নিজেও যাচ্ছেন, তীক্ষ্ণ নজর সর্বক্ষণ ববের উপর। মিছরিকে সতর্ক করে দিয়েছেন আজেবাজে কথা একটিও না বলে কন্যাপক্ষের কারো সঙ্গে। বিয়ের বন্দোবস্ত করার দরুন মিছরিলাল আজ খুড়োর প্রতি অতিশয় ভক্তিমান। ভদ্রাসন থেকে সরিয়ে দিয়ে খুড়োমশায় সেখানে চণ্ডীমণ্ডপ তুলেছেন—এই বলে পড়শিদের কাছে ইতিপূর্বে বিস্তর নাকে-কেঁদে বেড়িয়েছেন। সে সব কথা বেমালুম ভুলেছেন আজকের দিনে।

চার পানসি আগে পিছে চলেছে—ভাঁটায় যায়, জোয়ারের সময় ভাল জায়গা দেখে বাঁধে। পাড়ের উপর কোন এক গাছতলায় উনুন খোঁড়ে, রাধাঁবাড়া হয়, চালডাল তরিতরকারি বাসনকোশন সঙ্গে চলেছে। শুধু এর তার বাগান থেকে কলাপাতা কেটে এনে পাত পেতে বসে পড়া। ষাট-সত্তর জন লোকের খাওয়াদাওয়া এমনি ভাবে হচ্ছে। তিন-দিনের দিন পানসি পাত্রীপক্ষের গ্রামে পৌঁছে গেল।

বিয়েথাওয়া চুকে গেল ভালয় ভালয়। শুধু বিশ্বনিন্দুক চন্দ্র-বুড়ো উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, আহা-হা, বউমা আমাদের সাক্ষাৎ গজলক্ষ্মী! দুই গজদন্ত ফুঁড়ে বেরিয়েছে দু-পাশে—

জনান্তিকে বলেন, হবে না? মিছরির বাপ কী মামলাটা লড়েছিলেন সূর্যনারায়ণের সঙ্গে! দেওয়ানি, ফৌজদারি। নেহাত সদরের উকিল বলেই কায়দা করতে পারেন নি। তা সূর্যনারায়ণ এতদিনে খুব শোধ তুলেছে। বারোমাস তিরিশ দিন এই গজদন্ত এফোঁড় ওফোঁড় করবে মিছরিকে।

শুধুই যে বড় বড় দাঁত ওষ্ঠ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, তা নয়। মেয়ের নিকষকালো রং, চোখ ছোট ছোট—আছে কি না আছে বোঝা যায় না। কন্যাপক্ষ পাত্রের বেশি খোঁজখবর করতে যান নি—কারণটা এবারে বোঝা যাচ্ছে। এখন অবধি তাঁদের ধারণা, সূর্যনারায়ণের ঘরে মেয়ে যাচ্ছে— জিত সর্বাংশে তাঁদেরই।

বরকর্তা সূর্যনারায়ণ ঘোর সন্ত্রস্ত। পাকা-লোক—এদেশ-সেদেশের মক্কেল চরিয়ে খান, সকল দিকে খরদৃষ্টি। রাত্রে বাসরঘরেও বরের বন্ধু রূপে পাহারাদার দু'জন মোতায়েন ছিল। সূর্যনারায়ণ শিখিয়ে পড়িয়ে তাদের পাঠিয়েছিলেন। মিছরিকে এক কথা জিজ্ঞেস করলে তারাই আগ বাড়িয়ে দশ কথায় জবাব দিয়ে দেয়। এতটা বয়স অবধি ঠেলাগুঁতো খেয়ে সকলের অবহেলার মধ্যে দিন কাটিয়ে বিয়ের রাত্রে মিছরি এই দুটি অভিন্নহৃদয় বান্ধব পেয়ে গেছে, মেয়ে-মহলে বরকে নিঃসহায় ছেড়ে কিছুতেই তারা উঠল না।

রাত নির্বিঘ্নে কাটল। পরের দিন রোদ উঠে গেছে, বরযাত্রীদের ঘুমও ভেঙেছে, তবু গড়াচ্ছে সকলে। কন্যাপক্ষের লোক ইতিমধ্যে বার দুয়েক জলখাবারের তাগিদ দিয়ে গেছে। অতএব উঠতে হবে এইবারে, না উঠে আর উপায় নেই।

এমনি সময় অন্দরের দিক থেকে কান্নার রোল।

বৈঠকখানায় শুয়েছিলেন সূর্যনারায়ণ, তড়াক করে উঠে বসলেন:

মড়াকান্না যেন ভিতর দিকে? দেখে এসো তো পরেশ ব্যাপারখানা কি? আরে, আমাদের মিছরি কোন দিকে খুঁজে দেখ দিকি।

যা ভেবেছেন তাই। মিছরি ভোরবেলা বাসরঘর থেকে বেরিয়ে সমবয়সি ছোকরাদের মধ্যে এসে বসেছিল। ঘুমুচ্ছে সকলে, তারই মধ্যে একজন দু-জনকে জাগিয়ে তুলে ফিসফিস করে গত রাত্রের কথা শোনাচ্ছে। হেনকালে ইস্কুলের পড়ুয়া ছোট শালা এসে ডাকে: শুনুন বোসজা –

মিছরিলাল তাজ্জব। আপনি-আপনি করে বোসজা সম্বোধনে ডাকছে—এতখানি দাম তার সকলের কাছে! হেন অবস্থা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। গোড়ায় ভেবেছিল, ছেলেটা কিছু বলবার জন্য বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মিছরিকে নিয়ে সরাসরি হাজির করল অন্দরে মেয়েদের মধ্যে।

সকলে মিছরিকে ঘিরে বসল। কনের মামী মাসী পিসী বোন ভাজ—নানা সম্পর্কের, নানান বয়সের।

বোসো জামাই। তোমার সঙ্গে আলাপ-সালাপ করি একটু। যজ্ঞিবাড়ি একজায়গায় মিলেছি, যজ্ঞি মিটলে আবার কে কোথায় চলে যাব।

এতগুলি মেয়েলোক তার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য ব্যাকুল। মনের স্ফূর্তিতে সূর্যনারায়ণের কড়া নিষেধ ভুলে মেরে দিয়েছে।

পুলকিত হয়ে মিছরিলাল বলে, তা বেশ তো!

ক-ভাই ক-বোন ইত্যাদি প্রাথমিক পরিচয়ের পর—

সূর্যনারায়ণ তোমার খুড়ো—খুড়ো-খুড়ি যত্ন করেন তোমায়?

দরদ পেয়ে মিছরিলাল গলে গিয়েছে। বলে, যত্ন কি বলেন! ফাঁকিজুকি দিয়ে সমস্ত ওরা নিয়ে নিয়েছে। বসতবাড়ি পর্যন্ত।

শাশুড়ি এসে সামনাসামনি চেপে বসলেন। সন্দেহ প্রখর হয়েছে।

খুড়োর সঙ্গে খাও না তুমি?

আজ্ঞে না। আলাদা হাঁড়ি। নিজে রাঁধাবাড়া করে খাই। সেবারে শ্রাবণ মাসে জ্বরবিকার হয়ে অচৈতন্য। ঘরের চাল ছাইতে পারিনি—বাইরের বৃষ্টি থামল তবু ঘরেব মধ্যে জলের ধারানি। কি বলব মা-জননী, একটিবার উঁকি দিয়ে কেউ দেখল না যে মরেছি কি বেঁচে আছি।

খবর কি করে কন্যার বাপ অবধি চলে গেছে, ছুটতে ছুটতে তিনি অন্দরে এসে পড়লেন। জেরা লাগিয়েছেন ঃ সেই যে দোতলা দালান দেখে এলাম ?

সমস্ত খুড়োমশায়ের। বৃষ্টিতে ভাসিয়ে নিয়ে গেলেও দালানের ভিতর ঢুকতে দেয় না।

আর যে দুটো ধানের গোলা সদর-উঠানে ?

একটা খুড়োমশায়েব আব একটা পরেশদা'র—

আর ঘোড়া ?

ঘোড়াও দুটো। সাদা ঘোড়া আদিত্যর, পাটকিলে রঙেরটা খুড়োমশায়ের। ঘোড়ার ঘাসটাস কেটে দিই, এক-আধ বার ওরা চড়তে দেয়।

শ্বশুর অধীর হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার নিজের তবে কি আছে বলো।

মিছরি বলেন, খুড়োমশায়ের রান্নাঘর দেখেছেন। ওর দাওয়ায় আপনাদের খাওয়াদাওয়া হল। রান্নাঘরের কানাচে নারকেলতলায় দোচালা ঘর—সেইটে আমার। সে ঘরে থাকার অবস্থা নেই। এর বাড়ি ওর বাড়ি শুয়ে রাত কাটাই।

মেয়েরা কুক ছেড়ে কেঁদে ওঠেন বাড়ির ভিতরে। বাইরে-বাড়ি অবস্থা বুঝে সূর্যনারায়ণ গাড়ু হাতে নিলেন।

কী ব্যাপার ?

সূর্যনারায়ণ চোখ টিপে বলেন, সকলকে জানান দিয়ে দে। বাঁশবাগানে গাড়ু ফেলে আমি নৌকোয় উঠে পড়ব। যে যেখানে

আছিস পথ দেখ্। বাসিবিয়ের ভোজ খাবার লোভ করলে মারা পড়বি। জলমার হাটখোলায় পৌঁছে মুড়ি-বাতাসা কিনে খাব। তার বেশি আজ কপালে নেই।

।। বত্রিশ ।।

সূর্যনারায়ণের ঘোড়া ছিল। আস্তাবলে ঘোড়া বাখা বড়লোকের ইজ্জত। সদরে থাকতেন তিনি, বাড়ি এসে নিতান্তই কালে-ভদ্রে চড়তেন। ছেলে প্রসন্নও পারতেন না ভাল—ভয় করত তাঁদের এই ত্রুটি সুদে-আসলে পূরণ করেছেন এই পশ্চিমবাড়িরই আর একটি-- আদিত্যনারায়ণ। আদিত্যে আর সূর্যনাবায়ণে নাতি-ঠাকুবদা সম্পর্ক।

তল্লাটের মধ্যে সওয়ারবাবু। আমবা আদিত্যদা বলে ডাকি। অহরহ ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতেন। লোকে বলত, ঘোড়ার পিঠেই নেমেছেন তিনি মাতৃগর্ভ থেকে। শেষ দিনে যমালয়েব ডাক এলে তখনও যাবেন ঘোড়সওয়ার হয়ে। গোড়ার রটনা ডাহা মিথ্যে বুঝতেই পারছেন, শেষেরটা কিন্তু খানিক ফলেছে। ঘোড়া থেকে পড়ে পা খোঁড়া হয়েছে তাঁর। চোখেও ইদানীং ঝাপসা দেখেন। খুনখুনে বুড়ো—বসে থাকলে মাথা কাঁপে।

শৈশবে এই আদিত্যদা'র ভিন্ন চেহাবা দেখেছি। এবং আরও অনেক আগে—আদিত্যদা যখন যুবাপুরুষ, সেই আমলের গল্প শুনেছি অনেক। ছিপছিপে বেঁটেখাটো মানুষটা, বাটা-হলুদেব মতো গায়েব রং। ঘোড়ার পিঠে সর্বক্ষণ, পারতপক্ষে মাটিতে পা ঠেকান না। খটখট খটাখট আদিত্যদা'র ঘোড়া ছুটে বেড়ায়।

আদিত্য বলতেন, কদমের চাল। যারা সেখানে আছে মুখ টিপে হাসে, মুখে কিছু বলতে ভরসা পায় না। কিন্তু মুজগন্নির বসন্ত বেওয়ার আলাদা ব্যাপার—কারো দেমাক সহ্য হয় না তার। আদিত্যর মুখের

উপরেই কর-কর করে ওঠে: ঝিকরগাছা-হাটের ফকরে-ঘোড়া তো সওয়ারবাবু। চাল যদি থাকে, সেটা কদমের নয়—ঘেটুফুলের।

অস্থিসার ঘোড়ায় চেপে ফকিরে ভিক্ষা করে বেড়ায়—তাকে বলে ফকরে-ঘোড়া। ঘোড়ার অপমান এর উপরে আর হয় না। তবু বলছে কিনা বসন্ত বেওয়া আদিত্য একটিবার চোখ পাকিয়ে চুপ করে যান। অন্য কেউ হলে রক্ষে ছিল না।

বীরপুরুষ আদিত্য—হাতে লাঠি বা শড়কি, বাহন ঘোড়া। আর অঞ্চলের মধ্যে বীরকন্যা যদি কেউ থাকে তবে এই বসন্ত। নিতান্তই বেওয়া মানুষ সম্বলের মধ্যে একখানা মুখ। তা ওই একখানা অস্ত্রেই ভগবান পুষিয়ে দিয়েছেন, তা-বড় তা-বড় জোয়ানপুরুষ সম্মুখ-সমরে পালাতে দিশা পায় না। কথা না শোনার ভান করে আদিত্য হেন মানুষও ঘোড়া ছুটিয়ে দিতেন। ফকরে-ঘোড়া হোক যা-ই হোক, বুদ্ধিটা তীক্ষ্ণ—বিপদ বুঝে ঘোড়া প্রাণপণে দৌড় দিত।

সূর্যনারায়ণের নতুন দোতলা দালান। রাতদুপুরে দালানের কানাচ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যায় মুজগন্নি গাঁয়ের দিবে—কে গা? কোন মানুষ আবার—আদিত্যনারায়ণ, যাঁর কাঁধে শনি ভর করেছে, দুদণ্ড বসলে যাঁর মাথার ভিতরে ছটফটানি-পোকা কুটকুট করে কামড় দিতে থাকে। এবং যাঁর মনের কুঠুরির ভিতরে বসন্ত বেওয়া। বসন্তর বিশ হাতের মধ্যে গিয়ে পড়ুন, লকলকে জিভখানা সাপের মতন বিষ ছড়াবে। ওই রকম দুর্ধর্ষ বলেই বোধকরি আদিত্যের ঝোঁক তার উপরে। বউ সুশীলাবালা সেবাযত্ন করে, কাঁদাকাটা করে, এবং শোবার সময় স্বামীর কোঁচার খুঁটের সঙ্গে নিজের আঁচলে গেরো দিয়েও ঠেকাতে পারে না। নিশিরাত্রে শীতে-বর্ষায় বিল পাড়ি দিয়ে লাভটা মোটমাট কি—বসন্তর বচনের বিষ দু-কান ভরতি করে নিয়ে জ্বলতে জ্বলতে আবার বিল পাড়ি দিয়ে ফিরে আসা। দিক্‌পাল ঠাকুরদাদা সূর্যনারায়ণকে সবাই এক-ডাকে চেনে—সেই বাড়ির কুলাঙ্গার হচ্ছেন আদিত্যনারায়ণ।

আদিত্যদা'র নিজের ভাবখানা, তল্লাটের রাজাধিরাজ যেন তিনিই। ঘোড়ার পিঠে সকাল থেকে—রাজা যেন স্বয়ং তদারকিতে বেরিয়েছেন। সূর্য ঠিক মাথার উপরে এসে যখন চাঁদি ফাটবার অবস্থা, আদিত্যদা অগত্যা ঘোড়ার মুখ বাড়িমুখো ফেরান। ঘোড়া ছুটিয়ে বাহবা খুব পাওয়া যায়, কিন্তু চাল-ডাল মেলে না। আদিত্য ওই বাহবাতেই খুশি। সওয়ারবাবুর কাছে সাহস করে চাল-ডালের কথা কে তুলতে আসবে? মুণ্ডু তার একটানে ছিঁড়ে নেবেন না কাঁধের উপর থেকে? ছিঁড়ে নিয়ে দুচার বার লোফালুফি করে আবার দিয়ে দেবেন যার জিনিষ তাকে। পরের জিনিষ সওয়ারবাবু ঘরে আনেন না, তবে তো চুরি করা হল। রাগের বশে পরেব ক্ষেতে ঢুকে মুলো-পালং উপড়েছেন, শশা-কাঁকুড় ছিঁড়েছেন, কিন্তু একটাও কখনো হাতে তুলে নেন নি।

ঘোড়া ছুটিয়ে বাড়ির মধ্যে উঠানের উপর এসে আদিত্য নেমে পড়লেন। গায়ে-মাথায় ঘষে ঘষে বেশ খানিকক্ষণ ধরে তেল মাখেন। গামছাখানা কাঁধে ফেলে লম্ফ দিয়ে পুনশ্চ চড়লেন আবার ঘোড়ায়। ঘোড়া জানে সব। পুকুরঘাট অদূরে—ঘাটের উপর নারকেলতলায় ঘোড়া স্থির হয়ে দাঁড়াল। আদিত্য ঝুপ-ঝুপ করে বিশ-পঁচিশটা ডুব দেন। গা-হাত-পা মুছে গামছা পরে কাপড়টা থাবা দিয়ে দিয়ে কেচে নিংড়ে কাঁধের উপর ফেলেন। ঘোড়া এতক্ষণ এদিক-ওদিক দূর্বাঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছিল, মনিবকে দেখে ঘাটের খেজুরগুঁড়ির ধারে চলে আসে। জিন-রেকাবি নেই, চামড়ার লাগামের অভাবে এক খণ্ড লোহা গালের ভিতর ঢুকিয়ে দু-প্রান্তে পাটের দড়ির টানা দেওয়া। বাহাদুর ঘোড়া ওই লোহা-পরা গালে দিব্যি ঘাস খেয়ে বেড়ায়। স্নান সেরে গামছা-পরা আদিত্যদা ঘোড়ায় উঠে বসেন। ঘোড়া এক-ছুটে ঘরের ছাঁচতলায় নিয়ে আসে। কোন রসিক জন তাই ছড়া বেঁধেছিল:

ঘোড়ায় চড়ে চানে যান,
বাড়ি ফিরে পান্তা খান—

কিন্তু খাওয়ার ওই উক্তিটুকু সর্বৈব মিথ্যা। নিজের জোগাড়ে খেতে হলে পান্তাও অবশ্য জুটত না। স্ত্রী সুশীলাবালা এবং মেজঠাকরুন ভবানী বর্তমান থাকতে পান্তা খেতে যাবেন আদিত্যদা কোন দুঃখে? ঘোড়া থেকে নেমে গামছা ছেড়ে কাপড় পরে সশব্দে পিঁড়ি পেতে নিলেন। শব্দ পাওয়া মাত্র ডান হাতে জলের গেলাস এবং চিতানো বাঁ-হাতের উপর থালা নিয়ে সুশীলাবালা দর্শন দেবে, এই হল নিয়ম। থালায় মোচার আকারে পরিপাটি রূপে ভাত বাড়া, ছোট বাটিতে সুগন্ধি গব্যঘৃত, এবং বিবিধ তরকারি অন্যান্য বাটিতে। এইগুলো ঠিক মতো হাজির করে দেওয়ার দায় সুশীলাবালার। আদিত্যদা কোন ধার ধারেন না—স্নান করে এসে ভাত-ব্যঞ্জন চাই, এই হল কথা। সুশীলা-বালারও অভিযোগ নেই—বিয়ের একটা-দুটো বছর পর থেকে প্রতিটি দিন যথানিয়মে চলে আসছে। কিছু ধানিভূঁই আছে, সেই ধানে টেনে-কষে মাস পাঁচ-ছয় চলতে পারে। বাকি মাসগুলোর কথা হয়তো বলতে পারবেন সূর্যনারায়ণের স্ত্রী ভবানী। এতগুলো শরিকের মধ্যে ভবানী ঠাকরুনের সব চেয়ে বেশি টান এই নাতিটির উপর। দুর্দান্ত বলেই বোধহয়।

সুশীলা-বউ কখনো কিছু বলে না, বলেছিলেন একদিন ভবানী: দিনরাত্রি এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াবে, সংসারের দিকে নজর তুলে দেখবে না—

একগাল হেসে আদিত্য বলেন, দশজনে ডাকে যে ঠাকুরমা। ঘুরি কি সাধে? যার যেখানে আটকাচ্ছে, বুক দিয়ে পড়তে হয়।

বর্গাদারের বাড়ি অমনি যদি এক-একবার গিয়ে হাঁক দিয়ে এসো! আউড়ির দিকে দেখেছ চোখ তাকিয়ে, আষাঢ় মাসেই ধান তলায় এসে ঠেকেছে।

আদিত্য বলেন, সূর্যনারায়ণের নাতি হয়ে আমি যাব বর্গাদারের বাড়ি? কেমন করে বললে কথাটা! ও সব বরকন্দাজের কাজ।

তবে বরকন্দাজই পাঠাও—

আদিত্য বলেন, আমায় ঠাকুরদা পেয়েছ নাকি যে হাঁক পাড়লে উর্দিচাপরাস-পরা বিশ গণ্ডা জমিদারি বরকন্দাজ অমনি সেলাম ঠুকে দাঁড়াবে।

তারপর কঠিন কণ্ঠে বলেন, ধানের কথা নিয়ে বউ বুঝি কাঁদুনি গেয়েছে তোমার কাছে?

চোখ পাকিয়ে ঘরের মধ্যে অলক্ষ্য সুশীলার উদ্দেশ্যে তাকালেন একবার।

স্বীকার করলে সুশীলাবালার দুর্গতি। ভবানী না-না করে ওঠেন: বউ কি বলবে আমায়! মুখ ফুটে বলতেই বা হবে কেন? বলি, হাঁড়ি না হয় আলাদা—বাড়ি তো একই বটে। তোমার ঘর আর আমার রান্নাঘর—তফাৎ কতটুকু? সমস্ত চোখে পড়ে যায়। কী কষ্ট করে চালাচ্ছে যে বউটা!

হুঁ, ব্যবস্থা হবে ঠাকুরমা। উঠোনে বেড়া তুলে দেবো, বউয়ের কষ্ট তোমার চোখে পড়বে না।

ভবানী বলেন, তার চেয়েও সোজা কাজ আছে একটা। লাঠিসোটা নিয়ে তো ঘোর, একটা লাঠি একদিন বউটার মাথায় বসিয়ে দাও। বেঁচে যাক হতভাগী। সে-ই সকলের চেয়ে ভাল।

রাগে গরগর করতে করতে ভবানী চলে গেলেন। মোটমাট দুটো মানুষ দুনিয়ার উপর আছে—ঠাকুরমা ভবানী আর বসন্ত বেওয়া, মুখের উপর কথা শোনাতে যারা ভয় পায় না। মেয়েমানুষ বলেই ক্ষমাঘেন্না করে নিতে হয়। পুরুষ হলে রক্ষা ছিল না।

সেরা উকিল সূর্যনারায়ণ। তল্লাটের বড় বড় জমিদার, সবাই তাঁর মক্কেল। সূর্যনারায়ণের উপর আমমোক্তারনামা দিয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে তাঁরা জমিদারি ভোগ করেন। মক্কেলের জন্য সূর্যনারায়ণ করেনও বিস্তর। কিস্তির খাজনা এসে পৌঁছল না, নিজের টাকায় কালেক্টরিতে খাজনা জমা দিয়ে অনেকবার অনেকের মহাল ঠেকিয়েছেন। পরে

অবশ্য উশুল করে নেন। উশুল কত রকমে হয়, লেখাজোখা নেই। ধারা বয়ে টাকা চলে আসে।

এ হেন মানুষের নাতি বলে পরিচয় দেয়, তার এই রকম অবস্থা। আদিত্যর একটা কাজকর্ম জুটিয়ে দেবার জন্য ভবানী স্বামীর কাছে বলেছেন অনেকবার। সূর্যনারায়ণ নাম শুনতে পারেন না—কান পচে গেছে আদিত্যর নামে নালিশ শুনতে শুনতে : কাজকর্ম তো কত-জনকে করে দিই। শঙ্করনারায়ণও আর এক নাতি—উকিল হয়ে বসতে না বসতে গাদা গাদা মক্কেল। আদিত্যর কোন্ ক্ষমতা আছে, ও কি করবে ? করতেই বা যাবে কোন দুঃখে ?

ভবানী বলেন, বাড়ি থাকো না, জানতে পার না তাই কিছু। আউড়ির ধানে আষাঢ় মাসটা টেনেটুনে যদি চলে। তার পরেই হা-অন্ন হা-অন্ন—

সূর্যনারায়ণ ঘাড় নাড়লেন : কিছু না, আরও তো মজা তখন। নাতবউ কষ্ট করে দুটো দুটো চাল ফুটিয়ে থাকেন, তখন রাঁধা ভাতব্যঞ্জন দু'জনের মতো ঘরে গিয়ে পৌঁছবে।

কটাক্ষ স্ত্রীর উপরে। সদরের বাসায় কিছুতে ভবানীকে নিয়ে যেতে পারেননি। গাঁয়ের গৃহস্থালিতে ধান-চাল গুড়-কলাই আওলাত-পশার জনকিষাণ—সকাল থেকে রাত দুপুর অবিশ্রাম খাটাখাটনি করেই ভবানীর আনন্দ। গোনাগণতি তিন-চারখানা ঘরের শহুরে বাসায় খাঁচার পাখি হয়ে আরাম করতে চান না তিনি।

শ্রীপুরের মনোহর রায় ব্যবসা-বাণিজ্যে অঢেল টাকা করেছেন। পরগণা মুড়াগাছি খরিদ করে এইবারে জমিদার নাম নিলেন। সূর্য-নারায়ণ মধ্যবর্তী থেকে দাঁও মতো নিলাম ডেকে দিয়েছেন।

মনোহর এসে বলেন, জমিদারি তো করে দিলেন। পরেরটা সামলে দিন এবার। মহাল নাগরগোপ আপনারই দেশভুঁই মশায়।

সূর্যনারায়ণ আপ্যায়িত হয়ে বলেন, বটেই তো! কী দরকার বলুন ?

দরকার বলেই আপনার বাসা অবধি ধাওয়া করেছি। আপনার এক দক্ষ নাতি আছে, শুনতে পেলাম।

সূর্যনারায়ণ সগর্বে বলেন, ঠিক শুনেছেন। শঙ্করনারায়ণ বয়সে কাঁচা, কিন্তু ক্ষুরধার বুদ্ধি তার। এখনি ডেকে পাঠাতে পারি। আপনার এস্টেটের যাবতীয় মামলামোকদ্দমা নিজের মতন করে করবে।

মনোহর ঘাড় নাড়লেন: উকিল চাচ্ছিনে। গাঁয়ে আপনার যে নাতিটি থাকে—তেজস্বী স্বভাব, কাউকে খাতির করে না—সেই ছেলেটিকে বড় দরকার আমার।

এতবড় প্রবীণ বিচক্ষণ মানুষটা উকিল শঙ্করনারায়ণকে না চেয়ে নিষ্কর্মা আদিত্যের খোঁজ করছেন। চমক লাগে সূর্যনারায়ণের—আদিত্যেরও তবে যেন কিছু মূল্য আছে! বললেন, বেশ তো, ক'দিন আছেন এখানে রায়মশায়? কালই একটা লোকের হাতে চিঠি পাঠাব। পরশু-তরশু আদিত্য এসে যাবে।

মনোহর বলেন, চিঠি লিখে আপনি আমার হাতে দিয়ে দিন। নাগরগোপের নতুন কাছারিবাড়ি পুণ্যাহ করতে যাচ্ছি, বাবাজি সেইখানে যেন আসেন। পরামর্শ আছে। ওই আদিত্যের কথা আমাদের নায়েব বিশেষ করে লিখেছেন।

পুণ্যাহের পরদিন আদিত্যের ঘোড়া টকটক করে নাগরগোপের কাছারি ঢুকছে।

পাইক-বরকন্দাজ ছুটে এসে পথ আটকায়: আরে সর্বনাশ, কাছারির হাতার মধ্যে ঘোড়সওয়ার! খোদ জমিদারমশায় চেপে আছেন এখন। বিয়ের কনে পর্যন্ত পালকি থেকে নামিয়ে পায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যায়। মনের ভুলে কে-একজন সেদিন গানের ধুয়ো ধরেছিল, নাকে খত দিয়ে তবে মার্জনা হল।

আদিত্য বলেন, মাটিতে পা দিয়ে আমি কখনো হাঁটিনে, পায়ে

ব্যথা করে। ঘোড়া এগোতে না দেবে তো তোমাদের সেই জমিদার-মশায়কে খবর দাও, তিনি চলে আসুন এখানে।

মুখ তাকাতাকি করে একজন ভিতরে চলে গেল। জামগাছ-তলায় আদিত্য ঘোড়ার পিঠে অপেক্ষা করছেন—ক্ষণপরে নায়েব মশায়কে দেখা যায়, হন্তদন্ত হয়ে আসছেন। বয়স্ক লোক এবং বিষম প্রতাপশালী—কিন্তু রীতিমত 'আজ্ঞে' 'আজ্ঞে' করছেন আদিত্যর কাছে: আসতে আজ্ঞা হোক—আসুন। পথের উপর এ জায়গায় কেন?

নিয়ম যে বড্ড বেয়াড়া আপনাদের। ঘোড়া থেকে নামতে বলছে।

নিয়ম কি আপনার জন্যে? উঠোনের এ-মুড়ো ও-মুড়ো ঘোড়দৌড় করে বেড়ান না—তার জন্যে কী! তবে শেষকালে নামতে হবে একটিবার। নেমে ফরাসের গদিতে। হুজুর সেই কখন থেকে অপেক্ষায় আছেন।

উঠানে যেতে মনোহরও সমাদরে আহ্বান করেন: এসো দাদাভাই। তোমার ঠাকুরদামশায় আমার পুরানো সুহৃৎ। সেই সুবাদে তুমি অতি আপনজন। এক গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়েছি ভায়া—

গণ্ডগোলের নামে আদিত্য লাফিয়ে ওঠেন: বলুন, বলুন—

বলব বই কি! স্থির হও। কষ্ট করে এত পথ এসেছ, জিরিয়ে নাও একটু।

আগের দিন পুণ্যাহ গেছে। জাঁকালো উৎসব। তারই মিষ্টিমিঠাই আছে অনেক। রেকাবি ভরে সাজিয়ে এনে পাশের ঘরে ঠাঁই করে দিল।

আদিত্য অধৈর্য হয়ে বলেন, এসব আমাদেরই গাঁ-গ্রাম। সূর্যনারায়ণ আজও মাথার উপরে বর্তমান। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা, গণ্ডগোল করতে আসে! ব্যাপারটা শুনি আগে, তারপরে খাওয়া-দাওয়া—

মনোহর হেসে বলেন, ঠিক উল্টো ব্যাপার। গণ্ডগোল অন্য কেউ করতে আসছে না। তোমার যদি ভরসা পাই, আমরা খানিকটা গণ্ডগোলে নামি। জমিদারি রাখতে হলে চাই ও-সব। জলটল খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে ধীরে-সুস্থে শুনবে।

জলযোগের পর বাইরের লোকজন সরিয়ে দিয়ে আদিত্যকে কাছে বসিয়ে বলেন, দেখ,এই নাগরগোপ মহালের ভিতরে একটা হাট নেই। আমার প্রজাপাটক মুখুজ্জেদের মুজগন্নির সায়েরে হাটবাজার করে। হাটবারে সামনের রাস্তা ধরে মানুষজন সায়েরে যায়, আমার গায়ে যেন ছাট পড়তে থাকে।

ভালই তো! উল্লাস চেপে রাখা আদিত্যের অসাধ্য হয়ে পড়ছে। বলেন, আগে হাতী বলত এই মুখুজ্জেদের—সরু হতে হতে এখন নেংটি ইঁদুর। ইঁদুরে লেজের ছাট মারবে, সেটা কেমন করে সহ্য হয়। জুতমতো জায়গা দেখে এক্ষুনি হাট বসিয়ে দিন—আবার কি!

মনোহর বলেন, তাই ভাবছি। গাঙের ধারে নাটার জঙ্গল—জায়গাটা সাফসাফাই করে নিলে কেমন হয়? একদিকে ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের রাস্তা, আর একদিকে গাঙ—ডাঙার পথ জলের পথ হাটুরে-লোকে দুটোই পেয়ে যাচ্ছে।

আদিত্য পরমোৎসাহে বলেন, খাসা, খাসা! সকাল থেকেই জঙ্গল কাটতে লাগিয়ে দিন। দেরি করবেন না।

কিন্তু আর একটা দিক আছে বাবাজি, সেইটে ভেবে আগু-পিছু করছি। সায়ের আর নতুন-হাট বড্ড কাছাকাছি হবে, পাল্লাপাল্লির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে দস্তুরমতো। বিবেচনা কর, ওদের সায়ের কত পুরানো—দূরদূরান্তের লোক বিস্তর কাল থেকে জানে, পাহাড়প্রমাণ মালপত্তরের আমদানি। তার উপরে ফকির-রাস্তার পাকা পুল হয়েছে গাঙের উপর, আমাদের পার থেকেই পিলপিল করে মানুষ সব ওপারে চলে যায়। নতুন-হাট না জমে তো মুখুজ্জেরা হাসাহাসি করবে খুব। আমাদের ইজ্জত নষ্ট হবে। তাই ভাবছিলাম, ওদের চোখের আড়ালে হলে সুবিধা হত। কিন্তু তেমন জায়গাই বা কোথা?

আদিত্য অধীর হয়ে বলেন, কিছু ভাববেন না রায়মশায়। নাটার জঙ্গল কেটে হাট বসিয়ে দিন। যা-কিছু করতে হবে চোখের উপরেই। আড়াল খোঁজেন তো আমি তার মধ্যে নেই। সাফ কথা।

আদিত্যর মুখে তাকালেন মনোহর। বহুদর্শী মানুষ, প্রথম জীবনের দরিদ্র অবস্থা থেকে বড় হয়েছেন। ভরসা পেলেন। বলেন, বাকি কথাবার্তাও তবে সেরে নাও বাবাজি।

আদিত্য সবিস্ময়ে তাকান। বুঝতে পারছেন না।

মনোহর বলেন, তোমার অনেক পরিশ্রম হবে। সেই বাবদ কী আমায় দিতে হবে, খোলাখুলি বল।

আদিত্য গর্জন করে ওঠেন: মাইনে? আপনার নায়েব-গোমস্তা-বরকন্দাজ—তাদেরই একজন করে রাখতে চান নাকি?

জবাবে মনোহর কি বলতে যাচ্ছিলেন। কথা কানে না নিয়ে আদিত্য বলেন, তল্লাটের মধ্যে সওয়ারবাবু আমি। নতুন এসেছেন, তাই জানেন না। খুড়োমশায়ের চিঠি পেয়ে এসেছি। চাকরি দেবেন তো তার জন্য বিস্তর লোক আছে।

অনেক বলে-কয়ে মনোহর রায় আদিত্যর রাগ ভাঙালেন। লোকজন নাটার জঙ্গল কাটছে। ইটের পাঁজা ছিল এককালে, পুরানো ইট ও ঝামা সরিয়ে ফেলে মাটি দুরমুস করছে। রাস্তার লোক আসতে যেতে জিজ্ঞাসা করে, গাঙের উপরের নৌকোর লোক জিজ্ঞাসা করে। মুখে মুখে নতুন-হাটের কথা ছড়িয়ে যায়।

তারপরে ঢোল-শহরৎ। যত হাটবাজার আছে, সর্বত্র কাড়া পিটে দেয়: শুভ অক্ষয়তৃতীয়ায় রায়হাটের পত্তন হচ্ছে ন্যায্য দরে বেচাকেনা। মাল এক ছটাকও পড়ে থাকবে না, থাকলে এস্টেট থেকে কিনে নেওয়া হবে। ব্যাপারির লোকসানের ভয় নেই। তার উপরে যাত্রা, ঢালিখেলা, জারি, ঢপকীর্তন—হপ্তা ভোর হরেক মজা।

লোকে লোকারণ্য। কিন্তু আরম্ভের মচ্ছব মিটে গেলে আবার সব ঝিমিয়ে এল। পাইকার মহাজন আসে না, তা নয়। খদ্দের-পত্তরও আসে। তা সত্ত্বেও মুখুজ্জেদের সায়েরের ক্ষতি বিন্দুমাত্র হয়েছে, মনে হয় না। স্থানীয় লোক তাঁরা—হ'রে মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশা, ভালবাসাবাসি। কারও কোন অসুবিধার কথা কানে

এলে নিজেরাই সায়েরের মধ্যে গিয়ে পড়েন। বাইরের অজানা কোন্ জমিদার এসে হাট বসাচ্ছে—তার জন্যে মানুষজন কেন মুখুজ্জেদের সঙ্গে পুরানো সম্পর্ক ছাড়তে যাবে? কিসেব দায় পড়েছে?

আরও মুশকিল, সায়ের বসে গাঙের খানিকটা নিচের দিকে। দক্ষিণের আবাদের লোক ডোঙা-ডিঙি নিয়ে হাট করতে আসে, হাটের অর্ধেক মানুষ তারাই। সায়ের তারা আগে পেয়ে যায়। তার উপরে বড়-মুখুজ্জেমশায় ভবতারণ হাটেব সময়টা ইদানীং গাঙেব ধাবে নিজে এসে দাঁড়াচ্ছেন জলের মধ্যে পায়ের পাতা ডুবিয়ে। মজা-নদীর দুই কিনারে কলমি আর কেউটেফণার দাম, মাঝখানে নৌকো-ডোঙার শয়াল।

কারা যাও—আহা, মুখ ফেরালে কেন ওদিকে? দেখি, দেখি। ঘাটে এসে গেছে, গল্পে গল্পে ঠাহর পাওনি ব্যাপাবি। নৌকোয় ওসব কিসের বস্তা—মটরকলাই? ভাল দিনে কলাই এনেছ, মুড়ুলি থেকে আজ অনেক পাইকাব এসেছে। দব উঠবে ভাল। এসেছও বেশ সকাল সকাল। বস্তাগুলো ছেড়ে দিয়ে বেলাবেলি ফিবে যেতে পারবে।

এর পরে আর কী করতে পারে কলাইয়ের ব্যাপাবি? ইচ্ছা ছিল, নতুন-হাটে উঠে ভাবগতিক বুঝে আসবে। কিন্তু প্রাচীন মানুষ ভবতারণ মুখুজ্জে আধখানা বাঁক আগে থাকতে ধবে ফেললেন। কলাইয়ের বস্তা অগত্যা সায়েবে নামাতে হল।

আবার ডাঙার পথে যারা আসছে তাঁদের জন্য পোলের মুখে ঘাঁটি আগলে আছেন ভবতারণের ছোটভাই নিস্তারণ। সায়ের বসে ফকিরেব পোলের একেবারে পাশে, প্রকাণ্ড চার পাঁচটা বটগাছের নিচে। দেখুন গিয়ে হাটবারে, সকালবেলাতেই কত গরুর-গাড়ি। গরু ছেড়ে দিয়েছে, গাঙের খোলে নেমে জোলো-ঘাস টেনে টেনে যাচ্ছে। গাড়োয়ানরা বটের শিকড়ের উপর বসে তামাক টানে আর গল্পগুজব করে। নানা জায়গার মানুষ—মুখে নানান রকমের খবর। আবো

বেলা বাড়লে রান্না চাপানোর গরজ পড়ে। চষা-ক্ষেত থেকে মাটির ঢেলা সংগ্রহ করে তিনটে ঢেলা বসিয়ে হাঁড়ি চাপিয়ে দেয় তার উপর। দাইরকুটোর অভাব নেই, গাছতলায় ঘুরে এলেই বোঝাখানেক শুকনো ডালপালা। ভাত সিদ্ধ হয়ে এসেছে তো ঝুপ-ঝুপ করে গাঙে গোটা কতক ডুব দিয়ে এলো। জল বড় ঠাণ্ডা, ভারি আরামের। স্নানের পরে পদ্মপাতায় ভাত ঢেলে থাবা থাবা খেয়ে নিচ্ছে হাট জমবার আগে। হাট জমলে তখন আর কেউ কারো নয়। কেনা-বেচা, টাকা-পয়সার লেনদেন—তখন আর খাতির-উপরোধের কোন ব্যাপার নেই।

চর হয়ে একজনে চুপিসারে দেখে গিয়ে আদিত্যর কাছে খবর দিল—আগে যত গাড়ি আসত, এখনো তাই। দু-পাঁচখানা কম হলেও হতে পারে, সে কোন ধর্তব্যের বিষয় নয়।

আদিত্য বলেন, যাত্রা গেয়ে গেয়ে বেটারা গলাই ভাঙল। কাজ হবে না, সে আমি জানতাম। সোজা মানুষ আমরা, মোটা কাজকর্ম বুঝি। সামনের সায়েরের দিনে চলো নিজেরা গিয়ে হাটবাজার করে আসি।

হাটবাজার করতে যাওয়ার অর্থ সাগরেদরা ভাল রকম জানে। পুরো সায়ের গমগম করছে, তিন চার হাজার মানুষ—তারই মধ্যে আদিত্যরা মাত্র জন-দশেক লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিলেক ইতস্তত নয়—ঝাঁপিয়ে পড়ে দমাদম বাড়ি।

জিনিষপত্রের উপর পড়ছে লাঠি, মানুষজনের মাথায় পড়ছে। আদিত্য এক ফড়িঙের মতো মানুষ—তাঁর লাঠি মারা দেখবার বস্তু। তিড়িং-তিড়িং করে সারা সায়ের যেন চষে বেড়াচ্ছেন। জিনিষপত্র ফেলে লোকজন প্রাণ নিয়ে দৌড়। এসেছে সবাই হাটবেসাতি করতে—হাতে ধামা-ঝুড়ি-খালুই, গাঁটে পয়সা। গণ্ডগোলের কথা কে ভাবতে গেছে! তারই মধ্যে একজন কেউ রোখ দেখাল তো আদিত্য এর ঘাড়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে ওকে ধাক্কা মেরে পায়ের ঘায়ে জিনিষপত্র

তছনছ করে চক্ষের পলকে লোকটিকে ধরাশায়ী করেন। আর হাটুরে-কাজিয়ার মজা হচ্ছে, সেই ধরাশায়ী লোকটার চতুর্দিক ঘিরে যত মানুষ তখন টিবটাব কিল-চড় বর্ষণ করবে। কেন, কী বৃত্তান্ত, সে খোঁজ নিতে যাবে না। দোষঘাট নিশ্চয় করেছে, সর্বচক্ষুর উপরে নয় তো পিটুনি খাচ্ছে কেন? আর ঠিক আগুনের মতো। আগুন একখানে ধরিয়ে দিলেই হল—বাতাস দিতে হবে না, বড় হয়ে আপনিই ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। কাজিয়াবও তেমনি গোড়াটা ধরিয়ে দিয়ে নিজে সরে পড়ুন আপনি, গোলমালের ত্রিসীমানায় থাকবেন না। অথবা মজা দেখবার বাসনা হল তো দূরের নিরাপদ জায়গায় নিরীহের মতো মুখ করে দাঁড়ান। মানুষ পালাচ্ছে—বহুদূরের গাঁ-গ্রাম থেকে যারা আসছিল, পথের পলায়মান লোকের কাছে গোলমালের কথা শুনে তারাও সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে ঘরমুখো দৌড় দিচ্ছে। কতক আছে আবাব উল্টো মনমেজাজের—কাজকর্ম সেবে বাড়ি যাচ্ছিল, খবর শুনে সায়েরে ফিবে চলল। উত্তম লভ্য হবে, এই প্রত্যাশা। ছুটো-ছুটির মধ্যে নিশ্চয় অনেক জিনিষপত্র পড়ে আছে, সেইগুলো কুড়াবে। জিনিষ যদি না হয়, অন্তত মাব দেওয়াব মতো মানুষ পাওয়া যাবে হাতের মাথায়। পিটিয়ে হাতের সুখ কববে—সে-ই বা কম হল কিসে।

খেজুর-চাষের চলন এদিকে। বলেছি সেকথা আগে। খেজুবগাছ কেটে রস হয়, জ্বালিয়ে গুড়-পাটালি। শীতকালেব তিন-চারটে মাস গুড়ের হাট ভাবি জমজমাট। কাজিয়ার পরে মানুষ একটাও নেই —গুড়ের নাগরি সারি সাবি। নলেনগুড়, গন্ধ ভুর-ভুর করছে। খবর হয়ে গেল, গুড় খাবি তো ছুটে যা সায়েরে। লোভে পড়ে অনেকে ছুটেছে। নাগরি-ভাঁড় ঘা দিয়ে ভাঙে, আর মাছির মতন গুড় খায়। নিখরচার জিনিষ, আর ভিড় তো ক্রমেই বাড়ছে—যে যতদূর পেট ভরে নিতে পারে। তাড়াতাড়িতে মুখে গুড় মেখে গিয়ে কিম্ভূত-কিমাকার চেহারা। তা হোক, ধীরেসুস্থে ভদ্রভাবে খেতে গেলে ভাগে কম হয়ে যাবে।

থানা মাইলখানেকের মধ্যে। ভবতারণ মুখুজ্জে দেখলেন, ধামা-খালুই নিয়ে আদিত্যরা সায়েরে আসছে। দেখেই মুখ শুকাল। হাট-বাজার করে আর দশজনের মতো সংসারধর্ম করার মানুষ এরা নয়। আরও ঠাহর হল, খানিকটা পিছনে একটা লোক লাঠির বোঝা নিয়ে গুটিগুটি আসছে। নিঃসন্দেহ হয়ে তখন থানায় লোক পাঠালেন। বড়-দারোগা ছিলেন না—খানিকক্ষণ পরে দলবল নিয়ে কোথা থেকে তদন্ত সেরে ফিরলেন, গায়ে পোষাক চড়ানো। তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন তিনি। হাঙ্গামাটা বলতে গেলে থানার উপরেই। হাতে-নাতে ধরে বেয়াড়া আদিত্যটাকে সায়েস্তা কববেন তিনি আজ। সাইকেল নিয়ে তক্ষুনি ছুটলেন, পিছনে কনেস্টবলরা।

সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। ফাঁকা সায়ের, গুড় খাচ্ছে কেবল ক-জনে। কনেস্টবলরা তেড়ে গিয়ে তাদের ধরল। তারা কেঁদে ফেলে: না হুজুর, ভাঁড় ভাঙি গুড় খাই—কাজিয়ার ধার ধারিনে আমরা।

ভবতারণও তাই বললেন: গাঁয়ের গরিব মানুষ এরা সব, গুড়ের লোভে এসে জুটেছে। পালের গোদা আদিত্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ মজা দেখছিল, সাইকেলের ঘণ্টা শুনে সবে পড়েছে। ঘোড়া নেই, এই বড় সুবিধে। পোলের ওধারে নাগবগোপের এলাকায় ঘোড়া বেঁধে পুরোপুরি হাটুবে-মানুষ হয়ে এসেছে। ঘোড়া বিনে আদিত্য খোঁড়া – পায়ে ছুটে বেশি দূর যেতে পারবে না।

নিস্তারণ বলেন, বসন্ত বেওয়ার বাড়ির দিকে যাচ্ছে দেখলাম।

বসন্তর বাড়ি বেশি দূরে নয়। চলল সবাই।

বড়-দারোগা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন: আদিত্যবাবু এসেছে?

বসন্ত ঘাড় নেড়ে সায় দেয়, এসেছে। মুখে চেঁচিয়ে উল্টো কথা বলল, না।

আদিত্য গাছের মাথায় চড়ে দোডালায় পা ঝুলিয়ে বসেছেন। সেখান থেকে বসন্তর ঘাড় নাড়া দেখলেন। গজরাচ্ছেন মনে

মনে: নেমে আসি—দেখব কেমন তুমি বসন্ত। যে মুণ্ড ঘোরালে, সেই মুণ্ড মাটিতে পেড়ে ফেলে তবে ছাড়ব।

মুখের 'না'—কথার সম্বন্ধে দৃক্‌পাত না করে দারোগা বলেন, কোথায় আছে দেখিয়ে দাও।

বসন্ত খিঁচিয়ে ওঠে: আসেনি মোটে, কাকে দেখাই? অন্য কোথায় গেছে, খোঁজ করগে।

বলছে, আর আঙুল তোলে ওদিকে—চিরকালের শত্রুতা, আঙুল দিয়ে ইসারায় দেখাচ্ছে আদিত্যকে। ও হরি! গাছ তো নয়—দেখিয়ে দিল পোয়ালগাদার নিচেটা।

বড্ড হাসি পাচ্ছে আদিত্যর—শব্দ করে হেসে না ফেলেন! নেমে আসি আগে বসন্ত—যে-হাতে পোয়াল-গাদা দেখিয়ে দিলে, রুপোয় বাঁধিয়ে দেবো ওই গোটা হাতখানা।

মাচা বানিয়ে মাঝখানটায় লম্বা বাঁশ পুঁতে সেই বাঁশে জড়িয়ে জড়িয়ে পোয়ালের গাদা দেয়। দারোগা আবও নিশ্চিত হবার জন্য জিজ্ঞাসা করেন, মাচার তলে তো বটে?

বসন্ত বেওয়া নিচু হয়ে জায়গাটা ভাল কবে দেখিয়ে দিল। গুঁড়িকচু ও কচুড়ির জঙ্গল। চৌকিদাব একজন নীল-পাগড়ি খুলে রেখে মাচার তলে ঢুকে যায়।

ক্ষণ পরে—ওরে বাবা, ওরে বাবা!

অত্যন্ত নিচু মাচা, আর চৌকিদার লোকটার গতরখানাও নিন্দের নয়। দারোগার হুকুম পেয়ে, এবং আদিত্যকে হাতে-নাতে ধরবার গৌরবের আশায় ঢুকে পড়েছিল উত্তেজনার বশে। বেরিয়ে আসবার জন্য এখন ঠেলাঠেলি করছে—কচুবন দলে-মলে একাকার। কী বিপদ হল—গোঁ-গোঁ করছে নিদারুণভাবে।

দুই কনেস্টবল দারোগার হুকুমে চৌকিদারের দু-ঠ্যাং ধরে টানছে। বেরোয় না সহজে। ভুঁড়ি আটকে গেছে বোধহয় মাচার বাঁশে। টান্, জোরে টান দে। পাড়াগাঁয়ে পাঁঠা মেরে দুই মরদে দু-দিক

থেকে টেনে ছাল ছাড়ায়, সেই গতিক। টানের চোটে হুড়াস করে এক সময়ে বেরিয়ে এলো চৌকিদার। মাচার নিচে ভুঁড়ির কতটা কি রয়ে গেল—ভাল করে একবার তাকিয়ে দেখবে, সে ফুরসত হল না।

বোলতার চাক পোয়ালগাদার নিচে। চাকে নাড়া লেগে বোলতা ক্ষেপে গেছে, চৌকিদারকে কামড়েছে এতক্ষণ। এমনিই মোটা মানুষ, তার উপর বোলতার কামড়ে ফুলে উঠে অঙ্গের আয়তন ডবল হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুখ ফুলে ফুটবলের মতন, তার মধ্যে চোখ দুটো একেবারে অদৃশ্য।

চৌকিদার বেরোল তো বোলতার ঝাঁক বাইরের নতুন নতুন শিকার দেখে সেই দিকে ওড়ে। বড়দারোগা পলকের মধ্যে কিড়িং-কিড়িং করে সাইকেল চালিয়ে দিলেন। পিছনে দৌড়চ্ছে কনেস্টবলরা। আর দেখা গেল, বসন্ত [illegible]যা পরনের থান-কাপড়টা মুড়িসুড়ি দিয়ে দাওয়ায় বসে পড়েছে। বোলতায় মানুষ বলে ঠাহর করতে পারেনি, অন্য কোন বস্তু ভেবেছে—চতুর্দিকে উড়ে উড়ে অবশেষে চাকে ফিরে গেল। চৌকিদার গড়াতে গড়াতে কোন রকমে রাস্তায় গিয়ে পড়তে এক চলতি গরুর-গাড়ি তুলে নিয়ে চলল তার বাড়ির দিকে।

গাছে বসে আদিত্য দেখছেন এতক্ষণ। হাঙ্গামা চুকে গেলে নেমে পড়লেন। বসন্ত গালে হাত দিয়ে বলে, ওমা, সওয়ারবাবু যে গাছের মাথায়! আমি জানব কী করে? চৌকিদার বেটা অকারণ নাজেহাল হল।

তোমার চোখের উপর দিয়েই তো উঠে গেলাম বসন্ত—

দেখলে না ধরিয়ে ছাড়ি? মাঝ-রাত্তিরে এসে গোলমাল কর—হায় হায়, আজকে বড় কায়দায় পেয়েছিলাম গো!

হাসে বসন্ত, আর নিজের গাল চড়ায়। মস্করা চলত খানিকক্ষণ ধরে। কিন্তু এক সাগরেদ দুঃসংবাদ নিয়ে এলো, পোলের ওপারে জিওলগাছে ঘোড়া বেঁধে রেখে এসেছিলেন—ঘোড়া নিখোঁজ। আশ্চর্য ব্যাপার, নতুন-হাটের একেবারে সামনে—দোকানদারদের

কারও নজরে পড়ল না? সে যা-ই হোক, যাবে কোথা আদিত্যর ঘোড়া নিয়ে? পৃথিবীর অন্য প্রান্তে নিয়ে ফেললেও ঘোড়া ঠিক মনিব চিনে চলে আসবে।

পরদিন সারাবেলা গড়িয়ে যায়, ঘোড়ার খবর নেই। আদিত্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তারপরে কানে এল, ক্রোশ-দুই দূরে রাস্তার ধারে ঘোড়া আধমরা অবস্থায় পড়ে আছে। পায়ে হাঁটেন না আদিত্য, কিন্তু আজ এই দু-ক্রোশ পথ ছুটতে ছুটতে কেমন করে এলেন, কিছু তাঁর ধারণায় আসে না।

তিন-চারজনে ধরে খাড়া করে দিলেও ঘোড়া পড়ে যায়। সামনের পা-দুটো ফোলা। নিশ্চয় পিটিয়ে ভেঙে দিয়েছে, নয় তো ঠিক এক জায়গায় হাঁটুর মালার উপরটা ভাঙা হবে কেন? আদিত্যকে কায়দায় না পেয়ে মুখুজ্জেরা আদিত্যর ঘোড়া মেরে জব্দ করেছে।

এমন কঠিন মানুষ, কিন্তু সেই পথের ধূলামাটির উপর বসে পড়ে আদিত্য হাউ-হাউ করে কাঁদছেন। ছেলে মরলে লোকে এমন করে কাঁদে না। মনোহর রায়ের কাছে খবর চলে গেছে। সেই রাত্রেই লোকজন নিয়ে পাল্কি চড়ে তিনি রাস্তার উপর চলে এলেন। পিঠে হাত দিয়ে আদিত্যকে প্রবোধ দিচ্ছেন: কান্নাকাটি কেন—ঘোড়ার কি চিকিচ্ছে নেই? চিকিচ্ছে না-ও যদি হয়, সাহেববাড়ির ঘোড়া এনে দেবো কলকাতা থেকে। এর চেয়ে অনেক ভাল ঘোড়া। দশের মুকাবেলা এই বলে যাচ্ছি।

আদিত্য মানুষটাকে হাতে রাখতেই হবে—তার জন্য যা করতে হয়, মনোহর করবেন। খোঁড়া ঘোড়া কিছুতে ভাল হল না। তখন সত্যিই মনোহর এক ঘোড়া কিনে দিলেন। কলকাতার সাহেববাড়ির নয় যদিচ, তবু ভাল ঘোড়া। যেমন চেহারা, তেমন চাল।

মনের খুঁতখুঁতানি নিয়ে আদিত্য ঘোড়ায় চাপলেন। কী যেন এক বিপদসঙ্কুল যানে চেপেছেন—নিশ্চিন্ত হয়ে আয়েশ করে বসতে পারেন না। তার পরে যা কেউ ভাবতে পারে না—ঘোড়ার পিঠ থেকে

পড়ে গেলেন তিনি একদিন। আর এমনি হুষমন জীব—জোড়া-ক্ষুরে লাথির পর লাথি ঝাড়ছে ভূমিশায়ী আদিত্যর উপর। আগাপাস্তলা আচ্ছা করে চাবকে আদিত্যে দূর করে দিলেন মনোহরের ঘোড়া।

ঘোড়ায় চড়ার ইতি সেইদিন থেকে। নেংচে নেংচে যতটুকু পারেন হেঁটে বেড়াতেন—বুড়ো হয়ে গিয়ে তা-ও আর পারেন না। এক জায়গায় বসে থাকেন।

নতুন-হাট ক্রমশ জমে উঠল, মুজগন্নির সায়েরের ভগ্নদশা। তারও অনেক পরে দেশ ভেঙে তো আপনারা হিন্দুস্থান-পাকিস্তান করলেন। কে কোনদিকে ছিটকে পড়ল, নিশানা নেই। খোঁড়া আদিত্য বড্ড বুড়ো হয়ে গেছেন, চোখেও ঝাপসা দেখছেন ইদানীং। সুশীলা-বউ ও একমাত্র ছেলে রাজ্যেশ্বর হিন্দুস্থানে। বাসের কণ্ডাক্টরি চাকরিও না৷ক পেয়েছে রাজ্যেশ্বর। রাজ্যেশ্বর কত টানাটানি করল: চলো বাবা, যা-হোক করে চলে যাবে। এখানে কে দেখবে তোমায়? বেঘোরে পড়ে মরবে।

হত ঠিক তাই, গোঁ ধরে ভিটাবাড়িতে পড়ে থাকবার মজা টের পেতেন আদিত্য। কিন্তু কপাল একদিক দিয়ে ভাল। সকলের দেখাদেখি বসন্তও ওপারে চলে গিয়েছিল—'বাপ' 'বাপ' বলে ফিরে এলো। বলে, দূর! যত ভিখারির মরণ—এটা দাও, ওটা দাও, হাত পেতেই আছে। মুখে ঝাড়ু মারি, যারা হিন্দুস্থানের সুখ খেতে যাচ্ছে।

শিয়ালদহ স্টেশনে ছিল বসন্ত একটা রাত্রি। তাই যথেষ্ট। পাগল হয়ে ছুটে বেরোল। অথচ কত মানুষ মজা করে স্টেশনে পড়ে ছিল এই সেদিন অবধি। বসন্ত বেওয়া পারল না। মুজগন্নির একজন কলকাতায় অনেকদিন ধরে আছেন—তিনি এক বাড়িতে রান্নার কাজ জুটিয়ে দিলেন। বাসনপত্র ভেঙে কাজে ইস্তফা দিয়ে বেরোল সেখান থেকে। ঠোঙার কাজ জুটল—ঠোঙা কী বাঁধবে, কাগজ ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভাঁজ করে কেবল। তাই দেখা গেল,

দুটো এই একই ধাঁচের মানুষ—আদিত্য আর বসন্ত বেওয়া—নিজের জায়গায় পড়ে তাদের যত জোর। শিশু হয়ে জন্মানো থেকে বুড়ো হয়ে মরণ অবধি। অন্যত্র একেবারে অকর্মণ্য।

বসন্ত বেওয়া ফিরে আসায় আদিত্য ভারি খুশি। দু-জনে মনের কথা হয়। আদিত্য বলেন, আমি আগেই বুঝেছিলাম। সেইজন্য গেলাম না। এ জায়গায়, যতই হোক, সওয়ারবাবু আমি। হিন্দুস্থানে কে চেনে—কোন্ খাতিরটা আমার সেখানে?

ওবছর গাঁয়ে এসে খাতিরটা স্বচক্ষে দেখেছিলাম। সবাই মানা করে: উনি হলেন গিয়ে কাঁঠালেব আঠা। নিদেন পক্ষে একটি বেলা না কাটিয়ে উঠতে পারবে না। সেই ভয়ে কেউ ওমুখো হয় না।

কিন্তু যে যাই বলুক—গাঁয়ে যখন এসেছি, আদিত্যদাকে একটিবার চোখের দেখা না দেখে যাই কেমন করে?

ঘরের কানাচে বাদামগাছ। বাদাম-পাতা পড়ে পড়ে তলায় বিঘতের উপর পুরু হয়েছে। যাচ্ছি—পাতা খড-মড় করে, পায়ে পায়ে পাতা ছিটকে যায়।

কে যায়? কে? কে তুমি?

বসন্ত বেওয়া আমার কথা বলে দিয়েছে। পরম আগ্রহে আদিত্যদা ডাকছেন: তুমি? এসো, এসো। ঘোড়ায় তো এলে, বুঝতে পেরেছি।

ছেলেবয়সে যখন গ্রামে থাকতাম, ঘোড়ায় চড়ার একটু-আধটু পাঠ নিয়েছি আদিত্যদা'র কাছে। কতকাল কেটে গেছে, কলকাতার বাসিন্দা আমি। ঘোড়া আমায় কে দেবে, আর শহরের উপর চড়ে বেড়াচ্ছি বা কোথায়? অতিরিক্ত বুড়ো হয়ে আদিত্যদা'র স্মৃতিবিভ্রম ঘটেছে।

বসন্ত প্রাণপণে ইসারা করছে। অর্থাৎ, মেনে নাও যা বলছে। আদিত্যদা বললেন, ভাল জাতের ঘোড়া। চোখে না দেখি, চলন শুনে টের পেয়েছি।

টের তো পাবেনই। দেখিনি সে-আমলে? ঘোড়া যেন কথা বলত আপনার সঙ্গে।

জবাব শুনে আদিত্যদা বড় প্রসন্ন। বসন্তকে বলেন, কষ্ট করে এলো,জলটল কিছু খেতে দাও—

দিচ্ছি।

কি দেবে শুনি? কি আছে তোমার ঘরে?

বসন্ত বলে যায়, অনেক আছে। চিঁড়ে-দুধ সবরিকলা পাটালি—

সত্যিই ক্ষিধে পেয়েছিল আমার। পাড়াগাঁয়ে শৈশবে খেতাম এই সব। নাম শুনে প্রলুব্ধ হয়েছি। বসন্ত উঠল তো জলযোগ করতে আমিও পিছু পিছু চললাম।

দাওয়া থেকে নেমে গিয়ে বসন্ত ফিস-ফিস করে বলে, গাছের ডাব খেয়ে যাও একটা। আর কিছু নেই। সওয়ারবাবুকে তুমি কিছু বোলো না কিন্তু। খবরদার!

ডাব কাটতে কাটতে আবার বলে, বউ-ছেলে বুড়োমানুষটাকে ছেড়ে বেরোল। আমি পারিনে—দশ দুয়োরে ভাড়া ভেনে দু-জনের পেট চালাই। আর ওই যে ঘোড়ার বাতিক—বাড়ির চতুর্দিকে কেবলই যেন লোকে ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াচ্ছে। বাতাসে বাদামপাতা পড়ে, আর দিন-রাত একশ'বার চেঁচানি: কে যায়? কে যায়? বাতিক বড্ড বেড়েছে, বাঁচবে না আর বেশি দিন।

নিশ্বাস ফেলে বসন্ত চুপ করল।

গল্প চলল আদিত্যদা'র সঙ্গে। ওরা মিছে ভয় দেখায়নি—একই গল্প ইনিয়ে-বিনিয়ে পঞ্চাশবার বলছেন। কী করি, শুনতে হচ্ছে বসে বসে।

বলছেন, চোখে ছানি পড়েছে। আসছে শীতে ছানি কাটাব। আর রাজ্যেশ্বরকে লিখে দেবো—এমনি খরচা কিছুই চাচ্ছিনে, শুধু একটা ঘোড়া কিনে দে। চোখ ভাল হয়ে গেলে ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াব। আমি আর কিছু চাইনে।

॥ তেত্রিশ ॥

কালকাসুন্দে আর হেড়াঞ্চির জঙ্গল, চাবপোতায় উচু উচু ভিটে। মিত্তিরমশায়দের ভদ্রাসন এটা। দুই ভাই উদয়নাথ মিত্তির আর হৃদয়নাথ মিত্তির—কাজকর্মে দুজনেই বাইরে থাকতেন। ভিটেয় সন্ধ্যো দেখাবার জন্য বিধবা বড়বোন মোহিনী ছিলেন, হৃদয় তাঁর নামে তিন টাকা কবে পাঠাতেন মাসে মাসে।

উদয়নাথের মেয়ের বিয়ে ঠিক হল এই সময়। পাত্র আমাদেরই পাড়ার ভূষণচন্দ্র ঘোষ। পাত্র হিসাবে ভূষণদা আহা-মরি কিছু নন। তবে বংশটা ভাল, মধ্যাংশ-কুলীন। কাঠের কাজ করেন—সাদা কথায় যাব নাম ছুতোবগিরি। এব উপরে ছোটখাট একটু দোকানও আছে বাড়িতে।

উদয়নাথের মেয়ে পাঁচ-পাঁচটা—সবে এই পয়লা নম্বরে হাত পড়ল। হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি করেন অনেক দূরের এক চাষী-প্রধান গাঁয়ে। রোগি দেখে সিকিটা আধুলিটাব বেশি মেলে না। তবে ঘর বেঁধে দিয়েছে তারা—ডাক্তারবাবু যাতে মেয়েছেলে নিয়ে থাকতে পারেন। বাজারের উপব একটু ডাক্তারখানাব বন্দোবস্তও করে দিয়েছে। কলা মূলো যাব বাড়ি যা ফলে, ডাক্তারবাবুকে একটা-দুটো খেতে দিয়ে যায়। নতুন ধান গোলায় তুলবার মুখে, যার যেমন ক্ষমতা, ধানও দিয়ে যায় দু-এক খুঁচি করে। এমনি করে চলে যায় কোনরকমে। এ হেন লোকের জামাই হতে কি আর রাজাবাহাদুর নবীনকণ্ঠ গলায় মালা ঝুলিয়ে এসে বসবেন! ভূষণ ঘোষই বেশ ভাল।

বিয়ের দু-হপ্তা আগে দুখানা গরুর-গাড়ি করে উদয়নাথেরা সবসুদ্ধ এসে পড়লেন। তার কয়েক দিন পরে ছোটভাই হৃদয়নাথ।

অল্প বয়সে সংসার গত হবার পরে হৃদয় আর বিয়েথাওয়া করেন নি। এই কারণে হাতে-গাঁটে দু-পয়সা হয়েছে, শোনা যায়। মিত্তিরবাড়ি এমনই বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখেন মোহিনী। উঠানে সিঁদুরটুকু পড়লে তুলে নেওয়া যায়। হৃদয় এসে পড়ে বাড়ির সীমানার মধ্যে ঘাসের অঙ্কুরটুকু থাকতে দিলেন না। তিন-চারটে অস্থায়ী ঘর উঠে গেল এদিকে-সেদিকে। ঘর আর কি—লাউ-কুমড়োর মাচার মতো ক'খানা বাঁশের খুঁটির উপর আচ্ছাদন এক-একটা। কাঁচা তালপাতার ছাউনি। এইসব ঘরেব কোনটায় ভোজের রসুইবাস ও লুচিভাজা হবে। কোনটায় বেহারা-বাজনদারেব আস্তানা। কাজের বাড়ি আত্মীয়কুটুম্বর কথা ছেড়ে দিন—আজেবাজে লোকেব জন্যই বা কত জায়গার দরকার। একলা বিধবা মানুষ গাঁয়ের এক কোণে পড়ে থাকতেন, উঁকি দিয়েও দেখতে আসত না কেউ, আজকে মানুষজনে গমগম করছে সেই মিত্তিরবাড়ি।

আমাদের পাড়ায় ভূষণদা'ব বাড়িতেও ঠিক অমনি। চলুন এগিয়ে, সে বাড়িও দেখবেন। উদয়নাথ এসে পড়ার পর থেকে ভূষণদা আর কাজকর্মে বেরোননি। যতই হোক বিয়ের বরপাত্তর—খাটনির কাজ এই অবস্থায় চলে না। ছোট গ্রাম ডোঙাঘাটা—এপাড়া-ওপাড়ায় দূর কিছু নয়। বরের বাড়ি থেকে চেঁচিয়ে ডাক দিলে মিত্তির-বাড়ির লোক শুনতে পাবে। তা হলেও পাল্কির ব্যবস্থা -পাল্কি চড়ে বর বিয়েবাড়ি যাবে। পাল্কির সঙ্গে বরযাত্রীরা। ঢোল-কাঁসি-শানাই। চরকিবাজি হাউইবাজি পুড়বে, গেঁটে-বন্দুক দুড়ুম-দাড়াম আওয়াজ করবে। বিয়ের ব্যাপারে ঠিক যেমনটি হতে হয়। মায়ের এক ছেলে হলেন ভূষণ ঘোষ—মায়ের সেই রকম ইচ্ছে। আর কুলোকে বলে, ভূষণের নিজের ইচ্ছে ষোলআনার উপর আঠারআনা—মায়ের নাম করে বলে বেড়াচ্ছে। অন্যায় কিছু নয়। বর হওয়া জীবনে এই তো একবার। (একাধিক-বারও হয় কেউ কেউ। পাড়াগাঁয়ের কথায় আছে—ভাগ্যবানের বউ মরে, অভাগার ঘোড়া মরে। ঘোড়া

মরলে মোটা টাকা ব্যয় করে নতুন ঘোড়া কিনতে হবে, নয়তো জলকাদার পথে খোঁড়া হয়ে বসে থাকুন। আর, বউ মরল তো মজাসে মাথায় টোপর চড়িয়ে বরপাত্তর সেজে পণের বাবদ নগদ টাকা বাজিয়ে নিয়ে নতুন-বউ ঘরে এনে তোলা। কিন্তু দুই নম্বরের এই মজা ক'টা লোকের ভাগ্যে ঘটে বলুন!) অতএব একদিনের নবাবিয়ানায় তিলেক প্রমাণ খুঁত থাকতে দেবেন না ভূষণদা।

বড্ড কাছের বিয়েবাড়ি—বেহারারা পাল্কি কাঁধে তুলতে না তুলতেই তো পেঁাছে যাবে। পাল্কি চলে তাই উল্টোদিকে গড়-ভাঙা হাটে, সেখান থেকে সাতনলার খাল অবধি। তিনটে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে ঘণ্টাখানেক পরে বিয়েবাড়ি পেঁাছবে।

ও-হো—এ-হে—ডাক ছেড়ে চলেছে বেহারারা। লহমার তরে মুখ বন্ধ করবে না, এই রকম চুক্তি। কপালে চন্দনেব ফোঁটা ভূষণচন্দ্র ঘোষের, পরনে চেলির জোড়। পাল্কির মধ্যে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে তিনি সর্দার-বেহারার উপব হাঁক দিয়ে উঠছেন: মিইয়ে যাচ্ছ কেন পাঁচু সর্দার, হল কি তোমাদের?

চেঁচিয়ে গলা ফাটাক বেহারারা, পথে পথে ভিড় জমুক। এই তিনটে গাঁয়ের লোক যে-ভূষণকে বাইশ ধরে কাঠ কোপাতে আব তক্তায় রেঁদা ঘষতে দেখে, বর হয়ে তার বাহারখানা দেখে নিক আজকের দিনে।

শুধু বর কেন, দেখবার বস্তু বরযাত্রীরাও। ধামা কাঁধে নিয়ে কেরোসিনের বোতল হাতে ঝুলিয়ে এই পথে সকলে হাট করতে যায়। হয়তো বা পথের ধারে বসে পড়ল কারো কলকে থেকে দু-টান টেনে যাবার আশায়। তারাই সব আজকে দেখুন, ফুলকোঁচা-দেওয়া কাপড় পরে গায়ে পিরান সেঁটে মাথায় টেড়ি ফুলিয়ে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে জুতা পায়ে ভদ্র হয়ে চলেছে। গৃহস্থবাড়ির মেয়ে-বউ অবধি বেরিয়ে হুড়কোর ধারে এসে অবাক হয়ে দেখে।

বরের সঙ্গে সঙ্গে জেঠামশায় আমারও হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন।

বেশি দূর নয়, হরিতলা অবধি। তার বেশি ছেলেমানুষ হাঁটতে পারব কেন? হরিতলা থেকে সোজা বিয়েবাড়ি। বাইরের মানুষ তেমন কেউ নেই এখন। ছোট্ট গাঁয়ের গোনাগণতি মানুষগুলো বরযাত্রীর দলে ভিড়ে চক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছে। ফিরে এসে কতক আবার কন্যাযাত্রী হয়ে এবাড়ির খাটাখাটনি করবে।

উদয়নাথ কী কাজে ছিলেন। জিভ বাড়িয়ে ঠোঁট চেটে নেওয়া তাঁর মুদ্রাদোষ, এবং কাঁচা-পাকা দাড়িতে হাত বুলানো। কাজ ফেলে ঠোঁট চাটতে চাটতে হন্তদন্ত হয়ে জেঠামশায়কে আহ্বান জানালেন: আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক গরিবের বাড়ি। তামাক দে রে। বসুন, পান নিয়ে আসি—

হবে এখন, ব্যস্ত কিসের?

তার আগেই উদয়নাথ সরে গেছেন। দ্রুত-পায়ে ঘরে ঢুকে গেলেন। বাড়ির একপাশে দোচালা ঘরখানা। গেছেন তো গেছেনই, বেরোবার নাম নেই। জেঠামশায় তীক্ষ্ণ-চোখে তাকাচ্ছেন। ঘরটা যেন এই বিয়েবাড়ির ভিতরেই নয়। যাবতীয় কাজের লোকজন ভিন্ন দিকে, হৈ-হৈ করে কাজকর্ম চলেছে। তিন-চারটে সরার খোলে তুষ-কেরোসিন জ্বেলে দিনমান সেদিকটা। আর এই দোচালা-ঘরে প্রদীপ আছে বোধহয় একটা—কাচনির বেড়ার ফাঁক দিয়ে মিটিমিটি একটু আলো দেখা যায়।

উদয়নাথ হঠাৎ একবার ঘর থেকে বেরিয়ে ভাঁড়ারে গিয়ে পান এনে দিলেন। দিয়েই আবার উধাও। নিমন্ত্রতেরা এবার আসতে লেগেছেন, হৃদয় তাঁদের আসুন-বসুন করছেন। সাড়া পেয়ে উদয়নাথ ছুটে বেরিয়ে আসেন, দু-এক কথা বলে ঘরে ঢুকে যান আবার।

এসে গেল বরের পাল্কি। সোরগোল পড়েছে। ভূষণদা'কে ধরে নিয়ে বরাসনে বসিয়ে দিল। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে আছি ভূষণদা'র মুখে। চেহারাই যেন আলাদা—কথা বলতে ভরসা হচ্ছে না।

জেঠামশায় গ্রামের জ্যেষ্ঠ, এবং ভূষণদার জ্ঞাতিও বটে। পাকেপ্রকারে তাঁকেই একরকম বরকর্তা হতে হল। বিয়েথাওয়া চুকে গেল যথাবিধি। বর-কনে ঘরে গিয়ে উঠেছে। এইবার—এইবার!

দিনমানে চার-পাঁচ বাব বিয়েবাড়ি উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছি। বড বড় কাতলামাছ দরমার উপর ফেলে নারকেলের মালা ঘষে আঁশ ছাড়াচ্ছে। আর একবার দেখলাম, গামলা ভবতি সন্দেশ নিয়ে এলো —সন্দেশ গোল গোল করে পাকাচ্ছে দু-তিন জনে। কখন সন্ধ্যে হবে, বিয়েবাড়ি এসে জাপটে বসব—দিনমান কাটতে চাচ্ছিল না যেন কিছুতে। এতক্ষণে সুবর্ণক্ষণ সমাগত।

ঠিক সেই মুখে জেঠামশায় উঠে পড়ে আমাব হাত ধবে টানলেন: বাড়ি চল্—

ভাল রে ভাল! উঠান ঝাঁটপাট দেওয়া হযে গেছে। আঁটি আঁটি কলাপাতা এনে ফেলছে। পাতা হবে এইবার। সেই দিকে না গিয়ে জেঠামশায় বাইরের পথে টেনে নিয়ে চললেন: বিয়েথাওয়া চুকে গেল, বাড়ি চল্ এবারে।

চোখে জল আসবার মতো, তা হলেও টানের চোটে যেতে হয় গুটিগুটি। একটা থমথমে ভাব চতুর্দিকে। উদয়নাথেব কাছে খবর চলে গেছে। সেই দোচালা-ঘরের ভিতর থেকে পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে জেঠামশায়ের পথ আটকালেন: কী ঘাঁট হয়েছে বলুন বেহাই। বাড়ি থেকে অভুক্ত চলে যাবেন, সেটা কিছুতেই হবে না।

উদ্বেগে ঘন ঘন ঠোঁট চাটছেন, দাড়ি থেকে হাত আর তোলেন না।

জেঠামশায় বলেন, বড্ড দেমাক তোমার উদয়নাথ। গাঁয়ের উপর বাস করতে এসেছ, একটিবার কারও কাছে গেলে না। বিনি-নেমন্তন্নে কে তোমার বাড়ি খেতে যাবে? সরো, পথ দাও—

নতুন কুটুম্বিতা সত্ত্বেও জেঠামশায় তাঁকে বেহাই বলে সম্বোধন করলেন না।

সকাতরে উদয়নাথ বলেন, মুরুব্বি মানুষ, কত কাজকর্ম করে এলেন এ যাবৎ—আপনাকে বলতে গেলে ছোট-মুখে বড় কথার মতো শোনায়। নেমন্তন্নর ব্যাপার আজ তো নয়। আজকে আপনারা বরযাত্রী, বরপক্ষের নেমন্তন্নে পায়ের ধুলো দিয়েছেন। আমাদের নেমন্তন্ন কাল বাসিবিয়ের ভোজে। জোড়হাতে জনে জনের কাছে বলে আসব। ধরুন, এক গ্রাম না হয়ে ভিন্ন জায়গা থেকেই যদি বর আসত—

জেঠামশায় শেষ করতে দেন না, নিয়মের ফাঁক ধরে ফেলেছেন: ভিন্ন জায়গা নয় বলেই তো! ছোট্ট একটুখানি গাঁয়ের ব্যাপার—কে বরযাত্রী আর কে কন্যাযাত্রী তুমিই বা সেটা মালুম পাচ্ছ কিসে? আমার কথাই ধরো। সম্পর্কে ভূষণের জেঠা হই বটে, কিন্তু হিসেব করলে তোমার সঙ্গেও কি একটা-কিছু বেরোবে না? বলি, উদয়নাথ গাঁয়ে-ঘরে থাকে না, কন্যাদায়টা ওর কাটিয়ে দিয়ে আসি। কন্যাযাত্রীই আমি—দেখলে না, বরের পিছন ধরে না এসে সোজাসুজি চলে এলাম। তা শুভকর্ম চুকেবুকে গেল—রাত হয়েছে, বাড়ি চলে যাই এবার।

যুক্তিতে উদয়নাথকে ধূলিসাৎ করে আত্মপ্রসাদে ডগমগে হয়ে জেঠামশায় চতুর্দিকে মুখ ঘুরিয়ে হাঁক দিয়ে উঠলেন: কে কে যাচ্ছ আমার সঙ্গে, উঠে এসো—

পনের-বিশ জন উঠে দাঁড়াল। তুমুল ব্যাপার। জেঠামশায় বুঝিয়ে দেবার পর হৃদয়ঙ্গম হয়েছে, উদয়নাথ কী অপমানটা করেছেন তাদের সকলের। উদয়নাথের পক্ষে শুধু তাঁর বাড়ির লোকজন এবং একটি-দুটি নিকট-আত্মীয়। এবং এই আমরা ছেলেপুলের দল। আমাদের মনের কথা—অপমান করে থাকেন তো পাল্লাপাল্লি দিয়ে বেশি করে খেয়ে মিত্তিরমশায়কে জব্দ করে যাব।

সবাই দুষছে উদয়নাথকে: সত্যিই তো! বাসিবিয়ের জন্য মুলতুবি না রেখে বাড়ি বাড়ি তোমার বলে আসা উচিত ছিল। একই লোক বরযাত্রী কন্যাযাত্রী দুই-ই যদি হয়, তাতে কী লোকসান? পাতা তো একখানার বেশি দু-খানা নিয়ে বসত না কেউ।

উদয়নাথ জেঠামশায়ের হাত জড়িয়ে ধরলেন : গ্রামের মাথা আপনি—প্রবীণ, বিচক্ষণ। দোষক্রটি আপনি যদি মাপ না করেন, কার কাছে যাব বলুন।

হাত ছেড়ে দিয়ে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। পা দুটো জড়িয়ে ধরতে যান—

এমনি সময় হৃদয় সেই দোচালা-ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ডাকলেন, দাদা, শিগগির এসো একবার।

উদয়নাথ কানে নেন না। কানাঘুষো শোনা গিয়েছিল, ছেলেব অসুখ। পাঁচ মেয়ের পব ওই একমাত্র ছেলে উদয়নাথের।

সুখময়-কাকা জিজ্ঞাসা করলেন, ঘরের মধ্যে কি উদয়নাথ ?

উদয়নাথ জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, কিছু নয়। খোকার জ্বরটা বেড়েছে একটু। মাথার নিচে মানকচুর পাতা দিয়ে জলের ধারানি করতে বলেছি—সেটা পারছে না ওরা, দেখিয়ে দিতে হবে।

তারপর আসল কথায় এলেন আবার। জেঠামশায়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রায় কান্নার সুরে বলেন, মাপ করলেন তো বেহাই ? পাতা করতে বলে দিই ?

জেঠামশায় চুপ করে রইলেন। চটপট পাতা করে ফেলেছে ইতিমধ্যে। জল-নুন-লেবু দেওয়া হয়ে গেল। কোমরে গামছা বেঁধে পরিবেশনের লোকেরা তৈরি। তাকিয়ে দেখে সকলে বলাবলি করে, যখন মাপ চাইলেন, একরকম পায়ে ধরে মাপ চাওয়া—এর উপবে আবার কি ! কন্যাদায় বলে ভদ্রলোককে ফাঁসি দিতে হবে নাকি ?

একে দুয়ে পাতায় বসে যাচ্ছে। জেঠামশায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছেন, আমি সতৃষ্ণনয়নে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে। সকলে বসে পড়েছে যখন, ভেবেচিন্তে তিনিও রায় দিলেন : বসিগে চল্।

খুব খাওয়াদাওয়া। রাগ করেছিলাম বলে খাতির যেন বেশি

আমাদের এই দলটার। সবাই তটস্থ। মাছ একখানা চাইলে একগণ্ডা দিয়ে যাচ্ছে। দইয়ের মাথা খেতে ভাল—হাঁড়ির সিকি আন্দাজ দেবার পর বলছে, তলানি দিসনে রে, নতুন হাঁড়ি নিয়ে আয়।

কিন্তু উদয়নাথ কোথায়? চাষাভুষোর গাঁয়ে থেকে ভদ্রতা-বোধ একেবারে লোপ পেয়ে গেছে। কর্মকর্তার এই সময়ে তো জোড়হাতে ঘুরে ঘুরে দেখাশোনা করা উচিত। হাত-পা ধরে সকলকে খেতে বসিয়ে দিয়ে কোথায় তিনি মুখ লুকিয়ে বসে রইলেন? ডাকো উদয়নাথকে। বাড়ির কর্তাকে সামনে এসে বিনয়-বচন বলতে হয়।

খোঁজই পাওয়া গেল না। খোঁজ হল, ভোজ সেরে যেইমাত্র সকলে পানের খিলি হাতে নিয়েছি। এবং বাসরে মেয়েদের হাসি-মস্করার মধ্যে বর-কনের যৌতুক-খেলা শুরু হয়েছে। দোচালা-ঘরের ভিতরে উদয়নাথের স্ত্রী আর্তনাদ করে উঠলেন। উদয়নাথ নিজে নাম শোনাচ্ছেন: হরেরাম হরেরাম, রাম রাম হরে হরে—

পাঁচ মেয়ের পরে ছেলে। একমাত্র বংশধর। নাম শোনাচ্ছেন কাকেই বা! অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে। উদয়নাথ হাঁটুর উপর মরা-ছেলে রেখে এতক্ষণ একনজরে তাকিয়ে ছিলেন—সামাজিক পংক্তি-ভোজন নির্বিঘ্নে সমাধা হল কিনা। আর উদয়নাথের স্ত্রী উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে পড়েছিলেন। এক একবার একটু নড়েচড়ে ওঠেন, গোঙানির মতন একটু বা আওয়াজ বেরিয়ে আসে—উদয়নাথ চাপা গলায় অমনি তাড়া দিয়ে ওঠেন: আঃ, কী হচ্ছে!

কালকাসুন্দে আর হেড়াঞ্চির জঙ্গল—আমি যেন উদয়নাথের বউয়ের গলা পাচ্ছি। মরা-ছেলের উপরে মুখ রেখে ডুকরে ডুকরে কাঁদছেন তিনি।

।। চৌত্রিশ ।।

ভূষণদা'ব বেলতলি-গাছ—এই গাছেব মগডাল থেকে তিনি পড়ে গেলেন। বয়স সত্তর। ও বয়সে—আপনার কথা জানিনে, নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি—অতদিন টি'কে থাকি তো দু-পাশে দুটি মানুষ লাগবে ধরে আমাকে দাঁড় কবিয়ে দিতে। আর সত্তর বছুরে ভূষণ ঘোষ কিনা ফনফন করে গাছের মাথায় উঠে গেলেন। ছেলে পুঁটিরাম আম কুড়িয়ে কুড়িয়ে ঝুড়ি ভরছে। ঝুড়ি কাঁধে আমতলা থেকেই কাটাখালির হাটে বেরিয়ে পড়বেন, ভূষণদার মতলব। আগেব দুটো হাটেও তাই করেছেন।

চৈত্রমাস, এখনো পাকা-আমের মরশুম আসেনি। কিন্তু বেলতলি-গাছের আম সময়ের আগে পাকে, বৈশাখ পড়তে না পড়তে শেষ। আম ফলেছে এবারে খুব, এবং অসময়ের বস্তু বলে দরও ভাল। সঙ্গে সঙ্গে ভূষণদা'র মাথায় আবাব এক নতুন কারবারের মতলব। ক্ষেতে পাটের অবস্থা দেখে' চাষীদের কিছু কিছু দাদন দিয়ে যাওয়া। তারপর ভাল মহাজন ধরে সেই পাট বাড়ি এনে তোলা, এবং দর উঠলে বিক্রি করে দেওয়া। পাটের কারবারে একটি বছরের মধ্যে,' শুধুমাত্র অবস্থা ফেরানো নয়—লাল হয়ে যাবেন একেবারে। যত ভাবেন, ততই ক্ষেপে যাচ্ছেন। দরের আম একটি যেন এদিক-ওদিক না হয়। গাছ থেকে নেমে নিজেও চতুর্দিক তন্নতন্ন করে খুঁজবেন—বলা যায় না, লোভের বশে পুঁটিরাম ছোঁড়াই হয়তো ঘাস-পাতার আড়ালে আম একটা সেরে রেখেছে।

বলেছিলেন ঠিক এই কথাই গেল-হাটের দিন: সেরেসুরে রাখিসনি তো, সত্যি করে বল্। মহাগুরু পিতার কাছে মিথ্যে করে বললে নরকে নিয়ে ঠাসবে। আবার মিষ্টিকথাও বললেন, 'অবস্থা ফিরিয়ে

নিই—আসছে-বছর যত ইচ্ছে খাস। আম খাওয়া যাচ্ছে কোথায় রে! টাকাকড়ি হলে একটি আমও আর বেচতে যাব না, দেদার খাবি। তোর মা আমসত্ত দেবে, কাঁচা-আমে কাসুন্দি করতে আমিই তখন পেড়ে এনে দেবো।

সেই হাটবারে বউদি অর্থাৎ ভূষণ-দা'র স্ত্রী আমতলায় এসে বললেন, বিনি খেতে চেয়েছে—একটা আম দিয়ে দাও। পোয়াতি বোন ছুদিনের তরে এসেছে, খাওয়ার লোভ হয় এ সময়টা।

স্বামীর মন ভেজানোর জন্য রসিকতাও করলেন একটু: দেখ, পোয়াতির লোভের জিনিস না দিলে বাচ্চার মুখে নাল ঝরবে, ভাগনে কোলে নিতে পারবে না তখন।

কিন্তু ভূষণদা অবস্থা ফিরিয়ে আপাতত লাল হবার তালে আছেন, ভাগনে কোলে নেবার সময় পরে। খিঁচিঁয়ে উঠলেন: আম জষ্ঠিতে খাবে, চোতমাসে অকালে আবদার কেন?

বউদি একটি আম ইতিমধ্যে ঝুড়ি থেকে তুলে নিয়েছেন। গাছ থেকে নেমে পড়ে চোখ পাকিয়ে ভূষণদা ছিনিয়ে নিলেন সেটা।

এসব হয়েছিল গেল-হাটবারের দিন। রাগ করে আজ বউদি তাকিয়েও দেখেন্ নি আমতলার দিকে। তলায় একমাত্র পুঁটিরাম। বউয়ের তোয়াক্কা ভূষণদা করেন না। আজ বলে নয়, চিরকাল এই রকম। বউদির যখন ভরভরন্ত যৌবন, তখনও। কিছু বেশি বয়সে ভূষণদার বিয়ে হয়—এই পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশে। বউদির বয়স এগার। সেই বউ আঠার-উনিশে পৌছলেন। আমরা তখন বালক। ভূষণদা ঘরের কাজ করে বেড়ান এ-গাঁয়ে সে-গাঁয়ে। কাজটাকে আমাদের গ্রাম্য কথায় বলে ঘরের জুত-দেওয়া; দালানকোঠার ব্যাপার হলে বলতেন ইঞ্জিনিয়ারিং। খন্তা ধরে খুঁটি পোঁতা থেকে চালের মটকায় উঠে রুয়ো বাঁধা—ঘরের ইঞ্জিনিয়ারকে সমস্ত করতে হয়। বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা।

সন্ধ্যার পর ভূষণদা আলাদা এক মানুষ। পালাগানের নামে

পাগল—ক্রোশ দুই-তিনের মধ্যে যেখানে গান হচ্ছে, ঠিক তিনি সেই আসরে গিয়ে হাজির। দুপুরের ভাতব্যঞ্জন ঢাকা থাকে। শীতকালে কড়োকড়ো ভাত, গরমকাল হলে জল ঢেলে পান্তা করা। দিনান্তে বাড়ি ফিরে পুকুরে কয়েকটা ডুব দিয়ে গায়ের ধুলোমাটি এবং সারাদিনের ক্লান্তি ধুয়েমুছে ভাত খেতে বসেন। খেয়েই বেরুলেন। শেষরাত্রে কখন ফেরেন, ঠিকঠিকানা নেই—ঘুম ভেঙে দোর খুলে দিতে বউদি'র কষ্ট, সেজন্য শো'ার ঘরে ভারী তালা এঁটে চাবি গাঁটে গুঁজে নিয়ে চললেন। বউদি ঘরের ভিতর আটকা রইলেন।

ছেলেমানুষ আমরা ভালছেলে হয়ে পড়া মুখস্থ করছি। হেরিকেনের চল হয়েছে—কিন্তু কেরোসিনের কড়া আলোয় নাকি চোখের দীপ্তি খাটো হয়, সেজন্য রেড়ির-তেলের দীপের ব্যবস্থা। কানের মধ্যে গান এসে ঢোকে, বিলের পথে ভূষণদা গান ধরেছেন। কোনদিন কীর্তনের সুর, কোনদিন বা রামপ্রসাদী। গানের আওয়াজে জায়গা ধরতে পারি। এইবারে মরগার উপর। মরগার পাশে ছিপ নিয়ে সন্ধ্যা অবধি আজই পুঁটিমাছ ধরে এসেছি। মরগা পার হয়ে নৈমদ্দি কবিরাজের পুকুরপাড়ে ভূষণদা। তারপরে খেজুরবনে। একবার অনেক রাত্রে ওই খেজুরবনে চুরি করে রস খেতে গিয়েছিলাম। বিলের বাতাসে পাতা নড়ার সাঁই-সাঁই শব্দ। বুক কেঁপে উঠেছিল শব্দ শুনে—চোর-ডাকাতরা মাথায় মাথা ঠেকিয়ে শলাপরামর্শ করছে যেন বিলের কিনারায়। খেজুরবন ছাড়ালেন ভূষণদা এইবার—তাহলে বাঁশতলায় গোরস্থানের পাশে। পাথরঘাটা গাঁয়ে ঢুকে পড়ে. গান বন্ধ হয়ে গেল। ঠিক বটে, জারিগান আজ পাথরঘাটার তারিপ ফকিরের বাড়ি। ভূষণদা যথারীতি আসরের একটা পাশ বেছে নিয়ে বসে পড়েছেন।

ভূষণদার গান একঝোঁক এই হয়ে গেল। আবার হবে শেষরাত্রে বাড়ি ফিরবার সময়। দুইবার মোটমাট, দুয়ের বেশি তিন কিছুতে হবে না। দিনমানে কিংবা লোকজনের সামনে ভূষণদা মুখ খোলেন

না, নির্জনে নৈশপথের সাথী হল গান। অন্ধকার গোরস্থানের পথে যখন গা ছমছম করে, কিংবা বর্ষার হাঁটু ভর কাদায় এক একখানা পা টেনে তুলতে যখন প্রাণ বেরিয়ে যায়, গান সেই সময়টা বুঝি তাঁর হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চলে। শেষরাত্রের গান কদাচিৎ পাতলা ঘুমের ভিতর শুনতে পাই—খেজুরবন, কবিরাজের-পুকুর, বড়-মরগা পার হয়ে গ্রামের মধ্যে পড়ে নিঃশব্দ হয়ে যায়। মা বলেন, ভূষণ ফিরল—রাত তবে আর নেই, উঠি এবার। অনতিপরেই উঠে পড়ে বাসি উঠান ঝাঁট-পাট দিতে লেগে গেলেন।

বাড়ি ফিরে ভূষণদা ঘরের তালা খুলে তক্তাপোশে গড়িয়ে পড়েন একটু। শোওয়া যা-কিছু ওই হয়ে গেল, ঘুমের ব্যাপার আগেই চুকিয়ে এসেছেন গানের আসরে। যেখানে পালাগান, মহাপ্রলয় হলেও ভূষণদা যাবেন চলে সেখানে। গিয়ে আসরের পাশে নিরিবিলি একটু ঠাঁই খুঁজে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুঁজবেন। ক্ষমতা ধরেন বটে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে বসে ঘুমানো, কোনদিকে এক-তিল টলবেন না। যখনই যে আসরে ভূষণদাকে দেখেছি, ধ্যানস্থ ঋষির মতো চোখ বুঁজে স্থির হয়ে আছেন। ক্ষণে ক্ষণে নাসাধ্বনি। শুয়ে পড়ে নয়, বসে ঘুমোনোয় তাঁর আরাম।

দোর খোলা পেয়েই বউদি ওদিকে ছুটে বেরিয়েছেন। উনুন ধরিয়ে তাড়াতাড়ি ফ্যানসা-ভাত রেঁধে দেবেন, খেয়ে নিয়ে ভূষণদা কাজে যাবেন। যেদিন যে বাড়ি কাজ, দুপুরের খাওয়া সেইখানে।

সমস্তটা দিন খেটে সাঁজবেলা ফিরবেন—না খাটলে অবস্থা ফিরবে কিসে? যখন একেবারে বালক, ভূষণদা'র বাপ ওলাওঠায় মারা গেলেন। অবস্থা ফিরিয়ে বড়লোক হবেন, নতুন দালানকোঠা হবে—তখন থেকেই মাথায় ঢুকেছে। জাত্যাংশে ভাল কুলীন—বাপের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে কৌলীন্যটুকুই পেলেন শুধু। সেইটে বেশ কাজে লেগে গেল। অবস্থাপন্ন বাড়ি বরযাত্রী গিয়েছেন, কন্যাকর্তা হয়তো দিলদরিয়া মানুষ—কুলীনের পুরো বিদায় গুঁজে দিলেন

ভূষণদা'র হাতে। বলেন, ছোট ছেলে তাই বলে বিদায় কেন কম হতে যাবে? বাচ্চা-কেউটে বলে বিষ কিছু কম থাকে নাকি?

পুরো টাকাটা মূলধন নিয়ে ভূষণদা দোকান দিলেন। অবস্থা ফেরাবেনই। কারও বাড়ি জ্বর—কী ধবনের জ্বর, তা-ও খোঁজ নিয়ে ছুটলেন সেই কেশবপুর গঞ্জ অবধি সাবু আমদানি করতে। জ্বরটা ম্যালেরিয়া, এ জ্বর একজনের উপর দিয়ে যায় না—অতএব একেবারে চার আনার সাবু। পাঁজিতে পূর্ণিমা-অমাবস্যা দেখে আটা-ময়দা এনে রাখেন দোকানে। গাঁয়ের মধ্যে নিশিপালন করবে কেউ না কেউ, তখন আটা-ময়দার খোঁজ পড়বে। অল্প পুঁজিতে এমনি ফন্দিফিকির খাটাতে হয়। ফলও তাই হাতে হাতে। ছ-মাস পরে ভূষণদা হিসাব করে দেখলেন, সেই এক টাকায় পাঁচ টাকাব মতো দাঁড়িয়েছে। তবে তো বছর পুরলে দশ টাকা, দু-বছবে বিশ টাকা। গুণ করে করে যান এমনি। অবস্থা ফিবতে আব ক'দিন!

হিসাব করতে করতে মাথা গবম হয়ে ওঠে। উঁহু, এত বছর ধবে হলে হবে না। দোকান তো রইলই, এ ছাড়া আবও কোন সংক্ষিপ্ত পথ। বিয়ে করবেন, ছেলেপুলে হয়ে সংসার বাড়বে- তালুকমুলুক দালানকোঠা তার আগে। কাঁঠালের ব্যবসা করলে কেমন হয় এই আষাঢ়মাসে? বাগানে বাগানে ঘুরে কাঁঠাল কেনা হল, সেই কাঁঠাল ডোঙা বোঝাই করে বিল-পারে নিয়ে ফেলা। বিল-পারের লোকেব কাঁঠালের নামে জিভে জল সরে, ভাল দাম দেয় তারা। কিন্তু কাজে নেমে দেখা গেল, বিল-পারেও চালাক মানুষ আছে, তারা এপারে এসে সস্তায় কাঁঠাল কিনে নিয়ে যায়। ভূষণদার কাঁঠাল পচে গোবর হবার দাখিল, দর নামিয়ে লোকসান করে দিতে হল শেষটা।

একেবারে বিনি-পুঁজির ব্যবসা পাঠশালা খুললেন একবার ভূষণদা। নিজের বুদ্ধিতে নয়, দশজনের কথায়। দত্তবাড়ির শশীপণ্ডিতের পাঠশালা অনেক দিনের—মাইনে নেন, অথচ বয়স হয়ে গিয়ে পণ্ডিতমশায় কিচ্ছু নাকি পড়ান না ইদানীং। ক্ষমতাই নেই। দ্বিতীয়

পাঠশালা নেই বলেই লোকে ওখানে ছেলে পাঠায়। ভূষণদা অতএব ঢেঁকিশালের ঢেঁকি তুলে দিয়ে পাঠশালা বসালেন। দোকানের চালাঘরের পাশে, খদ্দের এলে উঠে উঠে জিনিস দিয়ে আসেন। পাঠশালা তাড়াতাড়ি যাতে জমে, এক ধার দিয়ে হাফ-ফ্রী। এমন হল, জায়গা দেওয়া যায় না। পণ্ডিতমশায়ের পাঠশালা কানা।

একমাস যায়, দু-মাস যায়—অর্ধেক মাইনের সামান্য কয়েক আনা, তা-ও কেউ উপুড়-হস্ত করে না। বেশি তাগিদ দিলেন তো ছেলে পরের দিন থেকে ডুব। বলাবলি হচ্ছে, শোনা গেল—ভূষণটা কী-ই বা জানে, আর কী পড়াবে! ছেলেরা গিয়ে আবার পণ্ডিতমশায়ের পাঠশালায় ভর করছে। শশীপণ্ডিতও জো পেয়ে এক-হাত নিচ্ছেন : হাফ-ফ্রী করেছিল ভূষণ, পুরোপুরি ফ্রী করে দিক না। তাহলে আর ছাত্রাভাব হবে না।

বিঘে তিনেক ধান-জমি বন্ধক রেখে অতঃপর ভূষণদা কাপড়ের খাতা করলেন। আমরা ছোকরার দল পিছনে। বললাম, স্বদেশির দিনে অন্য সবাই বিলাতি কাপড় বেচে। আপনি দেশি কাপড় আনুন দেখি, খুব চলবে।

একটা কাজে লেগে গেলেন তো ভূষণদা তাই নিয়ে পাগল। খদ্দেরে বাড়ি বয়ে এসে দেশি কাপড় কিনবে, এতদূর সবুর সয় না। হাটের মধ্যে গিয়ে বসেন। মুরুব্বিমশায়রা বেজার : গাঁয়ের ভিতরে এবাড়ি-সেবাড়ি যা হোক হচ্ছিল, হাটেঘাটে গিয়ে এ কেমন কেলেঙ্কারি! ভূষণদা'কে কিছু বলতে হয় না, আমরাই গিয়ে পড়ি : বাবু হয়ে বাড়ি বসে থাকলে খেতে দেবেন আপনারা? সংসার বাড়ছে দিনকে দিন। বলুন, আপনারাই ওঁর সংসার চালাবেন।

মুরুব্বিরা বলেন, কুলীন কায়েতের ছেলে মাথায় মোট বয়ে হাটে হাটে কাপড় বিক্রি করে বেড়াবে, গ্রাম ধরে আমাদের সকলের মাথা হেঁট হচ্ছে।

আমরা বলি, হবে না। কাপড় বিক্রি তো নয়—স্বদেশি-কাপড়

বিক্রি। কেনা-বেচার ফাঁকে ফাঁকে হাটুরে-লোকের কাছে স্বদেশি-প্রচার।

কিন্তু প্রচার যতই হোক, হাটের লোক মোটা কাপড় নেড়েচেড়ে দরটা শুনে নিয়ে সরে পড়ে।

ভূষণদা'র রোখ চড়ে যায়ঃ নেবে না কী রকম। ধারে দেবো। এক পয়সাও দিতে হবে না এখন। পৌষমাসে শোধ করবে।

এবং মুখের কথা শুধু নয়, বাড়ির দাওয়ায় খুঁটির গায়ে লটকে দিলেন—'ধারে বিক্রয় হয়'। খদ্দের রে-রে করে এসে পড়ে। ধর্মপথের পথিক ভূষণদা, জুয়াচুরি-ফেরেব্বাজির ধার ধারেন না। খদ্দেরকে বুঝিয়ে বলেন, পৌষমাসে ধানচাল উঠলে তবে তোমরা দাম শোধ করবে—তার এখনো পাঁচ-ছ-মাস। টাকাটা এদ্দিন পড়ে থাকবে, তার একটা ব্যাজ আছে। সেইজন্য কাপড়েব জোড়া পিছু ছ-আনা চড়িয়ে দিচ্ছি।

খদ্দেরের কিছুমাত্র আপত্তি নেই। ছয়েব দুনো বারো আনা চড়িয়ে দিলেও আপত্তি হত না, স্বদেশি-জিনিসেব উপর এতখানি প্রেম।

পৌষমাস এল, গোলা-আউড়ি ধান-চালে ভরতি। কিন্তু হেঁটে হেঁটে ভূষণদা'র পায়ের নলি ছিঁড়ে যায়, সিকি পয়সা কেউ ধাব শোধ করে না। স্ফূর্তির কাল পৌষমাস—ঘবে ঘরে পালপার্বণ, পালাগান। কিন্তু অহরহ টাকার তাগিদে ঘুরে ঘুরে এমন হয়েছে, এক প্রহর রাত্রে বাড়ি ফিরে তখন আর ভূষণদা'র ইচ্ছে করে না, আবার উঠে কোন গানের আসরে গিয়ে বসেন। সত্যি সত্যি এমনি ব্যাপার চলল—গানের আসরে ভূষণদা নেই।

চরম হল, ভূষণদা পায়ে কাঁটা ফুটিয়ে ফিরলেন যেদিন। বিষাক্ত কাটা, রাতের মধ্যে পা ফুলে গোদ। টাটানি, আর সেই সঙ্গে জ্বর। শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হল দিন দশেক। এবং অটল ডাক্তারকে ডাকতে হল।

অটল ডাক্তারের ঘোড়া আছে, সাইকেল আছে। সদরে চৌরাস্তার

উপরে সম্প্রতি জমি কিনেছেন—শহরবাসী হবার মতলব পর্যন্ত মাথায় ঢুকেছে। এক শিশি জলের মধ্যে ফোঁটা কয়েক অষুধ ফেলেন—সে অষুধও চেহারায় ফটিক-জল। জল বিক্রি করে অটল এত বড় অবস্থা করে ফেলেছেন। সুস্থ হয়ে উঠে ভূষণদা এবারে ভাবছেন, ডাক্তার হলে কেমনটা হয়! খোঁজখবর নিয়েছেন, পুঁজি যৎসামান্য—তিন টাকা বারো আনা নিয়ে শুরু করে অটল ডাক্তারের আজ এত ঐশ্বর্য। এ হেন ব্যবসা এতদিন কেন যে মাথায় আসেনি, আশ্চর্য।

সমস্ত ঠিকঠাক, ভি.পি.-তে মাল পাঠাতে কলকাতায় চিঠি লেখা হয়ে গেছে। শৈল এসে বাদ সাধল। এক ঠিকেদারের হয়ে বর্মার জঙ্গলে কাঠ কেটে বেড়াত, লড়াইয়ের দুর্যোগে চাকরিবাকরি ছেড়ে বেকার হয়ে গাঁয়ে এসে উঠেছে। শৈল বলে, আপনি কেন ভূষণদা, ডাক্তার আমিই হব। করতে হবে তো একটা-কিছু—ওদিকটায় আপনি আর নজর দেবেন না।

চিরদিনের পরোপকারী মানুষ ভূষণ ঘোষ—ভাল ছাড়া কারও কখনো মন্দ করেন নি। রাজি হয়ে ভূষণদা বললেন, ভি পি. এসে পড়েছে, তুমিই তবে ওটা ছাড়িয়ে নাও।

মাপসই তক্তা কেটে তার উপরে নাম লিখে নিজেই ভূষণদা সাইনবোর্ড বানিয়ে দিলেন: ডাক্তার শৈলবিহারী মজুমদার।

মিজের কাপড়ের খাতার বেলা যেমন ধারা সাইনবোর্ড হয়েছিল।

শৈল প্রসন্নদৃষ্টিতে সাইনবোর্ড দেখে বলে, লেখা তো দিব্যি হল। কিন্তু রোগি? বিদেশে পড়ে ছিলাম—আমায় কে চেনে, রোগপীড়ায় আমায় কে ডাকতে যাবে?

সাইনবোর্ড লেখার ফলে রোগি জোটানোর দায়িত্বও ভূষণদা'র উপর বর্তেছে। হুঁ—বলে তিনি সায় দিলেন।

ইতিমধ্যে আরও এক জরুরি কাজ এসে পড়েছে। বড়লোক হবেন, তালুকমুলুক হবে, বাড়িতে দালানকোঠা দেবেন নতুন করে—শৈশব

থেকেই চেষ্টা, কিন্তু কোনটাই হয়ে ওঠেনি এ তাবৎ। তবে দালান-কোঠার ব্যাপারটা কিছুমাত্র কঠিন নয়। ঠিক সেই মতলব করেই ঘরের চালে খড় দেননি এবারে। সারা বর্ষাকালটা কী দুর্ভোগ—ঘরের মেজেয় সমুদ্দুর খেলেছে, একটুকু শুকনো জায়গার জন্য বউদি ঘরময় বিছানা টানাটানি করেছেন।

বর্ষা অন্তে ভূষণদা কাজে লেগে পড়লেন। পৈতৃক সেকেলে দালান ভেঙেচুরে জঙ্গল হয়ে আছে, সাপখোপের বাতান। ভূষণদা শাবল ধরে খুঁড়ে খুঁড়ে পুরানো ইট একধারে জড় করলেন। বড়ছেলে পুঁটিরাম বেশ কাজের হয়েছে, বাপে বেটায় খাটছেন। রাজমিস্ত্রি ডাকেন নি—কর্ণিক ধরে নিজ হাতে গাঁথতে শুরু করলেন। উঠানে গর্ত খুঁড়ে কাদা করেছেন, পুঁটিরাম ইট-কাদা বয়ে বয়ে যোগান দেয়। চুন-সুরকির স্পর্শ নেই কেবল ছাতটুকু ছাড়া—গাঁথনির মশলা শুধুমাত্র কাদা।

খানিকটা গাঁথা হয়ে যাবার পর দরজা-জানলা বসানোর দরকার হল। কড়িবরগা লাগবে আরও কিছু পরে। রাজমিস্ত্রির কাজ বন্ধ করে ছুতার-মিস্ত্রির কাজে লেগে পড়লেন ভূষণদা। কাঁঠালের কাঠের দরজা-জানলা, তালগাছের কড়ি-বরগা—বাগানের তালগাছ কাঁঠালগাছ করাতি দিয়ে চিরে-ফেঁড়ে নিলেন। বিশ্বম্ভর কর্মকার কামারের কাজ ছাড়াও ছুতোর-মিস্ত্রির কাজ করত, সে মারা গেছে। কর্মকারবাড়ি কয়েকটা যন্তর-পত্তর পড়ে ছিল মরিচা ধরে। সেগুলো অনেকদিন আগে চেয়ে এনে রেখেছেন। একাজের গুরু যদি কাউকে বলতে হয়, সে ওই মৃত বিশ্বম্ভর। আমাদের পাঁড়াগাঁয়ের ছুতারগিরিতে এমন কিছু শৌখিন কাজ আসে না যে জ্যান্ত গুরু ধরে হাতে-কলমে শিখতে হবে। কল-কৌশলের চেয়ে গায়ের জোরের ব্যাপার বেশি। বিশাল এক গাছের গুঁড়ি মাঝামাঝি চিরে দিয়ে গৃহস্থ বলল, চৌকাঠ বানাও। বাইশ দিয়ে কুপিয়ে কপিয়ে সেই অতিকায় গুঁড়ি থেকে চার বাই তিন ইঞ্চি মাপের কাঠ বের করতে হল, তাতেই লেগে গেল পুরো দুটো দিন। সেই কাঠ থেকে কি মাপের কোন বস্তু বানাতে হবে সেটা পরের

বিবেচনা। বাড়ির গিন্নির ভারি আনন্দ—উনুনে মাসখানেক পোড়াবার মতো কাঠ হয়ে গেল একজোড়া চৌকাঠ বানাতে গিয়ে।

দেখতে দেখতে ভূষণদা'র দালান উঠে গেল জানলা-দরজা ও পাকা ছাত সহ। আপাতত এক কুঠরি—পরে অনেক বড় হবে, ইটের মাথা বের করে কায়দা রেখে দিয়েছেন। এবং আর যে দুই দফা বাকি রইল—বড়লোক হওয়া ও জমিজিরেত করা—তা-ও হয়ে যাবে এক সময়। নিশ্চয় হবে। নতুন কুঠরিতে ভূষণদা দোকান নিয়ে গেলেন। এই দোকানই মস্তবড় হবে, মহাজনী কারবার হয়ে দাঁড়াবে। সেদিনের দামি দামি মালপত্র পাকা-কুঠরিতে না রেখে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না। দামের মাল আপাতত নাই থাকুক, ব্যবস্থাটা পাকা হয়ে রইল।

বিশ্বম্ভর কর্মকারের মৃত্যুর পর থেকে গাঁয়ের মধ্যে ছুতার-মিস্ত্রির কিছু অনটন হয়েছে। কর্মকারবাড়ির যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছিলেন, সে জিনিষ ভূষণদা আর ফেরত দিলেন না। ডাক্তার হওয়া ঘটল না তো ছুতার-মিস্ত্রি হলেন। আর একেবারে গোড়ার দিনের সেই দোকান তো রয়েইছে। অবস্থা নির্ঘাৎ ফিরবে, বলেন সকলকে। চিরকাল ধরে বলে আসছেন।

কিন্তু কিছুদিন থেকে দেখছি অন্যমনস্ক ভাব—ভূষণদা কী যেন ভাবেন সর্বদা।

যেমন, খদ্দের এসে বলছে, সৈন্ধবনুন আছে তোমার দোকানে ?

পাকা-কুঠরির ঠিক সামনে উঠানের উপর ভূষণদা কাঠ চাঁছাচ্ছেন। সেই কাঠ থেকে, অন্য কারো জন্যে নয়—দত্তবাড়ির পাঠশালার বেঞ্চি হবে। বিরিঞ্চি দত্তর নতুন ব্যবস্থায় পাঠশালার পাটি-মাদুর দিয়ে বেঞ্চি, এবং পণ্ডিতের জন্য চেয়ার। ভূষণদা'র পাঠশালা উঠে যাবার পর শশীপণ্ডিতের সঙ্গে ভাব জমেছে আবার। অদূরে উবু হয়ে বসে পণ্ডিত-মশায় তামাক খাচ্ছেন। আর ভূষণদা'র কাজ দেখছেন। বউদি এক ঝুড়ি কাঠের কুচি রেখে এসে মহানন্দে আবার কুড়োতে লেগেছেন। এই খানিকক্ষণ আগে শৈল এসে তাগিদ করে গেছে।—ডাক্তার শৈলবিহারী মজুমদার। বলে, অষুধপত্তর কিনে তো ডাক্তার হয়ে বসলাম। আমায়

এখানে কে চেনে—তোমার জোর না পেলে কক্ষনো সাহস করতাম না ভূষণদা। কিন্তু রোগি কই? গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ো না—তোমার কাছে কত রকমের লোক আসে, তাদের বলেকয়ে দাও।

শশীপণ্ডিত নিরিখ করে দেখছেন বেঞ্চি গড়া। বলে উঠলেন, পায়া যেন বেশি উঁচু হয়ে যাচ্ছে ভূষণ। এক এক ফোঁটা বাচ্চা ছেলে—বেঞ্চিতে উঠতে পারবে তো?

সৈন্ধবনুনের খদ্দের জবাব না পেয়ে হনহন করে চলেছে বোধকরি গড়ভাঙার হাটখোল. মুখো। ভূষণদা যেন তন্দ্রা ভেঙে ওঠেন: অ্যাঁ, চলে গেলে নাকি হে? শোন, শোন—

লোকটা বেশ খানিক দূর চলে গিয়েছে। ভূষণদা রীতিমতো চেঁচাচ্ছেন। ডাক শুনে সে ফিরে চলে আসে: আছে সৈন্ধবনুন?

সে প্রশ্ন ভূষণদা'র আপাতত কানে নেবার সময় নয়। বললেন, আমাদের শৈলবিহারী ডাক্তার হয়েছে, শোননি বুঝি? ভাল ডাক্তার—রোগি সব পটাপট ভাল হয়ে যাচ্ছে। তোমার ছেলেপুলে সকলকে শৈলর অষুধ খাইয়ে দেখ। একবার অন্তত খাওয়াও।

সৈন্ধবনুন?

অনেকগুলো কথা বলে ফেলে, ভূষণদা খুটখাট করে আবার বেঞ্চি গড়ায় মনোনিবেশ করেছেন। নির্বাক অবস্থা বেশ খানিকক্ষণ। খদ্দের লোকটি দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল। পণ্ডিতমশায়ও উঠে পড়লেন। একটা কটকোবলা লিখে দিতে হবে, মক্কেল এখনই এসে যাবে—হঠাৎ মনে পড়ল কথাটা। ধৈর্য ধরে যদি বসে থাকতে পারতেন, তাঁর কথারও জবাব মিলত এক সময়। এবং ওই যে লোকটা সৈন্ধবনুন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, তারও কথার। একটা-কিছু বললেন, আর ওঠ্-ছুঁড়ি-তোর-বিয়ের মতন সঙ্গে সঙ্গে তুড়্‌ক-জবাব—এ স্বভাব ভূষণদার নয়।

এমনি অবস্থায় নতুন-কুঠুরির খানিকটা একদিন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। পুরানো নোনা-ধরা ইট, কাদার গাঁথনি, তদুপরি মিস্ত্রি হলেন

আমাদের ভূষণদা—এ হেন ত্র্যহস্পর্শযোগে দেয়াল অধিকক্ষণ লড়তে পারেনি কালবৈশাখির বৃষ্টি ও ঝড়ের সঙ্গে। ভাগ্যিস তখন কুঠুরিতে কেউ ছিল না। দোকানের মালপত্র কিছু গেল, টাকার অঙ্কে সেটা মারাত্মক নয়।

কিন্তু ভূষণদার তারপরে কথাবার্তা একেবারেই ছেড়ে দেওয়ার গতিক। আগে একটা জবাব পেতে ধরুন আধঘণ্টার মতো সময় লাগত, এখন সমস্তটা দিন মুখের পানে চেয়ে থেকেও কিছু মেলে না। হঠাৎ একদিন কী রকম মেজাজে নতুন সঙ্কল্পের কথা আমায় বলে ফেললেন: ক্ষেতের পাট উঠে গেলে, ভাবছি, পাট কিছু ধরে রাখব। বন্ধ-চোখ মেলে তাকাতে যেটুকু সময়, পাটের কারবারে অবস্থা ফেরাতে তার বেশি লাগে না।

এবং তারই প্রাথমিক আয়োজনে গাছে চড়েছিলেন ঠিক-ত্বপুরবেলা। বাইরে-বাড়ির ঘরে তখন আমরা তাস খেলছি। একটু আগে কাঠ-কোপানোর আওয়াজ পাচ্ছিলাম। কখন এর ভিতরে ছুতারগিরি বন্ধ করে স্নানাহার সেরে গাছের মাথায় চড়েছেন। বউদি হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন হঠাৎ। কি হল, কি হল—করছি আমরা বেরিয়ে এসে: ওরে পুঁটিরাম, হল কি ওখানে?

বাবা আমগাছ থেকে পড়ে গেছে।

পাড়াগাঁ জায়গায় খবর বাতাসের আগে ছোটে। দূর-দূরস্তরের মানুষও এসে পড়ছে। ভূষণদা'র সম্বিৎ নেই। পাখা করছে, জলের ঝাপটা দিচ্ছে। সরো, সরে দাঁড়াও তোমরা, ভিড় জমিয়ে বাতাস আটকে দিও না।

কয়েকজন ওদিকে ভূষণদা'র গোঁয়াতুর্মির কথা বলছে: এত খাটনি খাটলেন সকাল থেকে, তার উপরে এই আগুনের মতন রোদ। এমন অবস্থায় গাছে চড়তে যায় কেউ কখনো! মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন।

কেষ্ট মোড়ল বলে, মাথা ঘোরে না ঘোষমশায়ের। ও মাথা বড় শক্ত। উপর থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে।

ধাক্কা দিতে গেল কে আবার?

প্রশ্নকর্তার অজ্ঞতায় অবাক হয়ে কেষ্ট বলে, কত রকম খারাপ বাতাস আছেন, চোখে দেখা যায় না। তাঁদেরই কেউ।

অনেক পরে ভূষণদা চোখ মেলেন। ধরাধরি করে আমরা বাড়ির দাওয়ায় নিয়ে যাই। চেতনা পেয়েই প্রথম কথা: আম গেছে চলে হাটে? কে নিয়ে গেল?

বউদি চোখ ইসারা করছেন কেবলই। আম তলায় পড়ে আছে জানলে ভূষণদা ক্ষিপ্ত হবেন। বলতে হল: দয়াল মোড়ল কাটাখালি যাচ্ছিল, বলেকয়ে তার কাছে গছিয়ে দেওয়া হল। হাটে পৌঁছে এতক্ষণে বেচতে লেগেছে।

ছেলে পুঁটিরামের উপর ভূষণদা খিঁচিয়ে ওঠেন: তুই কেন সঙ্গে গেলি নে? এই বয়সে গতরশোকা হচ্ছিস--যত্ন করে প্রাণ দিয়ে খাটলে অবস্থা ফিরতে কদিন লাগে শুনি!

ডান-পাখানা তুলতুল করছে—তুলে ধরলে নুয়ে পড়বে। ভিতরের হাড় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে, মনে হয়। আরও কি কি হয়েছে—গাঁয়ের অটল কিম্বা শৈলবিহারীদের মতন ডাক্তার দিয়ে হ'ব না। কলকাতার হাসপাতালে পাঠাতে হবে। বিনয় দত্তকে যেমন পাঠানো হয়েছিল। গাঁ-গ্রামে এমনি আমাদের ঠেঙাঠেঙি মামলা-মোকদ্দমা, কিন্তু বিপদের মুখে শত্রুমিত্র একসঙ্গে সকলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

লোক ছুটল কেশবপুর—সদরের বাস সেখানে এসে থাকে। তেমনি একটা বাস ভূষণদাকে নিয়ে সন্ধ্যার ট্রেন ধরিয়ে দিতে পারবে কিনা। শড়কিতে জখম হবার পর বিনয় দত্তকে যেমন দিয়েছিল।

ভূষণদা ওদিকে রাগারাগি করছেন: হয়েছে কী শুনি! কলকাতা অবধি ঠেলে দিচ্ছ—অকালের আমগুলো বরবাদ হয়ে যাবে যে!

কত রকম ভেবে রেখেছি—কোন-কিছু হবার জো আছে বুদ্ধিমন্তদের জ্বালায় ?

নিতান্তই অশক্ত এখন তিনি, মুখের বাক্য ছাড়া কিছু নেই। তা-ও বেশিক্ষণ রইল না। প্রবল জ্বর এসেছে, ক্ষণে ক্ষণে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছেন। আমি চললাম সঙ্গে। শেষরাত্রে কলকাতা পৌঁছে হাসপাতালের এমার্জেন্সি-ওয়ার্ডে ঢুকিয়ে দিলাম।

রোগির নাম-ধাম-বয়স ও রোগের যাবতীয় বিবরণ শিয়রের কার্ডে লেখা থাকে। পরের দিনের কথা। কার্ড পড়ে নার্স মেয়েটা কৌতুক-স্বরে বলে, সত্তর বছুরে বুড়োমানুষ তুমি, গাছে উঠতে গিয়েছিলে কেন ?

রোগির পাশেই আমি। স্পষ্ট দেখলাম, কথা শুনে চমক খেলেন ভূষণদা। মুখ হঠাৎ কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বুড়ো হয়েছেন এবং বয়স সত্তর, এই যেন সর্বপ্রথম কানে শুনলেন। সত্যি তাই। কোন না কোন সময় কেউ কি আর বলেনি বয়সের কথা ? কিন্তু অবস্থা ভাল করবার তালে এমনি ব্যস্ত, আজেবাজে কথা আমাদের ভূষণদা'র কানে ঢোকেনি।

গ্যাংগ্রিনের লক্ষণ। ডান-পা কেটে ফেলবে, তার জন্য অনুমতি চায়। ভূষণ-দা'র ঘোরতর আপত্তি : কখনো না। পাটের কারবার করব, ক্ষেতেলদের বাড়ি বাড়ি ঘুরতে হবে। পা গেলে আমার ব্যবসা কেমন করে চলবে ?

জীবনের সর্বশেষ কথা এই। বিনয় দত্ত আরোগ্য হয়ে গ্রামে ফিরেছিলেন, ভূষণদা ফিরলেন না।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

বাড়ি এলাম। এপাশে-ওপাশে জিওলগাছের সারি, তারই শেষে পাঁচিলের দরজা ওই। জিওলগাছের গায়ে চেরা-বাঁশ বেঁধে বেড়া বানাত। বেড়ার বাঁধন দড়ি দিয়ে নয়, পাটের দড়ি এক-বর্ষাও টেকে না—কঞ্চি চিরে ছোটা বানিয়ে বাঁধা। আমাদের তরকারির ক্ষেত। বিশটা বছর আগে হলে চোখ জুড়িয়ে যেত আপনার। লাউ-সিম-ঝিঙের লতা জড়িয়ে আছে বেড়ার গায়ে। ফুল ফুটেছে, ফল ধরে আছে। অতগুলো শরিকের বিশাল সংসারগুলোর প্রায় সমস্ত তরকারি যোগান দিত ডাইনে বাঁয়ের এই ক্ষেত দুটো। সকালবেলা মা-জেঠাইমা'রা ঘুরে ঘুরে দেখেশুনে পছন্দমতো তরকারি তুলে আনতেন। গরব করে সকলকে ডেকে ডেকে দেখাতেন।

পিছন তাকিয়ে বাগের-পুকুরটাও একবার দেখে নিন। বাঁধানো ঘাট। জল ঝাঁপাঝাঁপি করেছি কত ওই পুকুরে। ভেলায় চড়ে জাল বেয়েছি।

এক রাতে সে কী জ্যোৎস্না! ঝলমলে সাদা জ্যোৎস্নায় চরাচর ভরে আছে। চাতালের উপর নাটু-দা ও আরও তিন-চারটি। বিহ্বলভাব সরা-ঢাকা মেটে-হাঁড়িতে ভরে এইমাত্র কোথায় মাটির তলে পুঁতে রেখে এলেন। শান্ত হয়ে বসে দরাজ গলায় গান ধরলেন এবার :

ভয় কি মরণে, রাখিতে সন্তানে
মাতঙ্গী মেতেছে সমররঙ্গে—
তাথৈ-তাথৈ দ্রিম-দ্রিম
ভূত-পিশাচ নাচে যোগিনী সঙ্গে—

গান নয়, যেন মন্ত্র। বিশ্বাস করুন, গানের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোৎস্না কাঁপতে লাগল। আমি দেখলাম, জ্যোৎস্না লাল হয়ে উঠেছে ক্রমশ। যেন

জ্যোৎস্না নয়, রক্তের উত্তাল সমুদ্র। উনিশ-শ সাতচল্লিশের পনেরোই আগস্ট দিনটিতে আমার চোখে জল এসেছিল নাটুদা'রা বেঁচে নেই বলে— স্বাধীনতার উল্লাস তাঁরা দেখতে পেলেন না। আজকে বড় সোয়াস্তি— ভাগ্যিস নেই তাঁরা, লাঞ্ছনা চোখে দেখতে হচ্ছে না। সেদিন যদি ফাঁসি এড়ানো যেত, আজকের দিনে নিশ্চয় তাঁরা নিজের কাপড়ে গলায় ফাঁস দিয়ে মরতেন।

দাঁড়ান একটু আমাদের পাঁচিলের দরজার উপর। আমার বাড়ি! মহাপ্রাচীন নারকেলগাছ উঠানের উপর, টুরে-খেজুরতলি-কাঁচামিঠে আমগাছ এদিকে ওদিকে। ছায়াতলে আমার মা-জেঠাইমার মূর্তি যেন—সেকালের তুই প্রীতিমর্তা জা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। শৈশবে মর্নিং-ইস্কুলে যেতাম, বিলের কিনারা অবধি মা আমায় এগিয়ে দিতেন—বিলে নেমে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম, মা আমার স্থিরমূর্তিতে দাঁড়িয়ে। কলকাতা থেকে বাড়ি আসতে কতটুকুই বা পথ, মনে হচ্ছে গ্রহ-গ্রহান্তর পাকাচক্কোর দিয়ে এসেছি। কতক্ষণই বা লাগল, মনে হচ্ছে যুগ-যুগান্তর পার হয়ে গেছে।

যুগান্তরই বটে! পিছনের পরিচয়-হীন আমরা, অতীত নিশ্চিহ্ন। স্বাধীনতার অথচ বিশটা বছরও যায় নি এখনো। ঘুরে ঘুরে আপনাকে দেখালাম—কানে যা শুনছেন আব চোখে যা দেখে এলেন, তিলেক মিল আছে তুয়ের মধ্যে? বলুন। কোন এক দূর-কালের রূপকথা শুনিয়ে যাচ্ছি যেন আমি।

দালানকোঠা ভেঙে ভেঙে পড়ছে। ভাঙা ছাতের কড়ির গায়ে চামচিকা ঝোলে। ঘরতুয়োর খাড়া নেই, জঙ্গলে ভরা ভিটেগুলো। যেন পাহাড়-অঞ্চলের চড়াই-ওতরাই। রোয়াকটা আমার বড় প্রিয় জায়গা—পথের মধ্যে লোভ দেখালাম, আপনাকে ওইখানে নিয়ে বসাব। হাঁটু ভর উলুঘাসের মধ্যে সাহস হয় গিয়ে বসতে?

এক পাঁচিলের ঘেরে বিস্তর শরিক। রত্নপ্রভা-বউদিরা উত্তরের-দালানে থাকতেন। কতবড় বাড়ি আমাদের দেখুন,

কতখানি জায়গা নিয়ে। এদিকে ঘর সেদিকে ঘর, দোচালা বাংলাঘর, পাঁচচালা সাতচালা আটচালা চৌরিঘর, পাকাদালান—এখানটা কানাচ ওখানটা ছাঁচতলা—গোলকধাঁধা বিশেষ। চোর ঢুকতে সাহস পেত না আমাদের বাড়ি।

শুধু চোর কেন—আত্মীয়-অভ্যাগতেরাও। ঢুকে পড়ে তারপর বেরিয়ে যাওয়া বড় ফ্যাসাদ। ধরুন, আগের মতন সব আবার হল। মানুষজন ঘরবাড়ি পাড়াপ্রতিবেশী যা সমস্ত লয় হয়ে গেছে, কোন এক মায়ামন্ত্রে আবার সব ফিরেছে। যে আশায় দত্তবাড়ির ভগ্নস্তূপের মধ্যে সৌদামিনী ঠাকরুন দিনে-রাত্রে দু-চোখ এক করতে পারেন না। সমস্ত ফিরে পেয়েছি। কত দিন পরে বাড়ি এসেছি—আমার স্বর্গীয় মা-জেঠাইমা সেজদাদা-বড়দাদাদের ডেকে বলি, কাকে ধরে নিয়ে এলাম, দেখ। শহরবাসী আমার এই প্রিয় মানুষটি।

উঠানে পা দিলেন কি সকলে আপনাকে ঘিরে দাঁড়াল। বউরা বেড়ার অন্তরালে। কোন আজব চিজ—উঁহু, কোন আকাশের চাঁদ উদয় হলেন ভাগ্যবশে। মুহূর্তে জলের গাড়ু ও গামছা এসে পড়ল ঃ পা ধুয়ে ভাল হয়ে বসুন। কর্তারা কাছে বসে সঙ্গ দিচ্ছেন, ছেলেপুলেরা ছুটোছুটি করে ফাইফরমাস খাটছে। অনতিপরে বাড়িব ভিতরের ডাক ঃ উঠতে হবে'যে একটুখানি—। জলযোগের আহ্বান। ওদিকে কাঁচামিঠে-আমতলায় পাঁঠা ভ্যা-ভ্যা করছে, অভ্যাগতেব উদরে যাবার জন্য কৃষ্ণের জীব উতলা হয়ে পড়েছে—

এ পর্যন্ত বেশ ভাল। টের পাবেন চলে যাবার দিন। অনুরোধ-উপরোধ কানে নিচ্ছে না তো শেষটা আপনি রোখে রোখে বেরিয়ে পড়ছেন। জুতো পাওয়া যায় না যে খুঁজে! চুলোয় যাকগে। জুতো বাহুল্য জিনিষ—না-থাকল জুতো, পা দুটো তো রয়েছে। তখন দেখা যায়, ছাতাও নেই। বৃষ্টি পড়ছে, যাওয়া কি করে হবে শুনি? বৃষ্টিটা অবশেষে থামল তো জামা গায়েব। যাবেন যদি তো খালি-গায়ে খালি-পায়ে খালি-মাথায়—যান চলে এই অবস্থায়!

আবার তখন কাকুতিমিনতি, জনে জনের খোশামুদি : না গেলে বড় ক্ষতি হবে, বোশেখ মাসে আসব কথা দিয়ে যাচ্ছি, ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ আসাটা আপনার এক্তিয়ারে ছিল, চলে যাওয়ার মালিকানা অন্যদের হাতে গিয়ে পড়েছে ইতিমধ্যে। সেই মালিকরা অতি নির্দয়।

ব্যাং লাফিয়ে পড়ল পায়ের কাছে—ঘাসবনের মধ্যে হয়তো বা সাপে তাড়া করেছে! এগিয়ে কাজ নেই, খানিকটা বরঞ্চ সরে দাঁড়ানো যাক। বুনোশুয়োর একটা ঘোঁত-ঘোঁত করে পরম বিরক্তি ভরে ছাত-ভাঙা উত্তরের-কোঠায় গিয়ে উঠল। রত্নপ্রভা-বউদির ঘর—নতুন-বউ হয়ে এলেন, ওই ঘরে খাটের বিছানার উপর জো-খেলানো হচ্ছিল। ছেলেমানুষ আমি মেয়েদের ভিড়ের বাইরে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। বাড়িতে অগুন্তি মানুষ, খুব বেশি দিনের কথাও নয়—স্বাধীনতার কাল অবধি। আজকে মানুষ বাদ দিয়ে যাবতীয় জীবজন্তুর আস্তানা। ভিটার উপর পাতিশিয়ালটা জুলজুল করে তাকাচ্ছে দেখুন—তুটো নিশাচর মানুষ চোর হয়ে তাদের এলাকায় অনধিকার-প্রবেশ করেছে।

বাইরের চোখদুটোয় দেখছেন নিশিরাত্রি, পোড়ো-বাড়ি, অরণ্য। আর আমি বলে যাই, মনের চোখ দিয়ে দেখতে লাগুন—

রাত্রি কোথা, বিকালবেলা এখন। মানুষজনে চারিদিক গমগম করছে। বাচ্চা ছেলেপুলে উঠানের নারকেলগাছ বেড় দিয়ে হাত-ধরাধরি করে ঘুরপাক খাচ্ছিল, কানে এলো ঢোলের আওয়াজ। কলরব করে ছুটল হরিতলায়, যেদিক থেকে ঢোল আসছে।

আর যত বউঝি জড় হল এসে এই পাঁচিলের দরজায়। বড়-পিশিমা কোনদিক থেকে এসে পড়েন : বউ দেখবে, তা উনুন ধরিয়েছ কই গো? হরিতলার এসে গেছে, আর কতক্ষণ—এক্ষুনি তো বাড়ি এসে যাবে।

উনুন মানে তিনখানা ইট সাজিয়ে তার উপর একটা পিতল-বাটি

বসানোর কায়দা করে নেওয়া। ঠিক পাঁচিল-দরজার মুখে। এ জিনিষ পুরুষ-পুরুষান্তর ধরে হয়ে আসছে, রীতব্যাভার মেনে ঘরে উঠেছে চির-কালের কত কত নতুন-বউ। উঠানের মহাবৃদ্ধ ওই নারকেলগাছকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন। পাতা ঝিলমিল করে জবাব দেবে।

উনুন বানিয়ে পিতলের বাটিতে তাড়াতাড়ি দুধ চড়িয়ে দিল। শুকনো পাতা দাও, বেশি করে দাও, জোর হোক আগুনের। এসে পড়ল যে ব া-বউ! পাল্কি নামাবে দরজার সামনে, পায়ে হেঁটে ওরা পথটুকু আসবে। আলপনা দিয়ে রেখেছে লতাপাতা পদ্মফুল—পদ্মফুলে পা ফেলে ফেলে ঘরের লক্ষ্মী দাঁড়াবে এসে গোবর-নিকানো উঠানে।

পাঁচিল-দরজায় যেই না এসেছে, উনুনের উপব বাটির দুধ সঙ্গে সঙ্গে উথলে উঠবে। ব্যবস্থা এই।

তাকাও, ও নতুন-বউ, তাকিয়ে পড়ো ইদিকে। উঠানে তোমার পা পড়ল—সংসারও উথলে উঠল অমনি সকলদিক থেকে।

সেই বর-বউ হলেন বড়-শরিকদের সোমনাথ আর রত্নপ্রভা। ঢোল-কাঁসি তোলপাড় করে তুলেছে, তার মধ্যে শানাই-এর পাগল-করা সুর। মাঝ-উঠানে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বউ-পরিচয় হচ্ছে—জোর একটা হাওয়া দিল এমনি সময়। সোমনাথদা'র মাথার টোপর পড়ে যাবার গতিক। সে ভারি অলক্ষণ—টোপরের দুই মুড়ো দু-হাতে চেপে ধরলেন। চ্যাংড়া মেয়ে রূপসীর কী হাসি তখন! আরও সব হাসছে - হাসির লহর বয়ে গেল। রূপসী বলে, বউয়ের পাশে মেজদা কান ধরে দাঁড়িয়ে আছে দেখ।

কোন এক অপরাহ্ণে আমাদের বাড়িতে বউ-পরিচয়ের সময় মেয়েরা হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিল—বুনোশুয়োর-সাপ-শিয়ালের জঙ্গলের মধ্যে কান পেতে আমি তার রেশ শুনতে পাই।

কী কাণ্ড তারপরে কয়েকটা দিন বর-বউকে নিয়ে! তরকারি-ক্ষেতের বেড়ার খানিকটা ভেঙে গিয়েছিল, সোমনাথদা বাঁধতে লেগেছেন—তাই নিয়েও হাসাহাসি বাড়ির মধ্যে। জেঠাইমা সাতেও নেই পাঁচেও

নেই, দেবধর্ম-ক্রিয়াকর্ম নিয়ে থাকেন—তিনি অবধি মুখ টিপে হাসেন। বড়বউ বলছেন, মেজবাবুকে এসময়টা বেড়া বাঁধতে বলে কেউ! কাজের শ্রী দেখে এসো। একটা করে বাঁধন দেয়, ফালুকফুলুক করে তাকায় ঘরের পানে। কোন রকমে দায় চুকিয়ে বাড়ি ঢুকতে পারলে বাঁচে। দেখো মা, ও বেড়া ভাঙতে গরুবাছুর লাগবে না, বাতাসে আপনি খসে পড়বে।

প্রবীণা গিন্নিমানুষ জেঠাইমা কী আর বলবেন, হাসেন একটু নতুন-বউয়ের দিকে চেয়ে। রত্নপ্রভার অবস্থা বুঝতে পারছেন—লজ্জায় মুখ রাঙা করে মেজের সঙ্গে প্রায় মিশে গিয়ে পানের উপর দ্রুত-হাতে চুন মাখাতে লাগলেন।

এক-বাড়ি মানুষ কিলবিল করছে, তার মধ্যে দিনমানে বর-বউয়ের দেখাসাক্ষাৎ হবার জো নেই। দৈবাৎ দেখা হয়ে গেলেও কথাবার্তা হবে না কিছু। ননদিনীদের শত দিকে শতেক চোখ—ঠারেঠোরেও হতে পারবে না। বরের তো কিছু নয়, বেহায়া বলে নিন্দে রটবে বউয়ের। তারও বড়, ঠাট্টাতামাশায় সকলে অতিষ্ঠ করে মারবে।

অনেক রাত্রে সকলে শুয়ে পড়লে গুরুজনদের চোখ এড়িয়ে নতুন-বউ তবে ঘরে আসবে। ছেলেরা সর্বকালেই কিছু বেপরোয়া—বিশেষ করে সোমনাথদা। ছোঁক-ছোঁক করে বেড়ান তিনি সমস্তটা দিন, সুযোগ পেয়েছেন তো বউয়ের গায়ে ধাক্কা দিলেন একটু। বজ্জাতি, বিদ্রোহপনা। রত্নপ্রভা ভয়ে ভয়ে থাকেন। পুরুষমানুষের কি—কোন-কিছু দায়ে ঠেকতে হবে না, কাণ্ড একখানা ঘটিয়ে দিয়ে পাড়ায় বেরিয়ে পড়বে। নতুন-বউ এইসব দুঃখ করেন ননদিনী রূপসীর কাছে, মাথার দিব্যি দিয়ে কথা গোপন রাখতে বলেন। রূপসী কেমন পাত্র জানা নেই তো বউয়ের—শুনে নেওয়ার শুধু অপেক্ষা, তারপর জনে জনের কানে সমস্ত সবিস্তারে বলে খালাস। এবং প্রতিজনকে মানা করে দিচ্ছে, অন্যের কাছে ঘুণাক্ষরে না বলে। কিন্তু বলার মানুষ শেষঅবধি একটিও বোধহয় বাকি রইল না।

রত্নপ্রভা-বউদি অভিমান করেন: তোমার এই কাজ ঠাকুরঝি! খাওয়ার সময়টা সোমনাথ এসে বড়ভাইদের সঙ্গে পাশাপাশি পিঁড়িতে ভালমানুষ হয়ে বসলেন। নিরীহ ভিজে-বিড়ালটি! আর ওদিকে নতুন-বউ রত্নপ্রভা আছেন জা-ননদের দঙ্গলের ভিতর, সর্বক্ষণ তারা খুঁচিয়ে মারুক। বিগ্রহ লক্ষ্মীনারায়ণের সেবারতা ধর্মশীলা এমন যে শাশুড়ি, সম্পর্কবিরুদ্ধ হলেও তিনি পর্যন্ত টিপেটিপে হাসেন বধূর বিপত্তিতে।

রত্নপ্রভা সঙ্কল্প নিয়েছেন, দেখে নেবেন মানুষটিকে আজ রাত্রিবেলা,— সমুচিত শিক্ষা দেবেন।

সোমনাথ আগেভাগে শুয়ে পড়েছেন। ঘরে ঢুকেই রত্নপ্রভা গর্জন করে উঠলেন—

গর্জন অবশ্য ফিসফিসিয়ে, বরের একেবারে কানের উপর মুখ নিয়ে: কী কাণ্ড তোমার বলো দিকি!

কেন, কি করলাম—

সন্ত্রস্ত হয়ে রত্নপ্রভা বলেন, আঃ, আস্তে বলতে পারো না?

কণ্ঠস্বর দুনো-তেদুনো চড়িয়ে সোমনাথ বলেন, আর কত আস্তে বলি—

তোমার পায়ে পড়ি, যা বলতে হয় কানে-কানে বলো আমার। ওরা সব শুনে ফেলবে।

বউয়ের খাতিরে সোমনাথদা এবার কানে কানেই বলছেন। কানের পর্দা ছিঁড়ে যাবার দাখিল। এবং নিতান্ত বদ্ধকালা ভিন্ন বাড়ির মধ্যে শুনতে কারো বাকি থাকার কথাও নয়। সম্মুখরণে ভঙ্গ দিয়ে রত্নপ্রভা সেই আমলের রাজনীতি-ক্ষেত্রে চালু অহিংস-পন্থা নিয়ে নিলেন —মাদুর পেতে আলাদা হয়ে পড়লেন মেজের উপর।

এবারে সোমনাথ সত্যি সত্যি বেকায়দায় পড়েছেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে অভিভাবকের ভঙ্গিতে বলেন, ঠাণ্ডা লেগে যাবে, উঠে এসো।

সাড়া নেই রত্নপ্রভা-বউদির। শুনতে পাচ্ছেন না।

তখন ভয়-দেখানো কথা: নর্দামার পথে সাপ ঢুকে পড়ে, ঘরময় কিলবিল করে বেড়ায়।

সাপ শুনেও নড়াচড়া নেই, খুব সম্ভব ঘুমিয়ে গেছেন। ঘুম মেয়েদের তো কথায় কথায়—বিশেষ করে কমবয়সি মেয়ের। ইতস্তত করে সোমনাথদা খাট থেকে নেমে পড়েন। পরের ঘরের মেয়ে নতুন জায়গায় এসেছে—হিতাহিত দেখতে হবে বইকি! খোশামুদি করে কী একটু বলতে গিয়েছেন, কথা মুখের বার হয়েছে কি না হয়েছে—

আর যাবে কোথা! খুকখুক খিলখিল—নিশিরাত্রে এদিক-সেদিক থেকে হাসির ফুলঝুরি ঝরছে। মুখের কথা ছাড়া মানুষ চেনা যায় না। কিন্তু কথা কেউ বলে না, অবিরত হাসি।

চরম হল, রূপসী যখন ঘরের ভিতরে ছাপবাক্সের পিছন থেকে উদয় হয়ে গম্ভীরভাবে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। বজ্জাতটা সন্ধ্যা থেকে লুকিয়ে বসেছিল। আর রূপসী যখন দেখে গেছে—রাত্রির উপাখ্যান এই বাড়ি বলে নয়, সারা গাঁয়ের কোন-একটি প্রাণীর জানতে বাকি থাকবে না।

তাকিয়ে দেখুন। বুনোশুয়োর ঢুকে পড়ল, ওই কামরার ভিতরে সেদিন এত সব আনন্দ!

কানে কানে ফিসফিসানি, দুটো মানুষ এক জায়গায় হলেই সেই প্রসঙ্গ। একদিন সোমনাথদা কী একটা কাজে সদরে গিয়ে রেডিওয় স্বকর্ণে নেতাজির গলা শুনে এলেন। এসে গেছেন তিনি সীমান্তে সৈন্যদল নিয়ে।

দেয়ালে নেতাজির ছোট্ট একটা ছবি—যে কামরার মধ্যে এইমাত্র বুনোশুয়োর ঢুকে গেল। গোধূলিলগ্নে রত্নপ্রভা-বউদি গোলায় গোয়ালে ঘরে ঘরে সন্ধ্যা দেখিয়ে বেড়াতেন। তেমনি সেই ছবির সামনে দীপ ঘোরাতেন বারে বারে: কত দূরে তুমি, এখনো কত

পাহাড়পর্বত নদী-সাগরের ওপারে। এসো, চলে এসো, সকলে তোমাদের পথ চেয়ে আছি—

আমি দেখেছি, রত্নপ্রভা-বউদির দুচোখে জল টলটল করত তখন। আবার এ-ও জানি, আমার এই বউদি শুধু নন—গ্রামের ঘরে ঘরে সকল মানুষের ওই একমাত্র কামনা। স্বদেশের সর্বত্যাগী ছেলেটি ফিরে আসুন, পরাধীনতার অবসান হোক—

॥ ছত্রিশ ॥

ঝিঙেফুল ফুটেছে বড়বউ, তোমাদের বেড়াব গায়ে। বেলা আর নেই। কী জানি কেমন তোমাদের আক্কেল-ব্যবস্থা, ছেলেপুলে এখনো খেতে বসাও নি। এর পরে তো সাঁঝ-পিদিম দেখিয়ে বেড়াবে, শাঁখ বাজাবে। তার মধ্যে ছেলেপুলে খাওয়ানো হয় নাকি? খাওয়াতে নেই ভর-সন্ধ্যেবেলা—এঁটোকাঁটা অনাচার দেখে মা-লক্ষ্মী আসতে আসতে ফিরে চলে যান।

ভুবন-পিশিমা এসে রান্নাঘরের দাওয়ার উপর বসে পড়লেন ডোয়ার গায়ে পা ঝুলিয়ে দিয়ে। যে ভিটের উপর শিয়ালটা এতক্ষণ তাকিয়ে ছিল। দত্তবাড়ি ছেড়ে পিশি এবারে ভূষণদা'র বাড়ি উঠেছেন—ভূষণদা'র চার বছুরে মেয়ে কমলবাসিনী তাঁর কাঁখে। দায়েবেদায়ে ভুবন-পিশিমার কাছে গিয়ে একবার পড়লেই হল—

এবারে যেমন। কমলবাসিনীর বয়স চার বছরও পোরে নি, এরই মধ্যে ভূষণদা'র বউয়ের কোলে ছেলে এসে গেছে। এবং গর্ভেও নাকি একটা। খেটে-খাওয়া মানুষ ভূষণদা, লোকজন রাখার সামর্থ্য নেই—একলা বউকে দুখানা হাতে সমস্ত করতে হয়। মেয়ের তাই সময়ে নাওয়াখাওয়া হয় না, কাদা-মাখা অবস্থায় বিছানায় গিয়ে পড়ে। ছেলেমানুষ কোন একটা বায়না ধরলে ভূষণদা'র বউ ঢিবঢিব করে

কিলোয়, ভূষণদা'র চোখে পড়ে গেলে বউয়ের বাপ-মা তুলে গালিগালাজ করেন, গালি খেয়ে বউ হাউহাউ করে কাঁদে। এমনি অবস্থায় ভূষণদা একদিন ভুবন-পিশির কাছে গিয়ে পড়লেন: তুমি তো পিশি পাকা-ঘরে দিব্যি রয়েছ। মেয়েটা মারা যায়—গরিব মানুষ বলে একবার তাকিয়েও দেখবে না?

বিরিঞ্চি দত্ত গত হয়েছেন, বিধবা সৌদামিনী ঠাকরুনের রান্নার ভারটা পিশিমার উপরে, দুজনের একত্র খাওয়াদাওয়া। খাওয়ার ব্যাপারে তাই রীতিমত উন্নতি ঘটেছে। কিন্তু ভূষণদা বাচ্চামেয়ের নাম করে কাতর হয়ে বলছেন, এর উপরে পিশি আর দ্বিরুক্তি করতে পারেন না। টিনের তোরঙ্গটা এগিয়ে দিলেন ভূষণদা'র দিকে, ছেঁড়া-কাপড়ে বোঁচকা বেঁধে নিজে সেটা হাতে নিয়ে নিলেন।

দত্ত-জেঠাইমা বলেন, চললে যে ঠাকরুন, আমার তাহলে চলবে কেমন করে?

হাত আছে পা আছে, বলি নুলো-অথর্ব তো নও। তোমার সুরেন মানুষ হয়ে গেছে—নিজের কাজকর্ম নাও এবারে চালিয়ে-চুলিয়ে। ভূষণের মেয়েটা যে মারা যায়—ওটাকে বড়সড় করে দিয়ে আবার আসব।

পিসির প্রতিশ্রুতির উপরে আস্থা নেই। ভূষণদা'র মেয়ে বড় হতে হতে আবার কোন বাড়ির দায় পড়বে, ভুবন-পিশি সেখানে গিয়ে উঠবেন।

ভূষণদা'র বাড়ি গিয়ে প্রথম কয়েকটা দিন পিশি দাওয়ায় পড়ে রইলেন। মাঘ মাস। এত ঠাণ্ডা যে কাঁথায় শীত মানায় না, মাঝরাত্রে উঠে পড়ে আগুন করতে হয়। আগুনের পাশে বসে রাত কাটান। দেখেশুনে ভূষণদা দাওয়ার একধারে বাঁশের বেড়া দিয়ে দিলেন। তালপাতার ঝাঁপ বেঁধে দিলেন—ভুবন-পিশির নিজস্ব কামরা, এবং কামরার দরজা।

কমলবাসিনী—অতখানি নাম বুড়োমানুষের জিভে আসে না। শুধু বাসিনী—সেই থেকে বাসি, এবং সোহাগ বশে বাসিমণি। বড় দুর্দশা

যাচ্ছিল মেয়েটার, মাটি মেখে ভূত হয়ে থাকত। এবারে তেমনি সুখ—ভুবন-পিশির কোলখানা পাকা সিংহাসন হয়ে দাঁড়িয়েছে, সিংহাসন ছেড়ে মাটিতে পা ছোঁয়ান না বাসিমণি। কোলে চড়ে পাড়ার মধ্যে ঘোরেন—পাড়ায় যারা লক্ষ্মীমন্ত, তাদের বাড়ি।

আমাদের রান্নাঘরের দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে পিশি ঘাড় তুলে ভিতর দিকে উঁকি দিয়ে বলেন, ওবেলা কি রান্না করেছিলে অ বড়বউমা ?

বেলা গেছে সত্যি। চপাচপ পিঁড়ি পড়ছে ছোটদের। তিন-চার থেকে বছর আষ্টেক পর্যন্ত এবার। এদের সারা হলে উপরের দল—এই বারো-চোদ্দ বয়স অবধি। গিন্নিবান্নিদের কয়েকজন আছেন—বাচ্চাদের খাইয়ে দেবেন। কাউকে কোলের উপব তুলে বসিয়ে, কারও বা সামনে বসে পড়ে।

রত্নপ্রভা-বউদি পিঁড়ি পেতে যাচ্ছেন। ভুবন পিশি বললেন, পিঁড়ি একটা বেশি করে পাতো নতুন-বউ। বাসিমণির নেমন্তন্ন তোমাদের এখানে। চতুর্দোলায় চড়ে বাসিমণি নেমন্তন্ন খেতে এসেছে।

রূপসী মুখ টিপে হাসল। ভুবন-পিশি মেয়ে ঘাড়ে করে সন্ধ্যাবেলা উপস্থিত—এর পরে আর বলে দিতে হবে কেন? হেসে রত্নপ্রভা বলেন, আপনার বাসিমণির পিঁড়িও পেতেছি পিশিমা। সব চেয়ে বড়খানা—ওই হল বাসিমণির পিঁড়ি। বসে পড়ো বাসিমণি, থালাও আসবে তোমার সকলের বড়।

বাসিকে বসিয়ে ভুবন-পিশি নিজে পাশটিতে বসলেন। বলছেন বাসিকে উদ্দেশ করে, খাওয়ার বড় মজা রে আজ। এরা ভাল গৃহস্থ, খায় খুব ভাল। কত রকম খাওয়াবে, দেখতে পাবি।

চার বছুরে মেয়েকে বলা হচ্ছে এইসব। তারপর গলা চড়িয়ে সকলের শ্রুতিগম্য করে খাওয়ার ফর্দ শোনাচ্ছেন: সর-বাটা ঘি গন্ধ ভুরভুর করছে, আলু-ভাতে—

রত্নপ্রভা বিপন্নভাবে বলেন, ঘি তো নেই পিশিমা। ফুরিয়ে

গেছে। গোয়ালা-বাড়ি থেকে আনা হবে, সে আর হয়ে উঠছে না।

ঘি নেই তোর কপালে, শুনলি রে বাসি? হাভাতের সুখ বৈকুণ্ঠেও নেই। বয়ে গেল, ঘি ছাড়া বুঝি খাওয়া যায় না! শেষ-পাতে দুধ তো পাচ্ছিস—গব্য একটু হলেই হল।

ঘি যেন ভূষণদা'র মেয়ের নিত্যিদিনের খাদ্য, ঘি বিহনে খেতে ঘোরতর আপত্তি—পিশিমা বুঝিয়েসুজিয়ে বাসিকে তাই প্রলুব্ধ করছেন।

বড়বউ ভাত নিয়ে এলেন। রূপসী ঘটি ভরে জল নিয়ে আসে, আর ফেরো-গেলাস কয়েকটা। বাচ্চাদের যে যখন জল খেতে চাইবে, ফেরোর জল সাবধানে মুখে ঢেলে দেবে। গায়ে না পড়ে জল, বিষম না লাগে। বড় পিঁড়িতে বাসিমণি—বড় থালায় ভাত, বাটিতে বাটিতে ব্যঞ্জন।

নেমন্তন্ন কিনা বাসিমণির—রত্নপ্রভা-বউদি অন্যদের নিরস্ত করছেন: নেমন্তন্নে বসলে তোমাদেরও এমনি বাটি সাজিয়ে দেবে।

মণ্টু অধীর হয়ে বলে, আমাদের নেমন্তন্ন কবে?

পশ্চিমবাড়ি দুলি-দিদির বিয়ে হবে যখন—

বিয়ে কবে?

সত্যভাষিণী রত্নপ্রভা-বউদি বলেন, ঠিকঠাক হয় নি তো বিয়ের। যেদিন হবে, তখন—

অনিশ্চিত অপেক্ষায় রাজি নয় কেউ। কলরব উঠল: কাল নেমন্তন্ন কিনা বলো। কাল, কালই—

রীতিমত বিদ্রোহের লক্ষণ। বড়বউ ইতিমধ্যে রান্নাঘরের ব্যবস্থা সেরে এসে পড়লেন। লুফে নিলেন তিনি কথাটা: কালই তো। দুলির বিয়ে না হলেও নেমন্তন্ন তোমাদের। কোনো বাড়ি না করে তো আমি করছি। বড় থালার পাশে বাটি সাজিয়ে তোমরা কাল নেমন্তন্ন খাবে।

ভুবন-পিশি বলে উঠলেন, এরা কি আর খেতে শিখেছে—আস্বাই কেবল! এখন আধ-পেটা খেয়ে রাত্তিরবেলা কেঁদে কেঁদে উঠবে। জলের ঘটিটা দে একবার মা-রূপসী। হাতখানা ধুয়ে বাসিমণিকে দু-দলা খাইয়ে দিই।

রান্নাঘরে ঢুকে রূপসী চাপা মন্তব্য করেঃ ভুবন-বুড়ি চেপে বসেছে, মেয়েটাকে কুচকি-কণ্ঠা গেলাবে। ভাতে কম পড়ে না যায় আমাদের—

বড়বউ তাড়াতাড়ি তার মুখে হাত-চাপা দিলেনঃ বলতে নেই ঠাকুরঝি। যার ভাত সে-ই খায়, কেউ কাউকে খাওয়ায় না। বাসিমণির ভাত ঠাকুর আজ আমাদের হাত দিয়ে দেওয়াচ্ছেন। সেটা তো ভাগ্যির কথা।

রূপসী হেসে হেসে তবু বলে, ভাগ্যিটা একা আমাদেব নয় বড়বউদি। বাসিমণির ভাত ঠাকুর এপাড়া-ওপাড়ার সকল বাড়ি ছড়িয়ে রেখেছেন। মেয়ে কোলে নিয়ে পিশি নিত্যিদিন পাওনা ভাত বাড়ি বাড়ি কুড়িয়ে বেড়ান।

কেটে কেটে বলে, আর ভূষণদা-ই বা কেমন জানিনে। মাঠেব ময়লা দিয়ে পুকুর পোযা—জেনেশুনে তিনি চুপচাপ থাকেন। হয়তো বা শিখিয়ে-পড়িয়ে দেন পিশিকে।

বড়বউ তাড়া দিয়ে ওঠেনঃ বলিস নে, বলিস নে। মানুষের অভাব-দুঃখ নিয়ে ঠেশ দিয়ে বলতে নেই। কার কবে কেমন দশা হয়, কেউ বলতে পারে না।

দরদভরা কণ্ঠে আবার বলেন, পিশিমা আঁটকুড়ো মানুষ—এর ছেলেটা ওর মেয়েটা নেড়েচেড়ে সাধআহ্লাদ মেটান। বাচ্চা ছেলেপুলের নাম করে যে ডাকবে, তার কাছে গিয়ে উঠবেন। গরিবমানুষ ভূষণ-ঠাকুরপোর ভালমন্দ খাওয়ানোর সঙ্গতি নেই, পিশিমা দশ দুয়োরে চেয়ে মেগে খাওয়ান। ওতেই সুখ, ওতেই তৃপ্তি—এই ছাড়া কি আছে বল্ দিকি মানুষটার জীবনে!

ইতিমধ্যে অঘটন। রত্নপ্রভা-বউদি খাওয়ানোর ব্যাপারে আছেন, উঁচু জায়গা পেয়ে অন্যমনস্ক ভাবে চৌকাঠে বসে পড়েছেন। দেখতে পেয়ে বড়বউ হাঁ-হাঁ করে ওঠেন: ওখানে বসলি কেন রে নতুন-বউ? মা লক্ষ্মীর পথ আটকানো। ধারকর্জ হয় চৌকাঠে বসলে।

লজ্জা পেয়ে রত্নপ্রভা তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন: বসতে কি আর দিচ্ছে দিদি একদণ্ড! দেখ, চেয়ে দেখ—

হুলস্থুল ওদিকে। চাঁপার ঝাল লেগেছে, হাঁ করে কেঁদে উঠল। ফেরো নিয়ে নিজে জল খেতে গিয়ে খোকনটা গায়ে-মুখে জল ঢেলে বসেছে। আর রণ্টুর বজ্জাতি—ভাত এক গ্রাসও মুখে তোলে না, এটা-ওটা খুঁটছে কেবলই।

রত্নপ্রভা গিয়ে গ্রেপ্তার করলেন রণ্টুকে, পা ছড়িয়ে হাঁটুর উপর নিয়ে বসালেন। ভাত মেখে দলা পাকিয়ে মুখে তুলে ধরছেন: কাগা রে, বগা রে—। চোখ বোঁজ, হাঁ করো দিকি। তুমি তো খাচ্ছ না, কাগায় বগায় এসে খেয়ে যাচ্ছে। তোমায় খেতে কে বলছে!

রণ্টু চোখ বুজল। খেলা পেয়ে গেছে। রত্নপ্রভা ভাতের দলা দিচ্ছেন তার গালে। কিন্তু একটিকে নিয়ে থাকবার কি জো আছে-- রণ্টুর উপরের ভাই মণ্টু উঠে পড়ল লাফ দিয়ে।

কি হল রে?

অনেক ভাত খেয়েছি নতুন-কাকি—

দু-হাত দুই দিকে প্রসারিত করে মণ্টু ভাতের পরিমাণ দেখায়।

মাছ খেয়েছিস?

খেয়েছি তো—

হুঁ, টের পাইনে আমি কিছু! থালা উঁচু কর, দেখব।

থালা তুলবে না মণ্টু, ঝুপ করে পিঁড়িতে আবার বসে পড়ে থালার উপরের ভাত নাড়ছে।

দোষী অতএব নিশ্চয়ই। রত্নপ্রভা নিজে এসে থালা উঁচু করে

তুললেন। যা ভেবেছেন—মাছ না খেয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে থালার নিচে চাপা দিয়েছে।

রূপসীকে বললেন, দুখানা মাছ এনে দাও না ভাই। না থাক, আমি যাচ্ছি—

রূপসীর উপর ভরসা করা যায় না—হাতের মাথায় যা পেল, তেমনি দু-খণ্ড নিয়ে আসবে। তাতে চলবে না। খাওয়া চুরি করেছে মণ্টু, খুব বড় সাইজের দুটো মাছ খেয়ে তার শাস্তি। তাই দেখে শিক্ষা হবে অন্যদের।

মণ্টু কাকুতিমিনতি করে: দুটো নয়, একটা। তোমার পায়ে পড়ি নতুন-কাকিমা।

কিন্তু রত্নপ্রভা-বউদির করুণা নেই: হবে না, কোন আবদার শোনাশুনি নেই। তুমি ছেলে আমার চোখে ধূলো দিতে যাও। বলি কে আগে জন্মেছে—আমি না তুমি?

মার্জনা হল না। রত্নপ্রভা সামনের উপর বসে কাঁটা বেছে বেছে খাইয়ে দিলেন। বড় বড় দুখানা মাছ। তবে নিষ্কৃতি।

আমের ডাল থেকে গুলঞ্চলতা ঝুলছে, তার নিচে পাতিশিয়াল এতক্ষণ তাক করে দেখছিল—ঠিক ওইখানটা। মনে মনে ছবি আঁকুন—ভিটা নয় ওটা, রান্নাঘর। রান্নাঘরের গোবর-নিকানো দাওয়া। সেখানে আসন্ন সন্ধ্যায় শিশুর দঙ্গল মা-কাকিমাদের সতর্ক দৃষ্টির প্রহরায় খাওয়া শেষ করে উঠল। আঁচানোর জন্য পুকুরঘাটে কলরব করে ছুটল আমাদের পুরানো বোধনতলার পাশ দিয়ে।

নেতাজির সৈন্যদল এসে পৌঁছল না, কিন্তু স্বাধীনতা এসে গেল। ওলটপালট চতুর্দিকে।

রত্নপ্রভা সেইসময়ে একদিন বলেছিলেন, সর্বনাশ!

আমরা মাতামাতি করছি, তার মধ্যে বড় বিশ্রী লাগল বউদির মুখের উল্টোপাল্টা কথা। দিন কাটে। ক্রমশ সর্বনাশ আমরাও দেখতে লাগলাম।

ভয়াল ঘূর্ণিঝড়ে মানুষের বাঁধা ঘরসংসারগুলো ছিটকে পড়ল এদিক-সেদিক। আজ মনে হয়, বউদির একটা তৃতীয়-নেত্র ছিল, দূরবর্তী জিনিষ আগে থাকতে দেখতে পেয়েছিলেন।

বউদি অধীর হয়ে বললেন, চুপচাপ আছ যে তোমরা ?

কি করব, কতটুকু সাধ্য আমাদের ! যা করবার, নেতারা করছেন।

আখের গোছাচ্ছেন নেতারা—তিক্তকণ্ঠে রত্নপ্রভা-বউদি বলেন, মজা করে তাঁরা গদি জাঁকিয়ে বসেছেন। আর মোটা রকমের উপদেশ ছাড়ছেন, নিজ নিজ রাষ্ট্রে অনুগত হয়ে থাকুক সকলে।

বললেন, গুলি খেয়ে কিম্বা ফাঁসির দড়িতে প্রাণ দিল, তারা তবু গোনাগণতির মধ্যে আসে। এবারের বলি যে লাখেও কুলোয় না। তাদের ভোল নি, তাদের নিয়ে বই লিখেছ—এরা কেন নজরের বাইরে থেকে যাবে ?

আরও হল। মানুষ মানুষকে কাটছে বিনি-দোষে, তার মধ্যে পড়ে সোমনাথদা নিখোঁজ। রত্নপ্রভা-বউদিব মাথা-খারাপের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। একদিন আমায় তো যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করলেন ঃ ইংরেজ-আমলে কে পুছত তোমাদের ! ভাল সাহিত্য তাই গড়ে উঠল। রাজদৃষ্টি এবারে এদিকেও—পুরস্কাব, উপাধি, ইজ্জতের আসন। আর কেন, কলমে ঢাকের কাঠি বানিয়ে ড্যাডাং-ড্যাডাং বাজাওগে যাও—

* * * *

কেমন একটা ঘোর এসেছিল। সচকিত হয়ে দেখি, সেই আমার চারতলার ঘর। আকাশে জ্বলজ্বলে একটি তারা, টেবিলে বাতি—নির্বাক দুইসঙ্গী আমার ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে।

এক-পা নড়ি নি আমি ঘর থেকে। আমার একাল আর সেকালের দুই-আমি বুঝি হাত-ধরাধরি করে বেড়াচ্ছিল। যে-ভূমি থেকে আমার চিরনির্বাসন, খানিকটা সেখানে ঘুরে দেখে এলাম।

ছবি—

॥ লেখকের কথা ॥

অনেক দিন আগে (২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৯) রেডিও-ভাষণ দিয়েছিলাম। বিষয়—'যে বই লিখতে চাই'। হুবহু তুলে দিচ্ছি:

জর্মনির লাইপজিগ শহরে লেখকদেব এক সভায় প্রশ্ন হল: কতগুলো বই আছে তোমার? জবাব পেয়ে হকচকিয়ে যায়: বলো কি হে—অত? বুক চিতিয়ে দেমাক করি: এ তো কিছুই নয়। দেশে-ঘরে এমন সব আছেন, যাঁদের আধাআধিও পৌঁছতে পারি নি। বিদেশিদের চক্ষু তো চড়কগাছ।

সত্যি, অনেক বই লিখেছি। লেখনীর তবু বিরাম নেই। লিখতে চাই আরও অনেক। আমায় যেন হাতে ধরে লেখাচ্ছে। দীনেশ সেন মশায়কে শ্মশানে নিয়ে দেখা গেল, তর্জনীতে কালির দাগ। ক'টা দিন আগে পর্যন্ত লিখেছেন। তাঁর নিষ্ঠার সঙ্গে অন্য কারো তুলনা হয় না। তবু নিশ্চিত জেনে বসে আছি, শেষ-ঘুম ঘুমানোর আগে আমারও রেহাই হবে না। জীবনেব পদে পদে হরেক স্মৃতি কুড়িয়েছি—স্মৃতির বোঝা উজাড় করে ঢেলে তবে ছুটি।

বাল্য ও কৈশোরে যাঁদের কাছাকাছি ছিলাম, মাঝে মাঝে কী খেয়াল হয়, এক—দুই—তিন—করে সকলকে গণতে বসি। গণে শেষ করা যায় না। দূর গ্রামের সেইসব নগণ্য মানুষ। বেশির ভাগই নেই। যমের কবলে গিয়ে বেঁচেছে কতক; কতক বা উদ্বাস্তু নাম নিয়ে আছে হিন্দুস্থানের এখানে সেখানে। আদি-অঞ্চলেও আছে দু-দশ-জন—যেটা আজ ভিন্ন রাজ্যের এলাকা, পাকিস্তান। ইচ্ছে করলেই হুট করে চলে যাবেন, সে উপায় নেই। আর আমিও ইদানীং দস্তুরমতো শহুরে। পাকা-দালানে বসবাস, পিচের রাস্তায় চলাচল, উত্তম উত্তম বচন মুখে। সীমাহীন লবণ-সমুদ্রের মাঝে একটুকু দ্বীপ রচনা করে আছি। যদিস্যাৎ ওই গেঁয়ো-মানুষদের কারো উঠানে গিয়ে পড়ি, সেই মানুষ চক্ষের পলকে গায়ের উপর জামা জড়িয়ে চটির খোলে পা ঢুকিয়ে ভদ্র হয়ে যাবে। আমিও সম্ভবত দুর্গন্ধের ভয়ে ইতিমধ্যে কোঁচার খুঁটে নাসারন্ধ্র ঢেকে দিয়েছি। কত দূরবর্তী সেই আমার আপন-মানুষেরা! যেমন জায়গার দিক দিয়ে, তেমনি মনের দিক দিয়ে।

গভীর রাতে এক-একদিন তারা যেন মিছিল করে আসে। আলতো ভাবে স্মৃতি ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঘুরে বেড়ায়। স্বপ্নেও ভাবিনি কোন-কিছু লেখা চলে সেই সামান্যদের নিয়ে। দূরে গিয়ে আজ তারা অপরূপ। দেখতে পাইনে বলেই কি দেখতে চাই এত করে? বাল্য ও কৈশোর-

কালটা আবার একটু যদি নাগালের মধ্যে পাই, আঁকড়ে ধরি বুকের উপরে—ছেড়ে যেতে দিই না। কত ভালবাসার ধন, এবারে মর্মে মর্মে টের পাচ্ছি। শুধুমাত্র মানুষগুলি নয়—গাছপালা গরু-বাছুর খালবিল সুখদুঃখ আশাউল্লাসে ভরা আমার সেকালের গ্রাম, আর সমস্ত অঞ্চলটা। কোন গাছের ডালটা কোনদিকে, তা-ও সঠিক বলে দিতে পারতাম। চোখ বুঁজে ভাবলে আজও বোধহয় পারি।

সেই জগৎ কোনখানে হারিয়ে গেল, একালের কাছে তার অস্তিত্ব নেই। যেমন আগামী কালের নতুন মানুষদের কাছে আমরাও চিহ্নবিহীন। মহাকাল অধ্যায়ের পর অধ্যায় পরিপাটি রূপে মুছে দিয়ে যাচ্ছে। স্বপ্নে এসে সেই সেকাল আমায় বলে, লেখনী হাতে রুখে দাঁড়াও তুমি—অমৃত সিঞ্চনের মতন কালির নিষেকে আমাদের বাঁচিয়ে তোল। কথার পরে কথা সাজিয়ে কল্পনার অনেক খেল দেখিয়েছ। আমরাও ছিলাম একদিন—সেই সত্যি জিনিষটা জাহির করো একালের সামনে। মাটি আমাদেরই ছিল, দেমাকে সেই মাটির উপর দুমদুম করে চলতাম। দলাদলি করেছি, আবার গলাগলি হয়েছি পরের দিনে। ভিটের পাশের তালগাছটা নিয়ে মামলা লড়েছি, আবার নগরকীর্তনে নেচে নেচে একসঙ্গে গড়াগড়ি দিয়েছি ধূলোর উপর। তুমি সমস্ত জানো, তুমি স্বচক্ষে দেখেছ। তোমারই কলম পারবে আমাদের বাঁচাতে।

তারা আমার কাছে অভিমান করে, করজোড়ে মিনতি জানায়। ঘাড় নেড়ে আশ্বাস দিই: লিখব, আমি লিখব। কলম নিয়ে বসেছিও কখনো-সখনো। কূলপ্লাবিনী নদীস্রোতের মতো তাদের কাহিনী, লিখে যে কোনদিন শেষ হবে ভরসা পাইনে।

আর আমি একটা বই লিখতে চাই ইস্কুল নিয়ে। খানিকটা আক্রোশ নিয়ে বই কি! আমার যৌবনের অনেক দিনমানের অপমৃত্যু ঘটেছে এক ইস্কুলবাড়ির চার-দেয়ালের মধ্যে। বিদ্যাগার বলব না, মানুষ গড়ার কারখানা। নিচের ক্লাসের মেশিনের ভিতরে ছেলেগুলোকে ফেলে ধাপে ধাপে নানান ক্লাস ঘুরিয়ে একদিন তৈরি-মাল বাজারে ছেড়ে দেওয়া। আমি জনৈক কারিগর ছিলাম সেই কারখানার। এটা অতিশয় নিরীহ ভেবে আপনারা অবহেলার চোখে তাকান—আসলে তা নয়। মহামহি কত চাণক্য ও চার্চিল দিবানিদ্রাটা দুপুরের ক্লাসে সেরে নিয়ে রাত্রে ও সকালে গুপ্ত-অধ্যাপনা অর্থাৎ প্রাইভেট-ট্যুইশানিতে ছুটোছুটি করেন, দুর্ধর্ষ কত

হিটলার কলে-কৌশলে কারখানার কর্তা হয়ে বসে কারিগরবর্গকে নাস্তানাবুদ করেন--পরিচয় পেলে চমৎকৃত হবেন। দেবশিশুর মতো অপাপবিদ্ধ হাজারলক্ষ ছেলে বিদ্যার কারখানা থেকে ডাক্তার-উকিল সিনেমাআর্টিস্ট অথবা চোর-বাটপাড় রূপে বেরিয়ে এসে কুল পবিত্র ও জননীদের কৃতার্থা করছে। লিখব আমি সে কাহিনী।

এ সমস্ত অতীত, অতীতের বই অন্তত এই দুটো লিখতে হবে আমায়। আর দেখুন, ভবিষ্যৎ হাত টেনে ধরে সামনের জৌলুস দেখাচ্ছে। দুনিয়াব মধ্যে কোন-কিছুই আজ অজানা নয়; এক কাঠা জায়গাজমি বাতিল পড়ে নেই, যেখানে মানুষের পা পড়েনি। অজানা নিয়েই যত রোমান্স—ভেবেছিলাম, রোমান্স বুঝি গোল্লায় গেল। রোমান্সের মশলা বিনে নবেল আমাদের আর জমবে না। এমনি সময় বিজ্ঞান চাবি খুলে ব্রহ্মাণ্ডের দরজা মুক্ত করে দিল। গ্রহে গ্রহে মানুষের আনন্দ-অভিযান। আমাদের নতুন প্রণয়ের বন্ধু ওরা। সেই অসাম ব্রহ্মাণ্ডে কার না বিচরণের সাধ হয়। দেহ যদি অপটু হয়, কল্পনার মুখে লাগাম দিচ্ছে কে? বই লেখবার আনকোরা বিষয়বস্তু। পূর্বাচার্যেরা মাথা খুঁড়েও এমন পবিবেশ কল্পনায় আনতে পারতেন না।

লেখার সাধ তো অনেক। কিন্তু সময়ের বালি ঝুরঝুর করে ঝরে যাচ্ছে। ক্ষয়িত কলকব্জায় তালিতুলি দিয়ে চালানো বিরক্তিকর। মাথার উপরে সর্বশক্তি বিধাতাপুরুষ কেউ আছেন কি না, জানা নেই। নিরুপদ্রবে থাকুন তিনি—জীবনের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য মরে গেলেও কখনো দরবার করতে যাচ্ছি নে। চিরকাল বেঁচে থেকে ভুবন ভোগ করব, এটা কোন বিবেচনার কথা! অতএব আগামী কালের লেখককুল, গ্রহ-গ্রহান্তরের নায়ক-নায়িকাগুলো আপনারাই নবেলে গাঁথবেন। আপনাদেরই দিয়ে যাচ্ছি। আমার ইতি।

কথাগুলো ছ'বছর আগেকার। দুটি বই লেখার প্রতিশ্রুতি। ইস্কুল গিয়ে উপন্যাস আগেই লিখেছি—'মানুষ গড়ার কারিগর'। আর প্রথম প্রতিশ্রুতির বই এতদিনে তৈরি হল। এই উপন্যাস।

উপন্যাস নিঃসন্দেহ—ইতিহাস বা জীবনকাহিনী নয়। তবে নিতান্ত মিথ্যের উপর দাঁড় করাই নি। এমনি বইয়ের জন্য আমার সেজদাদা ললিতমোহন বসুর বড় আগ্রহ ছিল, তিনি দেখে যেতে পারলেন না।